তাওহীদের মূলনীতি

দ্বিতীয় খণ্ড

আহমাদ মুসা জিবরিল

তাওহীদের মূলনীতি

[দ্বিতীয় খন্ড]

তাওহীদের মূলনীতি

[দ্বিতীয় খন্ড]

আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ

ইলমহাউস অনুবাদক টিম

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও তথ্যসূত্র সংযোজন

মানযুরুল কারিম

তাওহীদের মূলনীতি

[দ্বিতীয় খন্ড]

প্রথম সংস্করণ

রাবিউস সানি ১৪৪২ হিজরি, ডিসেম্বর ২০২০

978-984-8041-79-6

প্রকাশক

ইলমহাউস পাবলিকেশন

www.facebook.com/IlmhouseBD

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়

বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

নির্ধারিত মূল্য: ২৮০ টাকা

Tawhider Mulniti (Principles Of Monotheism) Part Two, Based on the lecture series 'Explanation of The Three Fundamental Principles' by Shaikh Ahmad Musa Jibril, Published by Ilmhouse Publication. First Edition, December 2020.

উৎসর্গ

বিশুদ্ধ তাওহিদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা
উম্মাহর সত্যপন্থী আলিমগণের প্রতি...

সূচীপত্র

পূর্বকথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ -এর, যিনি আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি তাওবাহ কবুলকারী, যিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর, যিনি অতীব দানশীল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবি (ﷺ)-দের ওপর।

আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ বিরতির পর তাওহিদের মূলনীতি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালাম-গণ এবং সালাফ আস-সালেহিন -এর শিক্ষার ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মহান সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব (ﷺ)-এর রচিত পুস্তিকাউসুলুস সালাসাহ। কালজয়ী এ পুস্তিকার ব্যাখ্যামূলক আলোচনা শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিযাহুল্লাহ উপস্থাপন করেছেন (Explanation Of The Three Fundamental Principles) নামের লেকচার সিরিযে (যা 'তাওহিদ সিরিয' নামে অধিক পরিচিত)।

শাইখ আহমাদ তাঁর আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা ইতিপূর্বে 'তাওহিদের মূলনীতি প্রথম খণ্ড' নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে উঠে এসেছে শাইখের লেকচার সিরিযের প্রথম চৌদ্দটি দারসের আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে লেকচার সিরিযের চৌদ্দ থেকে বাইশ নম্বর দারসের আলোচনা। এই দারসগুলোতে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল উসুলুস সালাসাহ-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন।

তাওহিদ ও শিরকের শ্রেণীবিভাগ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনের অপরিহার্যতা, শাসনের ক্ষেত্রে শিরক, ইন্টারফেইথ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা এবং সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে আকীদাহ বদলে ফেলা বহুরূপীদের নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ আলোচনা উঠে এসেছে তাওহিদের মূলনীতি দ্বিতীয় খণ্ডে। আজকের সংকট কবলিত সময়ে বিশুদ্ধ, অবিকৃত সত্যকে চেনার ক্ষেত্রে শাইখের এই আলোচনা পাঠকের জন্য উপকারী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে মূল আলোচনা ও বক্তব্যকে কোনোরকম

পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়া উপস্থাপন করার। যুক্ত করা হয়েছে শাইখের দেয়া উদ্ধৃতিগুলোর রেফারেন্স (তাখরীজ) এবং প্রয়োজনীয় টীকা।

বইটি নিয়ে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষের স্বপ্ন, সময়, শ্রম জড়িয়ে আছে। এই মানুষগুলোর কেউ কেউ স্বীয় রবের কাছে ফিরে গেছেন। মহান আল্লাহ তাদের সকলের পক্ষ থেকে এ কাজটি কবুল করুন। এই কাজের সাথে জড়িত সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর এই গুনাহগার বান্দাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন।

শাইখ আহমাদ একটি কথা প্রায়ই বলেন,

> 'মসজিদের চৌকাঠে আবদ্ধ থাকার জন্য তাওহিদের শিক্ষা নাযিল হয়নি। তাওহিদের শিক্ষা নাযিল হয়েছে এই পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবার জন্য'।

আমরা আশা করি তাওহিদের মূলনীতি পাঠকের মনে এই উপলব্ধি তৈরি করবে, ইন শা আল্লাহ।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই শিক্ষা আত্মস্থ করার, আমাদের জীবনে এবং পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার তাউফিক দান করেন। এই মহান কর্তব্য পালনের উপযুক্ত শক্তি এবং আত্মত্যাগের সক্ষমতা দান করেন। নিশ্চয় সাফল্য কেবল তাঁরই পক্ষ থেকে।

ইলমহাউস পাবলিকেশন
রাবিউস সানি ১৪৪২, ডিসেম্বর ২০২০

সম্পাদকের ভূমিকা

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের (হাফিযাহুল্লাহ) আরেকটি অসাধারণ গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠক পাঠিকার সমীপে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদাহর প্রচার ও প্রসারে তা অশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

শাইখ আহমাদ মুসার (হাফি.) লেকচার আমি যখন প্রথম প্রথম শুনি তখন নিজেকে তালিবুল ইলম বলার যোগ্যতাও আমার ছিল না, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত জীবনের অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কেবল আমিই নই আমার মত আরও বহু মানুষের জীবনে তাওহিদের সঠিক শিক্ষার ভিত শাইখের লেকচারগুলো স্থাপন করেছে এবং ইন শা আল্লাহ আগামীতেও করবে।

উম্মাহর এই মহীরুহের লেকচার থেকে সংকলিত "তাওহিদের মূলনীতি" বইটির প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়ে আমার হাতে আসে আমি তখন অত্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে পড়ি এবং যতদূর মনে পড়ে মাত্র তিন দিনে আল্লাহর মেহেরবানিতে পুরো বইটা পড়ে ফেলেছিলাম। হয়তো জীবনের প্রাত্যহিক ব্যস্ততা না থাকলে এক বসাতেই পড়ে ফেলতে চেষ্টা করতাম, পারতাম কি পারতাম না সেটা ভিন্ন বিষয়। আসলে শাইখের লেকচারের আকর্ষণ তো এমনই, সাবলীল বিশুদ্ধ আলোচনা যেন বহতা নদীর প্রবহমান স্রোতধারা। পাঠকের পিপাসাকে নিবারণ তো করেই বরং দুকূল উপচে দেয় মাঝেমধ্যেই।

তখন থেকেই দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদের আশায় পথ চেয়ে ছিলাম। শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহোদয় যখন আমাকে এই দায়িত্ব দিলেন তখন অত্যন্ত আনন্দিত হই। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যে ইমাম ইবনুল কায়্যিম, ইবনু রজবসহ (رحمهم الله) আরও বহু ইমামের অনূদিত গ্রন্থে আমার যুক্ত হবার তাওফিক হয়েছে, আশা করি এগুলো আমার জন্য আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম হবে। এই অর্জনের দানিতে আরেকটি পালক হিসেবে শাইখের এই অসাধারণ কিতাবের সম্পাদনার দায়িত্ব হাতে এসে গেল।

বইটা এমন সময় হাতে এসেছিল যখন আমি বেশ অসুস্থ আর এজন্য ভালোই ভুগতে

হচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ এরপরও পাশাপাশি চলছিল সম্পাদনার কাজ। শাইখের কিতাবের সম্পাদনা মানে বইয়ের সাগরে অবগাহন করা। এত এত উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন, এগুলো খুঁজে বের করা মুশকিল ও দুরূহ বটে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে আমাদের কাছে মাকতাবাতুশ শামিলা আছে, ইন্টারনেট আছে, নয়তো এরকম বইয়ের তাখরিজ বা তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হলেও হয়তো এক বছরের প্রয়াস জরুরি।

শাইখের কিতাবটা আমি সম্পাদক হিসেবে না, বিমুগ্ধ পাঠক হিসেবে পড়েছি। এতে প্রয়োজনীয় বহু তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ গ্রন্থসূত্র-ই মাকতাবাতুশ শামিলা থেকে গৃহীত, তবে বেশ কিছু গ্রন্থসূত্র পিডিএফ বা মূলকপি থেকে নেয়া হয়েছে। তাহকিকের ক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো মত উল্লেখ করিনি; বরং মুহাক্কিক আলিমদের মত উল্লেখ করেছি।

এই বইটার সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাকে বিপুল পরিমাণ বই ঘাঁটতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে। একটা উদাহরণ উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যার (রাহ.) একটা উদ্ধৃতি খুঁজতে মাজমুউল ফাতাওয়ার ৩৫তম খণ্ড প্রায় পুরোটাই পড়তে হয়েছে। এরকম ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। এতে শাইখ আহমাদ মুসার মুখস্থশক্তি ও ধীশক্তির ব্যাপারে বারবার বিস্মিত হতে হয়েছে।

শাইখ কিছু স্থানে রিওয়ায়াত বিল মা'না বা মূল অর্থকে বর্ণনা করে চলে গেছেন আক্ষরিক উদ্ধৃতি না দিয়ে, সেখানে আমি মূল উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দিয়েছি। আশা করি এর ফলে গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মূল আলোচনার গতিও নষ্ট হবে না।

এই খণ্ডের আলোচনায় আকীদাহর বহু পাঠকের অনেক বিষয়েই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে আর ইলমের যথেষ্ট বিকাশ ঘটবে বলে আমি আশা করি। আল্লাহ তা'আলার কাছেই এই কাজের কামিয়াবি ও মাকবুলিয়াতের জন্য দু'আ করি। এতে সম্পাদক হিসেবে আমার তরফ থেকে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা একান্তই আমার নিজস্ব দোষ ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফল, আর যা সঠিক তার সবটাই আল্লাহর মেহেরবানী।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি যেন এই গ্রন্থ, এর সাথে যুক্ত আমাদের সবার এবং পাঠকের নাজাতের উসিলা হয়-আমিন।

নিবেদক
মানযুরুল কারিম

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি ও মুসলিম* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি ও মুসলিমের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাযকিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে অ্যামেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান অ্যামেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল *আর রাহিকুল মাখতুম* বইয়ের লেখক শাইখ সফিয়ুর রাহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ

শানকিতির ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়ায়ুল বায়ান* এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আব্দুল্লাহ আল কুদের সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন তিনি। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায অ্যামেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে অ্যামেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন।

তাওহীদের মূলনীতি ২

ভূমিকা

উসুলুস সালাসাহ পুস্তিকাটিতে চারটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায় হলো চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা। আলহামদুলিল্লাহ তাওহিদের মূলনীতি প্রথম খণ্ডে আমরা এই আলোচনা শেষ করেছি। তাওহিদের মূলনীতি দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা আলোচনা করব উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোকে 'তিনটি মাসায়েল' নামকরণ করা হয়েছে। এ তিনটি বিষয় হলো :

১. তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ (দারস ১ – দারস ৪)

তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহর আলোচনাকে আমরা ছয়ভাগে ভাগ করেছি।

- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা
- আল্লাহ আমাদের রিযকদাতা।
- আল্লাহ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের সৃষ্টি করেননি।
- তিনি আমাদের কাছে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।
- যে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে।
- যে রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য হবে সে জাহান্নামে যাবে।

২. তাওহিদ আল-উলুহিয়্যাহ (দারস ৫ – দারস ৬)

৩. আল ওয়ালা ওয়াল বারা (দারস ৭ – দারস ৯)

উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়

‘তিনটি মাসায়েল

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

এ তিনটি বিষয় হচ্ছে :

এক. আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযক দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿٥١﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿٦١﴾ [المزمل: ٥١، ٦١]

‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফির‘আউনের প্রতি। কিন্তু ফির‘আউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করল। ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে।’ [সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৫-১৬]

দুই. ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না–চাই তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿٨١﴾ [الجن: ٨١]

‘নিশ্চয় সাজদাহর স্থানসমূহ শুধু আল্লাহর জন্য। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান কোরো না।’ [সূরা আল-জ্বিন, ৭২: ১৮]

তিন. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করে এবং ইবাদাতের জন্য এক আল্লাহকেই বেছে নিয়েছে, তাঁর পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব (মুওয়ালাহ) করা মোটেই বৈধ নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণকারী। যদিও তারা তাঁর

সবচেয়ে আপনজন হয়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান পোষণকারী এমন কোনো সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। হোক না কেন তারা ঈমানদারদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র-গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করে রেখেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতঃস্বিনী—সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের ওপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর ওপর। বস্তুত এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এ সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।’ [সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]’

দারস ১

লেখক (ﷺ) দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করছেন এভাবে,

> ا(عْلَمْ) رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل والْعَمَلُ) بِهِنَّ
>
> জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

প্রথম অধ্যায়ের মতো দ্বিতীয় অধ্যায়ও লেখক শুরু করেছেন, 'ইলাম রাহিমাকাল্লাহ' দিয়ে। অবশ্য এখানে একটি ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমটি হলো, লেখক এখানে আলাদা করে নারী ও পুরুষের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

'নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো...'

তিনি কেন এখানে আলাদা করে 'নারী ও পুরুষ' বললেন? কেন তিনি বললেন,

مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

মূলত নারী ও পুরুষের কথা এখানে আলাদাভাবে বলা হয়েছে বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করার জন্য। আরবী সাহিত্যে—এবং অবশ্যই আরবী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন আল কুরআনে—পুরুষকে সম্বোধন করে কিছু বলা হলে, সেটি নারীর জন্যেও প্রযোজ্য হয়। যদি না তা স্পষ্টভাবে শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আরেকটু সহজ করে বলি। আরবীতে যখন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হয়, তখন নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝানো হয়। আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করার প্রয়োজন হয় না। পুরুষকে সম্বোধন করা হলে, সেটার মাধ্যমে নারীদের সম্বোধন করাও বোঝায়। ব্যতিক্রম হবে যদি নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, এখানে শুধু পুরুষদের সম্বোধন করা হচ্ছে।

তাই বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য লেখক এখানে আলাদা আলাদাভাবে নারী ও পুরুষের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বলছেন,

নারী ও পুরুষ, প্রত্যেককে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

লেখক কেন আলাদা করে 'মুসলিম' বললেন?

লেখক (ﷺ) বলেছেন,

> নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

মুসলিম কে?

মুসলিম হলো এমন কেউ, যে দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়। যারা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছে তাদের আলাদা করে এটা বলতে হয় না। কিন্তু কুফর বা শিরক ত্যাগ করে কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন দুই কালেমার সাক্ষ্য তাকে উচ্চারণ করতে হয়। কাজেই মুসলিম দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়। কালেমা অনুযায়ী আমল করে, এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকে যা মানুষের ঈমানকে বিনষ্ট করে এবং তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।

কালেমা অনুযায়ী আমল করার অর্থ হলো—ইলম অর্জন, সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন, আন্তরিকতা, আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, মনেপ্রাণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আইন মেনে নেয়া এবং এর আনুগত্য করা।

এই তিনটি বিষয়ের (কালেমার সাক্ষ্য, কালেমা অনুযায়ী আমল, ঈমান বিনষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকা) কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে ঐ ব্যক্তিকে আর মুসলিম বলা যাবে না। ইসলামে প্রবেশের দরজা একটি; কিন্তু ইসলাম থেকে বের হবার দরজা অনেক। ওযু যেমন বিভিন্ন কারণে ভাঙ্গতে পারে, তেমনিভাবে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলোর কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই এ ব্যাপারগুলো খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে।

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে বলা হয় 'মুরতাদ'। আর ইসলাম ত্যাগ করে কাফিরে পরিণত হওয়াকে বলা হয় 'রিদ্দা'। অর্থাৎ ঈমান ত্যাগ করার কাজটাকে বলা হয় রিদ্দা, আর যে রিদ্দা করে তাকে বলা হয় মুরতাদ।

আবার একজন ইহুদী বা খ্রিষ্টান—যে একদম ছোট থেকেই কুফরের ওপর বড় হয়েছে, যে কোনো সময়ই মুসলিম ছিল না—সেও কাফির। তবে তাকে বলা হয় কাফির আসলি

(كافر أصلي)।

মুরতাদ এবং কাফির আসলি দুজনেই কাফির। তবে ফিক্বহের কিতাবাদিতে এই দুই ধরনের কাফিরের বিধানের ব্যাপারে ভিন্নতা এসেছে।

তো লেখক এখানে বলছেন,

নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য...

এখানে আরও একটা প্রশ্ন আসতে পারে।

লেখক এখানে যে কাজগুলোর কথা বললেন, সেগুলো কি শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য? কথাগুলো কি কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য না? তারা কি এ বক্তব্যের আওতাভুক্ত হবে না?

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কাফিরের জন্যও প্রযোজ্য–এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। যেমন: ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করে। এটা কাফিরদের জন্যেও প্রযোজ্য। যারা এ দুনিয়াতে তাওহিদের আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাদেরকে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু লেখক এখানে শুধু মুসলিমদের কথা বলেছেন, কারণ এ পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে মুসলিমদের জন্য।

সাধারণভাবে তাওহিদের আহ্বান মুসলিম ও কাফির সবার জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক বা প্রাইমারি বিষয়গুলো কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যেগুলো সেকেন্ডারি বিষয়, অর্থাৎ একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর যে বিষয়গুলো আসে, সেগুলো কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য হবে কি না–তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, হ্যাঁ, প্রযোজ্য হবে। আবার কেউ বলেছেন, প্রযোজ্য হবে না।

আমি মনে করি এ ব্যাপারে সারমর্ম হলো, এ ধরনের সেকেন্ডারি বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে কাফিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে আবার কিছু ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি।

যেমন একজন মুসলিম যখন কাফিরদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে যায়, তখন তাদেরকে সে সালাত, হজ্বের মতো কিছু বিষয় শেখাতে পারে। তাদেরকে আদাব শেখাতে পারে। হয়তো এ বিষয়গুলো জানার কারণে কোনো কাফিরের অন্তর ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। এ কারণেই মুয়ায বিন জাবাল (ﷺ)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়েমেনের অধিবাসীদের যা যা শেখাতে বলেছিলেন,

তার মধ্যে এমন অনেক বিষয় ছিল।[১]

আবার দেখুন, যেসব ব্যাপারে কাফিররা শাস্তি দেয়া হবে এমন বিষয়েও তাদের উদ্দেশ্যে করে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি মতের মধ্যে এটিই সঠিক মত। অর্থাৎ এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো সেকেন্ডারি–যেগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পরে আসে–তবে এগুলো মেনে না নিলে, পালন না করলে শাস্তি হবে। যেমন এই আয়াতগুলো লক্ষ করুন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾
>
> 'তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না। আর আমরা বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম। এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে।' [সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪: ৪২-৪৭]

এ লোকগুলো যখন জাহান্নামে যাবে তখন তাদের প্রশ্ন করা হবে, তোমাদেরকে এই বেদনাদায়ক পরিণতি বরণ করতে হলো কেন? কেন তোমরা জাহান্নামের বাসিন্দা হলে? তখন তারা জবাব দেবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না, যাকাতও দিতাম না। আমরা মিথ্যাচার করতাম, বেহুদা কথাবার্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। তাই আজ আমরা জাহান্নামী।

দেখুন এখানে যে বিষয়গুলোর কথা আসছে সেগুলোর কিছু কিছু সেকেন্ডারি বিষয়। তবুও কিন্তু এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাদেরকে বলা হচ্ছে। এই আয়াতে যে কাফিরদের কথাই বলা হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারি আয়াতের এই অংশ থেকে–

---

[১] মুয়ায (রা.)-কে ইয়েমেন পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি এক আহলে কিতাব জাতির কাছে যাচ্ছ। তাদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে দাওয়াত দেবে যেন তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যদি এতে তারা তোমার আনুগত্য করে (অর্থাৎ তোমার কথা মেনে নেয়), তাহলে তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ তাদের জন্য দিন ও রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এই বিষয়েও তোমার আনুগত্য করে, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের জন্য যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের থেকে নেয়া হবে আর গরিবদের দেয়া হবে। যদি তারা এতেও তোমার আনুগত্য করে, তাহলে তাদের সম্পদের সবচাইতে উৎকৃষ্ট অংশকে (যাকাত হিসেবে) নেবে না, আর মজলুমের দু'আকে ভয় করবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।'-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৪৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

'এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।'

অর্থাৎ এই আয়াতে এমন মানুষদের কথা বলা হচ্ছে, যারা আখিরাতকে অস্বীকার করত। আর যে আখিরাত অস্বীকার করবে সে অবশ্যই কাফির।

কাজেই কুরআন থেকে আমরা জানতে পারছি, এই ব্যক্তিদের এমন কিছু বিষয়ের কারণে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে যেগুলো ইসলামের সেকেন্ডারি বিষয়। বোঝা গেল এমন কিছু সেকেন্ডারি বিষয় আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে কাফিরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অন্যদিকে কিছু বিষয় আছে কাফিররা যেগুলোর আওতাভুক্ত না। যেমন ধরুন, ইসলামের বিস্তারিত জ্ঞান। এটা কাফিরের জন্য প্রযোজ্য না। একজন কাফির হজ্বে যেতে বাধ্য না। আমরা কাফিরদের হজ্ব করতে বলি না। আমরা কাফিরদের সালাত আদায় করতে বলি না। কারণ সালাত গৃহীত হবার চাবি হলো শাহাদাহ, তাওহিদের সাক্ষ্য, ঈমান। ঈমান আনার আগে কেউ যতই সালাত আদায় করুক না কেন, তা গ্রহণ করা হবে না। যেহেতু একজন কাফিরের ঈমান নেই, তাই এ কথা তার জন্য প্রযোজ্য না। ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা তাদের এ ব্যাপারগুলো জানাতে পারি, কিন্তু ঈমান আনার আগে আমরা তাদেরকে এই ইবাদাতগুলো করতে বলি না।

প্রথম বিষয় : তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ

লেখক বলছেন,

(الأُولَى) أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا

(প্রথম বিষয়) আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ : কুরআন ও সুন্নাহ থেকে

আল্লাহ (ﷻ) যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক দলিল আছে। মানুষ তার বুদ্ধি বা চিন্তার ক্ষমতা ব্যবহার করেও এ সত্য বুঝতে পারে। এ বিষয়ে আসলে এত বেশি আয়াত আছে, সবগুলোর আলোচনা করতে গেলে মাসের পর মাস কাবার হয়ে যাবে, আলোচনা শেষ হবে না।

যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে

বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯০]

তিনি বলেছেন,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।' [সূরা সাফফাত, ৩৭: ৯৬]

তিনি বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا

'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল।' [সূরা আন'আম, ৬: ২]

লক্ষ করুন, এই আয়াতে ব্যবহৃত আযালা (أَجلًا) শব্দটির মানে হলো, আল্লাহ আমাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের আয়ু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আপনার আয়ুর একটা নির্দিষ্ট অংশ বাকি আছে। আপনি হয়তো আর বিশ, পঞ্চাশ অথবা এক বছর বাঁচবেন—এটাই হলো আযালা।

তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

'আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা করো।' [সূরা আরাফ, ৭: ১১]

এই আয়াতে মানুষ সৃষ্টির একদম শুরুর সময়কার কথা এসেছে—বিশেষ করে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

'আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে মাটি থেকে।' [সূরা আল হিজর, ১৫: ২৬]

আবার আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ।' [সূরা আর রুম, ৩০: ২]

সূরা আর রহমানে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে, যা পোড়া মাটির ন্যায়।' [সূরা রহমান ৫৫:১৪]

এ রকম অসংখ্য আয়াত আছে। সূরা আয যুমারে আল্লাহ্ বলছেন, তিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। ইরশাদ হচ্ছে,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

'আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা।' [সূরা আয যুমার, ৩৯: ৬২]

সমগ্র কুরআনজুড়ে এ রকম অসংখ্য আয়াত এসেছে। আমরা আপাতত এখানেই থামছি। আল্লাহ্ যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, এ বিষয়টি কতটা স্পষ্ট তার একটা উদাহরণ দিই। মক্কার মুশরিকরা ছিল চরম অহংকারী। তাদের অহংকারের কোনো সীমা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাওয়াত তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে (ﷺ) নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল, হুমকিধমকি দিয়েছিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র দেহ মুবারকে হাত তোলার স্পর্ধাও দেখিয়েছিল। সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের ওপরও তারা অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল অনেক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের কষ্ট দেবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তারা সেটা লুফে নিত।

কিন্তু এই চরম উদ্ধত, চরম অহংকারী, নিকৃষ্ট মুশরিকরাও বিশ্বাস করত, আল্লাহ্ সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ্ কুরআনের পাঁচটি স্থানে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

'আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন?' তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?' [সূরা আনকাবুত, ২৯: ৬১]

সূরা লুকমানে তিনি বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর;

কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।' [সূরা লুকমান, ৩১: ২৫]

সূরা যুমারে বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

'আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'।' [সূরা আয যুমার, ৩৯: ৩৮]

সূরা যুখরুফে বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

'আর আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন'।' [সূরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৯]

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

'আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়?' [সূরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৮৭]

অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদেরকে যখন সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতো, তখন তারা জবাব দিত—আল্লাহই হলেন সৃষ্টিকর্তা। শুধু তাই না, সূরা যুখরুফের একটি আয়াতে আমরা দেখছি, তারা আল্লাহর গুণবাচক কিছু নামের ওপরও ঈমান এনেছিল। কারণ তারা বলেছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

'আর আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন'।' [সূরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৯]

তারা আল্লাহকে এখানে সম্বোধন করেছে, আল আযীয ও আল আলীম নামে। আল আযীয অর্থ মহাপরাক্রমশালী এবং আল আলীম অর্থ সর্বজ্ঞ। তার মানে এই মুশরিকদেরও এক অর্থে আসমা ওয়াস সিফাতের ওপরও কিছুটা বিশ্বাস ছিল।

সাধারণত আল্লাহর গুণবাচক নামসম্পন্ন এই আয়াতগুলো ঈমানকে জোরদার করে। আল্লাহর কালাম মানুষের মনে মুহূর্তের মধ্যে কী আলোড়ন তুলতে পারে, তা নিয়ে অত্যন্ত চমৎকার একটি ঘটনার বর্ণনা এসেছে সহীহ বুখারীতে।

যুবাইর ইবনু মুত'ইম (ﷺ) বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মাগরিবের সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। মুগ্ধ হয়ে তা শুনছিলেন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থাকা যুবাইর (ﷺ)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা আত তুর থেকে তিলাওয়াত করছিলেন। একসময় তিনি (ﷺ) এই আয়াতে পৌঁছুলেন,

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

'তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা (সত্যকে) দৃঢ় বিশ্বাস করে না। আপনার রবের গুপ্তভান্ডার কি তাদের কাছে আছে, না তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী?' [সূরা তুর, ৫২: ৩৫-৩৭]

যুবাইর ইবনু মুত'ইম (ﷺ) বলেন, 'এই আয়াত শোনামাত্র আমার অন্তর গলে গেল, আমার অন্তরে তখন প্রথমবারের মতো ঈমান বাসা বাঁধল।'[২]

সুবহান আল্লাহ! আল্লাহর কালামের কী অসাধারণ শক্তি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হয়েছে, এমন চরম অবিশ্বাসী লোকের অন্তরে ঈমান বসে গেল শুধু একটি আয়াত শুনে। ঘোরতর শত্রু মুহূর্তের মধ্যে শত্রুতা ভুলে পরিণত হলেন একনিষ্ঠ সাহাবীতে।

এখানে আমরা আরেকটি হাদীসের দিকে তাকাতে পারি। এ ঘটনাটি বর্ণনা করছেন আনাস ইবনু মালিক (ﷺ)।

একটা সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে সাহাবী (ﷺ)-দের নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। উপযুক্ত কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া প্রশ্ন করা হলে, এমন অনেক বিষয় হারাম হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল; প্রশ্ন না করলে যেটা জায়েজ থাকত। এ কারণে সাহাবীরা পারতপক্ষে প্রশ্ন করতেন না।

এমন অবস্থায় মদীনার বাইরে থেকে এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করতে শুরু করল। সাধারণত বেদুইনরা হতো নীরস কাঠখোট্টা স্বভাবের। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে, আগপিছ না ভেবে সরাসরি প্রশ্ন করা শুরু করত। সাহাবীরা (ﷺ) এতে খুশিই হতেন। কারণ, বেদুইন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রশ্নোত্তর থেকে তাঁরা (ﷺ) নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারতেন।

---

[২] সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং : ৪৮৫৪

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করবে কি না, তাঁর (ﷺ) ওপর ঈমান আনবে কি না, এই বেদুইন তা যাচাই করতে চাচ্ছিল। তার কথাবার্তার ধরন খেয়াল করুন। বেদুইন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল,

‘আপনি আমাদের এলাকায় একজন লোক পাঠিয়েছেন, সে বলছে আপনি নাকি দাবি করেন, আল্লাহ আপনাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ): ‘হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।’

বেদুইন: ‘তাহলে বলুন, আসমান কে সৃষ্টি করেছে?’

রাসূলুল্লাহ: ‘আল্লাহ’।

বেদুইন: ‘যমীন কে সৃষ্টি করেছে?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ): ‘আল্লাহ’।

বেদুইন: ‘পাহাড়-পর্বত এবং এগুলোর নিচে যা আছে সেগুলো কে সৃষ্টি করেছে?’

রাসূল (ﷺ): ‘আল্লাহ!’

বেদুইন এবার উপসংহারে এল। সে বলল,

قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ

তাঁর শপথ! যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং তা সমুন্নত করেছেন। যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি পাহাড়-পর্বত আর এর ভেতরের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন—বলুন আপনাকে কি আল্লাহ পাঠিয়েছেন?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ।’[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং বেদুইনের কথোপকথনটা একটু খুঁটিয়ে দেখুন।

এ বেদুইন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কথোপকথনের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্বোধন করেছিলেন সরাসরি ‘মুহাম্মাদ’ বলে। আল্লাহর একজন রাসূলের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে জ্ঞানটুকু তার ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, এই আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ (ﷻ)।

তিনি এটা কীভাবে জানতেন? নিজের ফিতরাহ থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এসব সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন।

---

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০। এই বেদুইন ছিলেন বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের যিমাম ইবনু সা'লাবাহ্ (রা.)।

তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ

এবার তাকানো যাক কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের দিকে।

ইমাম আহমাদ

ইমাম আহমাদ[৪] (ﷺ)-কে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন,

ডিমের কথা চিন্তা করো। ডিম আকারে ছোটখাটো, কিন্তু শক্তিশালী দুর্গের মতো। দরজা নেই, জানালা নেই, ভেতরে ঢোকার কোনো পথ নেই। এমনকি বাতাস চলাচলেরও কোনো রাস্তা নেই। বাইরের দিকে ডিমের খোসা চকচকে রুপার মতো। আর ভেতরের কুসুম জ্বলজ্বলে স্বর্ণের মতো। একদিন হঠাৎ করে এই ডিম ফেটে যায়। তারপর এই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে অপূর্ব এক সৃষ্টি। যে শুনতে পায়, দেখতে পায়। এই সৃষ্টি তখন মিষ্টি সুরে গান গাইতে গাইতে যমীনের বুকে হেঁটে বেড়ায়। এ সবকিছু ঘটে এক আবদ্ধ ডিমের খোলসের ভেতর থেকে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কি এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

আল্লাহ কুরআনে প্রশ্ন করছেন,

> أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ
>
> 'আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি?' [সূরা আন নামল, ২৭: ৬০]

ইমাম শাফে'ঈ

আল্লাহর অস্তিত্ব বোঝানোর জন্য ইমাম শাফে'ঈ[৫] (ﷺ) কী উদাহরণ দিয়েছেন

---

[৪] ইমাম আহমাদ (ﷺ) : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আশ শাইবানী ছিলেন ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, যাহিদ, আবিদ, রিজাল শাস্ত্রবিদ, হাফিযুল হাদীস এবং আকীদাহর ইমাম। তিনি মুসলিম উম্মাহর ৪ জন প্রসিদ্ধ ইমামের অন্যতম এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রবর্তক। মু'তাযিলী ফিতনার বিরুদ্ধে তাঁর অবিচল অবস্থানের সূত্রে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর জন্ম ১৬৪ হিজরি সনের রবিউল আওয়্যাল মাসে। জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। হয় তাঁর জন্ম তাঁর পিতার কর্মস্থল তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ শহরে, অথবা তাঁর মা সেখান থেকে গর্ভবতী অবস্থায় বাগদাদ আসার পর তাঁর জন্ম হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাগদাদে অর্জন করার পর ইলম অর্জনের জন্য ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে সফর করেন। তাঁর যুগেই মু'তাযিলীরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে দাবি করে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। তিনি এর বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন। ফলে খলীফা মা'মুন, মু'তাসিম ও ওয়াসিক তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। অতঃপর ২৩২ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিল খলীফা হবার পর এই অত্যাচারের অবসান ঘটে। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহর প্রচার করেন। ২৪১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফে'ঈ (ﷺ), মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত ইমাম,

দেখুন।

তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন তুঁত গাছের পাতার। গজলা হরিণ, সাধারণ হরিণ, ভেড়া, মৌমাছি–অনেক ধরনের প্রাণী এই পাতা খায়। কিন্তু এই প্রাণীগুলোর কাছ থেকে আপনি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পাবেন। গজলা হরিণের কথা ধরুন। তার কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন মেশক[৬]। খাঁটি মেশক আসে পূর্ণবয়স্ক গজলা হরিণের পেট থেকে। আমার যতদূর মনে পড়ে এই মেশক থাকে গজলা হরিণের জননেন্দ্রিয় এবং নাভির মাঝ বরাবর একটা জায়গায়। আজকে আমরা অনেক দাম দিয়ে যে মেশক কিনি সেগুলো আসল মেশক না। খাঁটি মেশক পাওয়া যায় গজলা হরিণ থেকে। আবার দেখুন, রেশমপোকাও এই একই গাছের পাতা খায়। কিন্তু সে আপনাকে দেয় রেশম। ওদিকে মৌমাছিও একই পাতা খায়; কিন্তু তার কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন মধু। ভেড়া আর গরুও এ পাতা খাচ্ছে, কিন্তু তাদের কাছে থেকে আপনি পাচ্ছেন দুধ।

সবগুলো প্রাণী একই গাছের পাতা খাচ্ছে। কিন্তু কেউ দিচ্ছে মধু, কেউ দুধ এবং মাংস, কেউ দিচ্ছে সিল্ক, কেউ দিচ্ছে মেশক।

যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা না থাকতেন, যদি এর পেছনে একজন কারিগর না থাকতেন, যদি সবকিছু র‍্যানডমলি ঘটত, তাহলে একই গাছের পাতার নির্যাস থেকে একই জিনিস বের হতো। সবগুলো প্রাণীই একই রকম জিনিস উৎপন্ন করত। তুঁত গাছের পাতা খেয়ে রেশমপোকা রেশম আর মৌমাছি মধু উৎপন্ন করত না। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

‘এটি আল্লাহর কারিগরি, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত।’ [সূরা নামল, ২৭: ৮৮]

শাফে’ঈ মাযহাবের প্রবর্তক, আইন শাস্ত্রবিদ, হাদীস বিশারদ, উসুলুল ফিক্বহ বা ইসলামী আইন বিজ্ঞানের মূলনীতির প্রবর্তক ও কবি। তাঁর প্রখ্যাত কিতাব হচ্ছে আর রিসালাহ, আল উম্ম, আল মুসনাদ প্রভৃতি। জন্ম ১৫০ হিজরিতে ফিলিস্তিনের গাজায়, মৃত্যু ২০৪ হিজরিতে মিসরের ফুসতাতে।

[৬] মেশক : মেশক বা কস্তুরী মূলত পুরুষ হরিণের পেটে অবস্থিত গ্রন্থিনিঃসৃত সুগন্ধীর নাম। মিলন ঋতুতে পুরুষ হরিণের পেটের কাছের কস্তুরী গ্রন্থি থেকে সুগন্ধ বের হয়, যা মেয়ে হরিণকে আকৃষ্ট করে। ঋতুর শেষে তা হরিণের দেহ থেকে খসে পড়ে যায়। সেটা সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে কস্তুরী তৈরি করা হয়। এ ছাড়া শিকারিরা এ সময় হরিণ শিকার করেও কস্তুরী সংগ্রহ করে। তবে সকল হরিণে কস্তুরী থাকে না, কস্তুরী থাকে যে হরিণে এদের বলে কস্তুরী মৃগ। এটা দিয়ে প্রাণিজ পরিবার বা Family: Moschidae এর অন্তর্ভুক্ত জেনাস: Moschus এর অন্তর্ভুক্ত ৭টি প্রজাতিকে বোঝায়। এই ৭টি প্রজাতির হরিণ থেকেই কস্তুরী পাওয়া যায়। কস্তুরীকে বাজারজাত করতে এর সাথে আরও বেশ কিছু উপাদান যুক্ত করা হয়।

ইমাম আবু হানিফা

আল-আকীদাহ আত-ত্বহাউইয়্যাতে ইমাম আবু হানিফা[৭] (ﷺ)-এর একটি কাহিনি এসেছে। আমরা এটি পড়েছিলাম শাইখ সাফর আল-হাওয়ালির কাছে। আমার মনে আছে, পড়ানোর সময় তিনি এই ঘটনার বিশুদ্ধতা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন। কারণ এ বর্ণনা অনুযায়ী, একদল লোক ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)-কে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়ার চ্যালেঞ্জ করেছিল। শাইখ সাফর আল হাওয়ালির সন্দেহটা এখানেই! খিলাফাহর ভূমিতে কীভাবে একদল লোক আল্লাহর অস্তিত্বে নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখায়!

তবে এ ব্যাপারে আরও বিশদভাবে পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, এই লোকগুলো সম্ভবত ক্বাদরিয়্যাহ ছিল। ক্বাদরিয়্যাহরা হলো একটা বাতিল ফিরকা। তারা তাক্বদীরের সঠিক আকীদাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফাকে যারা প্রশ্ন করেছিল তারা সম্ভবত ক্বাদরিয়্যাহ ছিল।[৮]

আরেকটা সম্ভাবনা হলো, এরা হয়তো মুতাফালসিফ বা দার্শনিক ফিরকার ছিল। সেই সময়ে এই ফিরকার বেশ দৌরাত্ম্য ছিল। নিজেদের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে এরা কুরআন-সুন্নাহকে মাপতে চাইত।

কাজেই যারা ইমাম আবু হানিফাকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল তারা ক্বাদরিয়্যাহ বা মুতাফালসিফ হয়ে থাকতে পারে। কারণ এ বিষয়ে এই

---

[৭] ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) : ইমাম আবু হানিফা নু'মান বিন সাবিত ছিলেন তাবিঈ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস, হাফিযুল হাদীস, আবিদ, যাহিদ ও উম্মতের মহান ইমাম। ইসলামের প্রসিদ্ধ ৪ ইমামের একজন এবং হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর জন্ম ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফা শহরে। কুফাতেই প্রাথমিক ইলম অর্জন করেন। অতঃপর কুফার তৎকালীন প্রধানতম আলিম ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (ﷺ)-এর সুদীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তিনি আনাস বিন মালিক (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বিধায় তাঁকে তাবিঈদের মাঝে গণ্য করা হয়। তিনি ১৫০ হিজরিতে মারা যান। ইমাম আবু হানিফার ফিকহ সংকলন তাঁর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (ﷺ)-এর কিতাবাদিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রন্থও ছাত্রদের কিতাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন : ইমাম মুহাম্মাদের মুওয়াত্তা, ইমাম আবু ইউসুফের আল আসার প্রভৃতি।

[৮] ক্বাদরিয়্যাহরা একটা গোমরাহ ফিরকা। এরা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে তৈরি করার পর সৃষ্টি নিজের মতোই চলে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজ ভাগ্যের স্রষ্টা। তাদের মতে, আল্লাহ তা'আলা আগে থেকে জানেন না যে বান্দা কী করতে যাচ্ছে বা ভবিষ্যতে কী করবে। বান্দা কিছু করে ফেলার পরই কেবল আল্লাহ তা জানতে পারে। আধুনিক কালে যারা তাক্বদীর অস্বীকার করে তাদের সাথে এদের মিল রয়েছে। এদের প্রথম উদ্ভব ঘটে উমাইয়্যা খলীফা উমার ইবনু আব্দিল আযিয (ﷺ)-এর শাসনামলে। প্রথম ক্বাদরিয়্যাহ নেতা ছিল গাইলান আদ দিমাশকী (মৃত্যু: ১০৬ হি.)। তাকে খলীফা হিশাম বিন আব্দিল মালিক দামেস্কের গেটে শূলবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এদের বারোটার মতো উপদল রয়েছে।

দুই ফিরকার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)-এর ঘটনাটি শুনুন।

ইমাম আবু হানিফার কাছে এক লোক এল। দজলা নদী পাড়ি দিয়ে। লোকটি ছিল আহলুস সুন্নাহর একজন। সে অভিযোগ করে বলল, নদীর ওপারে একদল লোক আপনার সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করতে চায়। তারা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, 'ঠিক আছে। তাদেরকে জানাও, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নদী পাড় হয়ে আমি তাদের কাছে পৌঁছে যাব।'

লোকটি খুশিমনে ফিরে গেল। সবাইকে জানিয়ে দিলো, আবু হানিফা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তিনি রওনাও দিয়েছেন। শীঘ্রই এসে পৌঁছবেন। জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় পার হবার পরও ইমাম আবু হানিফা আসলেন না।

বেলা বাড়তে বাড়তে দুপুর হয়ে গেল। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ইমাম আবু হানিফার দেখা নেই। রাতের প্রথম প্রহরও পার হয়ে গেল। তবু ইমামের দেখা নেই। বিরুদ্ধপক্ষের লোকজন এবার হাসিঠাট্টা করতে শুরু করল। মুসলিমরা পড়ে গেল দুশ্চিন্তায়। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন আবু হানিফা এক কথার মানুষ! কথা দিলে যেকোনো মূল্যে তিনি সেই কথা রাখেন। নিশ্চয় তিনি কোনো কঠিন বিপদে পড়েছেন। যে কারণে তিনি এখনো আসছেন না।

শেষ পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা যখন এসে পৌঁছালেন তখন পার হয়ে গেছে মধ্যরাত। সবাই প্রশ্ন করা শুরু করল।

কী হয়েছিল আপনার? আপনি কেন দেরি করলেন? কোনো সমস্যা হয়েছিল কী?

এবার ইমাম আবু হানিফা কথা শুরু করলেন। তিনি বললেন,

'আচ্ছা... আমি যদি বলি, এখানে আসার সময় নদীর তীরে এসে আমি কোনো মাঝি বা নৌকা পেলাম না। তখন আমি দেখলাম গাছ থেকে কিছু ডাল আপনা-আপনি বের হয়ে এল। তারপর নিজে থেকে নিখুঁতভাবে তক্তাতে পরিণত হলো। তারপর পানির নিচ থেকে বের হয়ে এল পেরেক। পেরেকগুলো নিজে নিজে তক্তাতে গেঁথে গেল। তারপর তক্তাগুলো নিজে নিজে জুড়ে গিয়ে একটা নৌকার আকৃতি নিল। নৌকার ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেল নিজে নিজেই। তারপর নৌকাটা নিজে নিজেই পানিতে ভেসে পড়ল। তারপর আবার এপারে এসে নৌকা সুন্দরমতো ঘাটে ভিড়ল।

আমি যদি এমন বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে?'

বিতর্কের জন্য যারা চ্যালেঞ্জ করেছিল, এ কথা শুনে তারা হাসতে শুরু করল।

আরে! এমন হওয়া তো অসম্ভব! কারিগর ছাড়াই এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরি হয় নাকি? অসম্ভব। এই লোক পাগল নাকি? ইনি নাকি সবচেয়ে বড় আলিম! তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) এবার বললেন,

'কোনো কারিগর ছাড়া সামান্য একটা নৌকা তৈরি হতে পারে, এটাই তোমরা বিশ্বাস করতে পারছ না! তাহলে তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করো যে এই বিশাল মহাবিশ্ব, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, এইসব কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? কারিগর ছাড়া নৌকা সৃষ্টি হয়েছে, এটা তোমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তাহলে স্রষ্টা ছাড়া এই বিশাল মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে–এটা কীভাবে তোমরা বিশ্বাস করো?'

আসলেই তো। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন। ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, কোনো কিছু কি শূন্য থেকে আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে? এমন কথা বললে লোকে আপনাকে পাগল বলবে। মানুষ তাহলে কীভাবে বলে, এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে?

তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব

দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয় প্রতিরোধ করার জন্য তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহর জ্ঞান জরুরি। শয়তান যখন আপনাকে ওয়াসওয়াসা দেবে, যখন সে অন্তরে সংশয় তৈরি করার চেষ্টা করবে, তখন তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহর জ্ঞান দিয়ে আপনি তাকে কাবু করবেন। যখন মনে দুশ্চিন্তা আসবে, যখন বালা-মুসিবত বেড়ে যাবে, সব ভুলে একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকবেন। তাঁর বড়ত্বের কথা ভাববেন। তিনিই আঁধার দূর করে দেবেন।

কয়েক সপ্তাহ আগের এক ঘটনা বলি। একটা কাজে আমি গিয়েছিলাম অন্য এক শহরে। সেখানে এক ভাই আমাদের একটা ট্রিপে নিয়ে গেলেন। জাহাজে চেপে শহর দেখার ট্রিপ। চমৎকার একটা জাহাজে উঠলাম। সেদিন খুব ঠান্ডা পড়েছিল। আর আমাদের একটু দেরিও হয়ে গিয়েছিল। আমরা ছাড়া আর কেউ সেখানে তখন ছিল না। ট্রিপটা ছিল এক ঘণ্টার মতো। জাহাজটা শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর সাথে থাকা গাইড বিভিন্ন স্থাপত্যকর্ম আর দালানকোঠার খুঁটিনাটি বিভিন্ন তথ্য জানাচ্ছিল আমাদের। শহরের একেক বিল্ডিং একেক স্টাইলে, একেক ধাঁচে বানানো। প্রত্যেকটির নানান বিশেষত্ব।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা ছোট্ট গাছ দেখতে পেলাম। গাইড সবাইকে গাছটার দিকে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করল। বলল, '১৩ বছর ধরে আমি গাইডের

কাজ করছি। এতসব বিল্ডিংগুলোর জটিল সব নকশা আমার কাছে পরিষ্কার। কিন্তু কীভাবে নিরেট সিমেন্টের ওপরে এই গাছ জন্মাল, আজও আমি সেটা বুঝতে পারিনি। ১৩ বছর ধরে আমি এই রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।'

সুবহান আল্লাহ! এই হলো আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা। আল্লাহর সৃষ্টির বিস্ময়ে এ কথাগুলো তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে।

এ জন্যই আমরা আকীদাহ শিখি। অন্তরকে সজীব করতে, ঈমানকে মজবুত করতে আকীদাহ নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করা উচিত। আকীদাহর জ্ঞান আপনার ঈমানকে চাঙা করবে। অন্তরের সংশয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে। আর যখন এগুলো থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন, তখন ঈমানের এক নতুন স্তরে পৌঁছাবেন। যখন আপনি সব সংশয়ের প্রতিরোধ করবেন এবং অন্তরে তাওহিদ ধারণ করবেন, তখন আপনার তাওহিদ পৌঁছাবে ঈমানের স্তরে। আর এই স্তর পার হতে পারলে আপনি পৌঁছাবেন 'ইহসানের' স্তরে। এমন অবস্থায় যখন আপনি দু'আ করবেন, যখন আপনি সত্যই বিশ্বাস করবেন যে আপনি নিজের রবের সাথে কথা বলছেন, তখন আপনার দু'আতে প্রাণ থাকবে। আপনি তখন নিশ্চিতভাবে জানবেন, মরুভূমির বুকে কিংবা সিমেন্টের ওপরে যে আল্লাহ গাছ জন্মাতে পারেন, সেই আল্লাহ আপনাকে যেকোনো কিছু দিতেও পারেন। আমাদের কাছে যা অসম্ভব, সেটা তাঁর জন্যে কিছুই না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٦٠ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢

'তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন? অতঃপর আমি তার সাহায্যে সুন্দর সুন্দর বাগান উৎপন্ন করেছি। তোমরা তার (বাগানের) গাছপালা উৎপন্ন করতে পারতে না। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তারা তো এমন এক জনগোষ্ঠী যারা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়।

তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন—যিনি পৃথিবীকে একটি বাসস্থান বানিয়েছেন, তার মাঝে নদ-নদী তৈরি করেছেন, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং (লোনা ও মিঠা পানির) দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় রেখেছেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই (সত্য) জানে না।

তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন—যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।' [সূরা নামল, ২৭: ৬০-৬২]

এক বেদুইনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহ যে আছেন এটা তুমি কীভাবে জানলে?'

বিশুদ্ধ ফিতরাতের অধিকারী সরলমনা সেই বেদুইন উত্তরে বলল,

'এই যে দেখো উটের বিষ্ঠা আর ওই যে গাধার বিষ্ঠা। এগুলো থেকেই প্রমাণিত হয়, এখানে উট আর গাধা ছিল। আর বালিতে থাকা পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায়, এখানে একজন পথিক ছিল। তাহলে এত নক্ষত্র ভরা আকাশ আর এই বিশাল সমুদ্র কি প্রমাণ করে না যে, একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আছেন?'

আলহামদুলিল্লাহ, এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দারস শেষ করলাম।

দারস ২

গত দারসে আমরা উসুল আস-সালাসার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছিলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে,

(اعْلَمْ) رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِلِ والْعَمَلُ بِهِنَّ

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

তারপর লেখক (ﷺ) বলেছেন,

(الأُولَى) أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا

'(প্রথম বিষয়) আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং রিযক দান করেছেন।'

গত দারসে আমরা তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ তথা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর কথা আলোচনা করেছিলাম। আজ আমাদের আলোচনা হবে রিযক নিয়ে।

আল্লাহ আমাদের রিযকদাতা

রিযক! জীবনভর এই বিষয়টি নিয়েই বোধহয় সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করে মানুষ। রিযকের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা অনেক সময় তাওহিদ এবং আকীদাহয় ত্রুটি তৈরি করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

কুরআন এবং সুন্নাহয় বারবার রিযকের আলোচনা এসেছে। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য। প্রশান্তি দেয়ার জন্য। সাহস জোগানোর জন্য। তবে কুরআন-হাদীসে বারবার রিযকের আলোচনা আসার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের তাওহিদকে পূর্ণতা দেয়া। আল্লাহ যেমন তাঁর রুবুবিয়্যাহতে সার্বভৌম–রব হিসেবে, মালিক হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়– তেমনিভাবে রিযক দেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সার্বভৌম। আল্লাহ

যেমন সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র রব, ঠিক তেমনি তিনি একমাত্র রিযকদাতা। রিযক প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং বিশ্বের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী।

গত সপ্তাহে আমরা এমন ৫টি আয়াতের আলোচনা করেছিলাম, যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

> وَلَئِن سَأَلْتَهُم
>
> যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন...

রুবুবিয়্যাহর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে চরম উদ্ধত কুরাইশরাও স্বীকার করত, রব হলেন আল্লাহ। রিযকের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
>
> 'তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিযক দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই-বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও তোমরা ভয় করছ না?' [সূরা ইউনুস, ১০: ৩১]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
>
> 'বলো, আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদেরকে রিযক দান করেন? বলো, আল্লাহ। হয় আমরা, না হয় তোমরা অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত অথবা স্পষ্ট গুমরাহিতে পতিত।' [সূরা সা'বা, ৩৪: ২৪]

এ দুটি আয়াতের সাথে আগের পাঁচটি আয়াতের মিল আছে। আল্লাহ এখানে নবী (ﷺ)-কে কুরাইশদের রিযকের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বলছেন—কে রিযক দান করেন? রিযকের মালিক কে? চরম উদ্ধত মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশের লোকেরা স্বীকার করে নিয়েছিল, আল্লাহ তাদের রিযক দেন।

আর-রাযিক এবং আর-রাযযাকের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহর পবিত্র নামগুলো কত অর্থবহ, কতটা নিখুঁত তা আমাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব না। আর-রাযযাক এবং আর-রাযিক, দুটোই আল্লাহর গুণবাচক নাম। দুটোই যুক্ত রিযক দানের সাথে। দুটো নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারছি, তিনিই

একমাত্র রিযকদাতা। তাহলে কেন একই বিষয়ে দুটো নাম? আর-রাযিক (الرازق) আর আর-রাযযাক (الرزاق) এর মধ্যে পার্থক্য কী?

আর রাযিক দ্বারা বোঝানো হয় সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিযক নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সব সৃষ্টির জন্য তাঁর চিরন্তন ও পরিপূর্ণ জ্ঞানে রিযক নির্ধারণ করেছেন। তিনি আমাদের রিযক ঠিক করে দিয়েছেন আমাদের জন্মের আগেই। আসমান-যমীন সৃষ্টি হবার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তিনি কলমকে নির্দেশ দিয়েছেন সবার রিযক লেখার। আর এর আগেও আপনার-আমার রিযক কী হবে তা আল্লাহর পরিপূর্ণ ও চিরন্তন ইলমে জ্ঞাত ছিল। এটাই হলো 'আর-রাযিক' এর অর্থ। অর্থাৎ রিযক নির্ধারণ করা।

'নির্ধারণ করা' আর 'দান করা' কিন্তু এক না। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আর-রাযিক দ্বারা নির্ধারণ করাকে বোঝানো হয়।

এবার দেখা যাক 'আর-রাযযাক' এর অর্থ কী।

আর-রাযযাক হলেন এমন একজন যিনি রিযক বিতরণ করেন। যিনি অবিরত রিযক বণ্টন করেন সুবিন্যস্ত ও পরিপূর্ণভাবে। তিনি আমাদের মধ্যে রিযক বণ্টন করেন প্রতিনিয়ত। 'প্রতি মুহূর্তে' বলেও আসলে ব্যাপারটা বোঝানো সম্ভব না। প্রতি ন্যানোসেকেন্ড বা তার চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানেও আল্লাহ রিযক বিতরণ করা বন্ধ করেন না। আর-রাযযাক অর্থ, সৃষ্টির জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা বণ্টনে তিনি উদার। তিনি সবচেয়ে মহানুভব, সর্বাধিক দানশীল, নিরন্তর দাতা। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রিযকের পর রিযক, নিয়ামাতের পর নিয়ামাত দান করেন।

তাহলে আমরা বুঝলাম, আর-রাযিক মানে হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির রিযক নির্ধারণ করেন। এবং আর-রাযযাক মানে হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্যে নির্ধারিত রিযক বণ্টন করেন।

রিযক কী?

রিযক কী? আমরা সবাই ভাবি এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা। কিন্তু আসলেই কি তাই?

ইবনু মানযুর[৯] (ﷺ) বলেন, রিযক মাদ্দিয়্যাহ এবং মা'নাউয়িয়্যা। অর্থাৎ রিযক বস্তুগত হতে পারে আবার অবস্তুগতও হতে পারে।

কাজেই রিযক শুধু বস্তুগত জিনিসপত্রে সীমাবদ্ধ না। রিযক মানে শুধু খাওয়া, ধনসম্পদ,

---

[৯] প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ও ইমাম। জন্ম ৬৩০ হিজরি এবং মৃত্যু ৭১১ হিজরি। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ معجم لسان العرب في اللغة.

টাকা-পয়সা, পোশাক-আশাক, আলিশান বাড়ি, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি না। রিযকের সীমানা আরও বিস্তৃত। আল্লাহ আপনাকে ইসলাম দিয়েছেন, ঈমান দিয়েছেন—এটা রিযক। এই যে আপনি তাওহিদ সম্পর্কে পড়ছেন, শেখার সুযোগ পাচ্ছেন—এটাও রিযক। আপনার চোখ শীতলকারী স্ত্রী, আপনার সন্তানও রিযক। আপনার স্বাস্থ্য, আপনার ধনসম্পদ, রাতের ঘুম—এগুলোও রিযক। মানসিক প্রশান্তিও রিযক। আপনি যদি জান্নাতে যান—আর আমরা আন্তরিকভাবে চাই আপনি জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী হন—তাহলে জান্নাতে আপনার জন্য যে পুরস্কার অপেক্ষা করছে তার সবকিছুও রিযক।

আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিযক

তাওহিদ বিশুদ্ধ হতে হলে, তাওহিদে বিশ্বাস পরিপূর্ণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, কেবল আল্লাহই হলেন আর-রাযযাক—রিযকদাতা। এই বিশ্বজগতে আর কারও রিযক দেবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। এ কথাটা অন্তরে খোদাই করে নিন। হৃদয়ের গভীরে বসিয়ে নিন। এটা কখনোই ভোলা যাবে না। আপনার রিযকের মালিক আল্লাহ; শুধুই আল্লাহ। এর বিপরীত যা কিছু অন্তরে আছে সেগুলোকে বের করে ফেলে দিতে হবে খুঁড়ে খুঁড়ে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, আমাদের রিযক আসমানে। তিনি বলেছেন,

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

> 'আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিযক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।' [সূরা যারিয়াত, ৫১: ২২]

আমাদের এই আয়াতে বিশ্বাস রাখতে হবে। অনেকে হয়তো বলতে পারে, 'ভাই, বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করো! আমার রিযক আকাশে কীভাবে থাকে? আমার অফিস তো এখানে! আমার রিযক কীভাবে আসমানে থাকবে? আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তো এই রাস্তার মাথায়! আমার রিযক কীভাবে আকাশে থাকবে? আমার সব টাকা তো ব্যাংকে? আমার টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি সবকিছু তো আমার সাথেই আছে। আমার চোখের সামনেই আছে! তাহলে আমার রিযক আসমানে কীভাবে হয়?'

দেখুন, এগুলো রিযক অর্জনের মাধ্যম (আসবাব)। আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন যেন আপনি নির্ধারিত রিযক অর্জন করতে পারেন। সপ্ত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ আপনার বসকে চালিত করেছিলেন বলেই, মাসে মাসে বস আপনাকে একগাদা টাকা দিচ্ছে। রিযক আসছে আল্লাহর তরফ থেকে, আপনার বস একটা মাধ্যম মাত্র। ক্রেতারা যখন হাঁটতে হাঁটতে আপনার দোকানে ঢুকে পড়ে, তখন তারা আসমানের ইশারাতেই আপনার রিযক নিয়ে আসে।

আপনার রিযক নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ। আপনার বস কিংবা দোকানের ক্রেতা না। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের বলছেন, আপনার রিযক তিনি দেন—এটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আমাদের রিযক আকাশে, এ পৃথিবীতে না।

আল-আসমাঈ এবং বেদুইন

ইবনু কুদামাহ (رحمه الله) এবং আল-কুরতুবি (رحمه الله) সনদসহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বসরার বিখ্যাত আলিম আল-আসমাঈ[১০] (رحمه الله) বলেন,

'একদিন আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে নগরীর অলিগলিতে হাঁটছিলাম। এমন সময় আমার দিকে এগিয়ে এল রুক্ষ ও কঠোর চেহারার এক বেদুইন। এক হাতে থালা আরেক হাতে তলোয়ার। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন গোত্রের লোক?' আমি বললাম, 'আসমা গোত্রের।'

বেদুইন এবার প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আল-আসমাঈ?'

'হ্যাঁ। আমিই সেই লোক।'

বেদুইন আল-আসমাঈকে সালাম দিয়ে বসে পড়লো। তারপর আবার প্রশ্ন করল, 'তুমি কোন অঞ্চল থেকে এসেছ? কোন এলাকা? আমাকে বিস্তারিত বলো।'

আল-আসমাঈ দাওয়াহর সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন। এমনভাবে উত্তর দিলেন, যেন আলোচনার মোড় ঘুরে যায় ইসলামের মৌলিক বিষয়ের দিকে। তিনি বললেন, 'আমি এমন এক ভূমি থেকে এসেছি, যেখানকার অধিবাসীরা রাহমানের কালাম পাঠ করে।'

বেদুইন অবাক হয়ে গেল। বলল, 'আর-রাহমানের এমন কালাম আছে যা মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়? কী সেটা! আমাকে শোনাও!'

আল-আসমাঈ কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। সূরা আয-যারিয়াত। ২২ নম্বর আয়াতে পৌঁছালেন—

> وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
>
> 'আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিযক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।' [সূরা যারিয়াত, ৫১:২২]

'যথেষ্ট হয়েছে! এবার থামো!' বেদুইন বলে উঠল।

---

[১০] ইমাম আসমাঈর নাম ছিল আবু সাঈদ আব্দুল মালিক। জন্ম : ১২১ হিজরি, মৃত্যু : ২১৬ হিজরি। তিনি ছিলেন বসরার প্রসিদ্ধতম আরবী ব্যাকরণবিদদের একজন, ভাষা বিজ্ঞানী, কবি, বংশবিদ্যা বিশারদ এবং জীব বিজ্ঞানী। তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের সভাসদ ছিলেন।

আল-আসমাঈ বললেন, 'এটা আল্লাহর কালাম। এগুলো আল্লাহর কথা।'

'এগুলো আল্লাহর কথা?' বেদুইন প্রশ্ন করল।

আল-আসমাঈ বললেন, 'হ্যাঁ। এগুলোই আল্লাহর কথা। তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে তা নাযিল করেছিলেন।'

বিস্মিত বেদুইন উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে তার উট জবাই করে ফেলল। চামড়া ছাড়াল। তারপর আল-আসমাঈ (রহিমাহুল্লাহ)-কে বলল, 'এসো, গরিব মানুষের মধ্যে এই মাংস বিলিয়ে দিতে আমাকে সাহায্য করো।'

মাংস বিলানোর পর বেদুইন তার তলোয়ার আর ধনুক ভেঙে ফেলল। তারপর বারবার সেই আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে চলে গেল মরুভূমির দিকে...

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিযক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।' [সূরা যারিয়াত, ৫১: ২২]

আল আসমাঈ নিজেকে দোষ দিতে শুরু করলেন, 'আমার ঈমান কেন এই বেদুইনের মতো শক্ত না'?[১১]

বেদুইনদের অনেকেরই আরবী ভাষার ওপর বেশ দক্ষতা থাকত। আয-যারিয়াতের ২২ নম্বর আয়াত শোনামাত্রই বেদুইন নিজের অন্তরে তা গেঁথে নিয়েছিল। আল-আসমাঈর সাথে দেখা হবার আগে সে রিযক নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকত, রিযকের খোঁজে ছুটে বেড়াত সব সময়। এই আয়াত শোনামাত্র তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।

'আরে! আমি রিযক নিয়ে এত কেন পেরেশান হচ্ছি–যেখানে আল্লাহ (ﷻ) সাত আসমানের ওপর থেকে আমাকে রিযকের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন?

আসমান থেকে রিযক আসছে এটা জানার পর তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। অন্তরে প্রশান্তি এল।

বেদুইনের কাহিনি এখানেই শেষ না। অনেক বছর পরের কথা।

আল-আসমাঈ (রহিমাহুল্লাহ) খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে হজ্ব করতে মক্কা গিয়েছেন। পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকল কেউ একজন। বসরার গলিতে দেখা সেই বেদুইন। বেদুইন বৃদ্ধ হয়েছে। চেহারায় বয়সের ছাপ। পুরোনো দিনের মতোই তাঁরা আবার একসঙ্গে বসলেন। বেদুইন তাঁকে অনুরোধ করল কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে শোনাতে। আল-আসমাঈ আবার সূরা আয-যারিয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন।

[১১] ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ), আল জামি লি-আহকামিল কুরআন : ১৭/৪২

একের পর এক আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন। অবশেষে পৌঁছালেন সূরা আয-যারিয়াতের সেই ২২ নম্বর আয়াতে,

> وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ
>
> ‘আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিযক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’ [সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ২২]

পুরোনো দিনের মতোই বেদুইন তাঁকে থামিয়ে দিলো। বলল, ‘আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি। তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য। আমাকে আরও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান।’

আল-আসমাঈ তিলাওয়াত করলেন,

> فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ
>
> ‘অতএব এ আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, এসব কথা তোমাদের কথাবার্তার মতোই নিশ্চিত সত্য।’ [আয যারিয়াত, ৫১: ২৩]

আল্লাহ এখানে নিজের নামে শপথ করছেন। তিনি বলেছেন,

> ‘...এ আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ’

আর এই শপথের ঠিক পরেই এসেছে (ل حقٌّ) ‘লা হাক্ক’। ‘লা হাক্ক’ এর এই লাম হলো লাম-আত-তাওকিদ। লাম-আত-তাওকিদের মাধ্যমে নিশ্চয়তা, গুরুত্ব, সত্যায়ন এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ জোর দিয়ে, দৃঢ়ভাবে বলছেন–নিশ্চিতভাবেই, কোনো সন্দেহ ছাড়াই, অবশ্যই, অবশ্যই রিযক আসে আসমানের ওপর থেকে।

এই আয়াত শোনার পর বিস্মিত হয়ে গেল বেদুইন। চিৎকার করে বলল,

‘কারা সেই নির্বোধ, যারা মহান আল্লাহর ওয়াদা অবিশ্বাস করেছিল? কারা সেই নির্বোধ যারা আল্লাহকে এতটাই ক্রোধান্বিত করেছে, যার কারণে তিনি–আল-জালীল, আল-কারীম, আল-ক্বাইয়ূম–নিজের নামে শপথ করলেন? কারা সেই মূর্খ?’

বেদুইন আল-আসমাঈর সামনেই সূরা আয-যারিয়াতের ২৩ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকল এবং তৃতীয়বার তিলাওয়াত করার সময়ে সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করল! সে মৃত্যুবরণ করল এই আয়াতের ওজনে, এর গভীরতায়।[১২]

আল্লাহ (ﷻ) এ আয়াতে বলেছেন,

---

[১২] প্রাগুক্ত

مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُون

'যেভাবে তোমরা একে অন্যের সাথে কথাবার্তা বলো।'

কেন রিযকের কথা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ মানুষের একে অপরের সাথে কথোপকথনের উপমা দিলেন?

এর পেছনে দুটি কারণ আছে।

আল্লাহ বলছেন, আমরা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারি, তা নিয়ে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে রিযক আসমান থেকে আসে। আপনি যে কথা বলতে পারেন, এ নিয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে? নেই। তেমনিভাবে আপনার রিযক যে আসমান থেকে আসে সেটা নিয়েও কোনো সন্দেহের জায়গা নেই।

দ্বিতীয়ত ধরুন, আপনার জিহ্বা, আপনার মুখ, আপনার ভোকাল কর্ড কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিল। এখন সেগুলো ব্যবহার করে সে কি কথা বলতে পারবে? নিশ্চয়ই না। একইভাবে আপনার রিযক আসে আকাশ থেকে। এই রিযক আপনার জন্য বরাদ্দ। আর কেউ, আর কোনো শক্তি এই রিযক নিতে পারবে না। যেটা আপনার সেটা আপনারই থাকবে। তাই এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আপনার জন্য বরাদ্দ রিযক আপনার কাছে আসবেই।

এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসে। রিযক সংশ্লিষ্ট অজস্র আয়াত এবং হাদীসগুলোতে কেন বারবার শপথ করা হয়েছে? একটু মনোযোগ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুনলে ইতিমধ্যেই আপনার তা বুঝে ফেলার কথা। রিযক হলো এমন এক বিষয় যেখানে অনেক মানুষের তাওহিদ দুর্বল হয়ে যায়। রিযকের দুশ্চিন্তা মানুষকে কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। মানুষ তাওহিদ ভুলে যায়, কিংবা তার তাওহিদে ফাটল ধরে। টাকা, ঘরভাড়া, খাবার, রিটায়ারমেন্ট, সঞ্চয়—রিযকের দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলে মানুষের চিন্তাকে। রিযক সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং হাদীসগুলোতে ঘনঘন শপথ করার মাধ্যমে বক্তব্যকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আশ্বস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ চান আমরা নিশ্চিত হয়ে, প্রশান্ত মনে বিশুদ্ধ তাওহিদে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করি এবং একনিষ্ঠভাবে সীরাতুল মুস্তাকীমের ওপর থাকি।

রিযক আল্লাহর কাছ থেকে আসে

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

'পৃথিবীতে চলমান সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি তাদের

অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন। সবকিছুই এক স্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে।' [সূরা হুদ, ১১: ৬]

রিযক কার ওপর নির্ভর করে?

عَلَى ٱللَّهِ

আল্লাহর ওপর।

আপনার বসের ওপর? বাবা-মায়ের ওপর? চাকরির ওপর? সরকার, দেশ বা কোনো সংস্থার ওপর?

না। রিযক নির্ভর করে আল্লাহর ওপর। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

'তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন।'

মানুষ অন্য মানুষকে রিযক দেয় না, দিতে পারে না। মানুষ মাধ্যম কেবল। দুঃখকষ্টের সময়, বিশেষ করে অর্থ কষ্টে পড়লে অনেকে ভাবে, আল্লাহ্ বোধহয় তাকে ভুলে গিয়েছেন। মুখে হয়তো বলে না। কিন্তু মনের ভেতর এই চিন্তা কাজ করে। এই চিন্তার উত্তর আছে সূরা হুদের এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশে ।

'তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন।'

আল্লাহ্ আপনার আবাসস্থল সম্পর্কে জানেন, আপনার সমাধিস্থল সম্পর্কেও জানেন। জন্মের আগে আপনি কোথায় ছিলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোথায় থাকবেন তা আল্লাহ্ জানেন। মৃত্যুর পর আপনার স্থান কোথায় সেটাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ এখানে আবারও তাঁর বান্দাদের আশ্বস্ত করছেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। শান্ত হোন। দুশ্চিন্তা বাদ দিন। যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন তখনো আল্লাহ্ আপনার অবস্থান জানতেন, যখন অন্ধকার কবরে যাবেন তখনো জানবেন। কেবল তিনিই সব সময়, সর্বাবস্থায় আপনার জন্য নিয়ামাত, রিযক দিয়ে গেছেন। তিনি আপনাকে ভুলে যাননি। তিনি কখনো ভুলে যান না।

আল্লাহ্ পশুপাখির জন্য রিযকের ব্যবস্থা করেন। সেই আল্লাহ কেন তাঁর সম্মানিত সৃষ্টি মানুষের জন্য রিযকের ব্যবস্থা করবেন না? আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ

'আর আমরা আদমসন্তানদের সম্মানিত করেছি।' [সূরা আল ইসরা, ১৭: ৭০]

আল্লাহ্ পশুপাখির জন্য রিযকের ব্যবস্থা করেন। যারা আল্লাহর নামে জঘন্য অপবাদ দেয়, যারা দাবি করে আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন—সেই জঘন্য অপরাধীদের জন্যও রিযকের ব্যবস্থা করেন তিনি। তাহলে যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাঁদের জন্য

আল্লাহ রিযক পাঠাবেন না? পশুপাখি, কাফির, মুসলিম—সবারই রিযকের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ।

ইব্রাহীম (ﷺ) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন যেন তিনি মক্কাকে নিরাপদ শহর বানিয়ে দেন এবং যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে শুধু তাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দেন।

رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

'হে মালিক, এ শহরকে তুমি একটি নিরাপদ শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২৬]

আল্লাহ যেন ইব্রাহীম (ﷺ)-এর দু'আ সংশোধন করে জানিয়ে দিলেন, তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকেই রিযক দান করেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

'যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করতে থাকব, অতঃপর অচিরেই আমি তাদের আগুনের আযাব ভোগ করতে বাধ্য করব, যা সত্যিই বড় নিকৃষ্টতম গন্তব্য।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২৬]

নিজের অন্তরে কথাগুলো গেঁথে নিন। খোদাই করে নিন। আপনার রিযক কেবল আল্লাহর হাতে। বস, ব্যবসা, চাকরি কিংবা সরকারের হাতে না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, মহাশক্তিমান।' [সূরা আয যারিয়াত, ৫১: ৫৮]

আল্লাহর কাছে চান, কোনো সৃষ্টির কাছে চাইবেন না।

রিযক নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়

আমরা আগেই বলেছি, রিযক অপরিবর্তনশীল। মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই আপনার রিযক লেখা হয়ে গেছে। দিন-রাত এক করে দুনিয়ার পেছনে ছোটা, দুশ্চিন্তায়

পেরেশান হয়ে যাওয়া কিংবা নিরুদ্বেগ জীবনযাপন—যা-ই করুন না কেন, আপনার জন্য আল্লাহ যতটুকু রিযক বরাদ্দ রেখেছেন ঠিক ততটুকুই আপনি পাবেন। এক চুল পরিমাণ কমবে না, বাড়বেও না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা একজন ফেরেশতাকে মাতৃগর্ভের দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। যখন বান্দা গর্ভে আসে তখন এই ফেরেশতা বলে,

أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ

হে আল্লাহ, নুতফা (বীর্য)?

অর্থাৎ আমি কি নুতফা অবস্থা থেকে একে আগে বাড়াব?

তারপর ফেরেশতা বলে,

أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ

হে আমার রব, আলাক্বা (জমাটবদ্ধ রক্ত)?

এবার কি জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হবার সময় এসেছে? ফেরেশতা আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইবেন।

তারপর ফেরেশতা বলবেন,

أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ

হে আমার রব, মুদ্বগ্বাহ (মাংসখণ্ড)?

সে কি এখন মাংসখণ্ডে পরিণত হবে?

فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: قَالَ الْمَلَكُ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ، أَوْ أُنْثَى؟

আল্লাহ যখন গর্ভস্থিত ভ্রূণের সৃষ্টি সম্পন্ন করার ইচ্ছা করেন তখন ফেরেশতা প্রশ্ন করে—সে কি পুরুষ হবে, নাকি নারী হবে?

তারপর সে প্রশ্ন করবে?

شَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ؟

'সে কি দুর্ভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান হবে?'

অর্থাৎ প্রতিটি ধাপে এই ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেবে।

সবশেষে ফেরেশতা প্রশ্ন করবে,

فَما الرِّزْقُ؟ فَما الأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذلكَ في بَطْنِ أُمِّهِ

'ইয়া আল্লাহ, এর আয়ু এবং রিযক কী হবে?' এরপর (আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী) এই সবকিছু মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই লিখে ফেলা হবে।'[১৩]

অথচ ওই ভ্রূণ তখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। সে তখনো মায়ের গর্ভে। লক্ষ করুন, আমি কিন্তু বলছি না, মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় আপনার রিযক নির্ধারিত হয়েছে। না আপনার রিযক নির্ধারিত হয়েছে তারও অনেক আগে। আপনি যখন ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভে একটু একটু করে আকৃতি পাচ্ছিলেন তখন ফেরেশতারা আপনার রিযক সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এই সময় ফেরেশতারা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেতে শুরু করে। কিন্তু আপনার রিযক নির্ধারিত হয়েছে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। আমি আপনার জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বলছি না। আপনার, আমার, আমাদের সবার রিযক নির্ধারিত হয়ে গেছে আসমানসমূহ ও যমীন তৈরি হবার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সবকিছু লিখিত আছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। বাদ দেয়া হয়নি খুঁটিনাটি কিছুই। আপনার জন্য নির্ধারিত প্রতিটি ফোঁটা পানির কথা লেখা আছে। এক ফোঁটা পানি তো অনেক বড়, এর চেয়েও ক্ষুদ্র–অণু, পরমাণুর চেয়েও ছোট–কোনো রিযক; ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা তার চেয়েও ছোট যেমন কোয়ার্ক, লেপটন পর্যায়ের কোনো রিযকও যদি আপনার জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে তা লিখিত আছে। নিশ্চিত থাকুন সেটা আপনার কাছে আসবেই। যত ক্ষুদ্র হোক, সেটা আপনার কাছে আসবে। কোনো হেরফের হবে না। আল্লাহু আকবার! মহান আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য রিযক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তা লেখা হয়ে গেছে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই। আর এটা লেখা হবার আগেও তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চিরন্তন গ্বাইবী জ্ঞানে ছিল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ সৃষ্টিসমূহের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন।'[১৪]

জীবন ও রিযকের ক্ষেত্রে আল্লাহ পথচলার উপমা দিয়েছেন। রিযক আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আপনি ধীরেসুস্থে এগিয়ে যান। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রিযক আপনার পথে অপেক্ষা করছে। আপনার রিযক আপনারই

---

[১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৪৬; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১২৪৯৯

[১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৫৩

থাকবে। অন্য কারও কাছে যাবে না।

ধরুন, আপনাকে একটা বইয়ের শেলফ দেখিয়ে বলা হলো এই সবগুলো বই আপনার। বইগুলোতে আর কেউ হাত দেবে না। সব আপনার। আজ থেকে শত শত বছর পরও এগুলো আপনার থাকবে। যতদিন, যত বছর যাক না কেন, এগুলো এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে এখানে। কেউ একবার ধরেও দেখবে না।

আপনি কি এটা শোনার পরপরই লাফ দিয়ে উঠবেন? ছুটে গিয়ে হাত ভর্তি করে একেবারে বাসায় নিয়ে যাবেন সব বই? নিশ্চয় না। রিযকের ব্যাপারটিও এ রকমই। আপনার জন্য নির্ধারিত রিযক আপনার কাছে আসবেই আসবে। পৃথিবীর কোনো শক্তির বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নেই আপনার রিযকে ভাগ বসানোর, বা আপনার কাছ থেকে নির্ধারিত রিযক কেড়ে নেবার। এত পেরেশান হবার, দুশ্চিন্তায় ভোগার, ছোটাছুটির দরকার নেই। শান্ত হোন। আপনার রিযক আপনার কাছে আসবেই।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ
>
> 'তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযক তোমরা আহার করো; তাঁর কাছেই হবে পুনরুত্থান।' [সূরা মূলক, ৬৭: ১৫]

আল্লাহই যমীনকে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আর আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নির্ধারিত রিযকের। কাজেই এত চিন্তা কিসের? রিযকের পেছনে, দুনিয়ার পেছনে ক্রমাগত ছোটার কিছু নেই। সারাক্ষণ দুনিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বরং মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনের কথা ভাবুন। দুনিয়াতে আপনার রিযক নিশ্চিত। আল্লাহ আপনার রিযকের গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু আখিরাতে কী হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা আপনার কাছে নেই। রিযকের গ্যারান্টি আছে, কিন্তু আখিরাতে মুক্তির গ্যারান্টি নেই। তাই আখিরাতের পেছনে ছুটুন। দুশ্চিন্তা করুন কিয়ামাতের দিন নিয়ে। আপনার হিসেব নিয়ে দুশ্চিন্তা করুন। কীভাবে জান্নাতে ঢোকা যায়, কীভাবে জান্নাতের উঁচু স্তরে পৌঁছানো যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করুন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ
>
> 'তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণপানে ছুটে আসবে।' [সূরা জুমআহ, ৬২: ৯]
>
> خِتَامُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ

'তার মোহর হবে কস্তুরীর ঘ্রাণ, আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিত এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।' [সূরা আল-মুতাফফিফিন, ৮৩: ২৬]

এই পুরস্কারের পেছনে দৌড়ান।

আর-রাযযাক রিযক দানে বিচক্ষণ

বান্দার রিযক প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) অত্যন্ত কৌশলী, অত্যন্ত বিচক্ষণ। এ বিষয়টি আর-রাযযাক নামের অর্থ জানা এবং মহান আল্লাহর এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ঈমান আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক লোক দিন-রাত বলে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। কিন্তু এটা তাদের মুখের কথা। এ কথা তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। দিনে তারা এই কথা বলে, কিন্তু রাতে সৃষ্টির কাছে রিযকের ব্যাপারে অভিযোগ করে। তারা মুখে বলে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, আল্লাহ আর-রাযযাক, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ। কিন্তু অভাবের ব্যাপারে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা মানুষের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। কী আশ্চর্য!

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ

'যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর (সব) বান্দাদের রিযকের প্রাচুর্য দিতেন, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; (তাই) তিনি পরিমাণমতো যাকে (যতটুকু) চান তার জন্যে (ততটুকু রিযকই) নাযিল করেন। [সূরা আশ শূরা, ৪২: ২৭]

আল্লাহ আর-রাযযাক, আল-হাকীম। এবং আর-রাযযাক এবং আল-হাকীম জানেন আপনাকে তিনি যদি কিছুটা বেশি দেন, তাহলে আপনি সেটার অপব্যবহার করবেন। এটা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না। তাই তিনি আপনাকে পরিমাণমতো রিযক দেন। আর-রাযযাক এবং আল-হাকীমের ওপর ঈমান আনার একটি অংশ হচ্ছে এটি বিশ্বাস করা। আল্লাহ আপনাকে যা দেবেন আপনি তা মাথা পেতে মেনে নেবেন, আকীদাহ হতে হবে এমন। আল্লাহ আপনাকে ধনী বা গরিব যে অবস্থায় রাখুন না কেন, আপনি সেটা মেনে নেবেন। কারণ আপনার অবস্থা বদলালে আপনি কি সুখী হতেন নাকি অনিষ্টকারী হতভাগ্যদের একজন হতেন, তা আপনি জানেন না। অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে আপনাকে, আপনার ঈমানকে প্রভাবিত করবে, সেটা আপনি জানেন না। আমরা কেউ জানি না। তাই আমরা আল্লাহর ফয়সালা মাথা পেতে নিই। তাঁর ফয়সালা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। কারণ আমি জানি না, কিন্তু আমার আল্লাহ জানেন। আল্লাহ জানেন কোনটা আমার জন্য উত্তম, তিনিই আর-রাযযাক, আল-হাকীম।

আমি যদি আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করা শুরু করি তাহলে কেমন লাগবে?

ধরুন, আপনি ২০ হাজার ডলার দিয়ে গাড়ি কিনেছেন। এখন আমি যদি আপনার

কাছে কৈফিয়ত চাই, তুমি কেন শুধু শুধু গাড়ির পেছনে ২০ হাজার ডলার খরচ করলে? তুমি তো ১০ হাজার, ৫ হাজার বা তার চেয়েও কম দামে চলনসই একটা গাড়ি পেয়ে যেতে, এত খরচ করতে গেলে কেন?

অথবা ধরুন, আপনি আইফোন কিনলেন আর আমি আপনাকে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি আইফোন কিনলে কেন? সাধারণ ফোন–যেগুলো দিয়ে শুধু কল আর মেসেজ করা যায়–সেগুলো দিয়েও তো কাজ চালানো যায় তাই না? কিংবা আমি যদি বলি, তোমার স্ত্রীকে শপিং এর জন্য ৫০০ ডলার কেন দিলে? তখন আপনার কেমন লাগবে?

আপনি হয়তো ক্ষেপে যাবেন। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে কথার বলার তুমি কে? আমি কোন গাড়ি কিনব, আইফোন কিনব নাকি নোকিয়া ১১০০ ব্যবহার করব সেটা আমার ব্যাপার। আমার স্ত্রীকে আমি কত টাকা দেবো সেটা আমার ব্যাপার। তুমি এখানে নাক গলাবার কে?

আপনি এ কথা বলতেই পারেন। সেই অধিকার আপনার আছে। আমি কে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানোর? এ অধিকার আমার নেই। তাহলে বলুন তো, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, আল্লাহ, আর-রাযযাক, আল-হাকীমের কর্মপদ্ধতি, হিকমাহ নিয়ে প্রশ্ন করার আপনি কে? কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে?

আল্লাহ (ﷻ) প্রশ্ন করেছেন,

> أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
>
> 'তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ-বণ্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিই এবং তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরকে অধীনস্থ বানাতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' [সূরা আয যুখরুখ, ৪৩: ৩২]

আল্লাহ কোন বান্দাকে কতটুকু রিযক দেবেন, রহমত নাযিল করবেন নাকি করবেন না, করলে কতটুকু, এ ব্যাপারগুলোতে নাক গলানোর আপনি কে? কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে? একমাত্র আল্লাহই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রিযক বণ্টন করেন। এটা কেবল তাঁরই এখতিয়ার। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> 'এবং তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরকে অধীনস্থ বানাতে পারে।'

সমাজের সব মানুষ সমান না। কেউ ধনী, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ গরিব। অনেক লোক বলে, কেন যে আল্লাহ আমাকে ধনী বানালেন না? তাহলে আমি মসজিদ বানাতাম। মজলুমের পাশে দাঁড়াতে পারতাম...

রিযকের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কিছুটা হতাশা বোধ করতে পারেন। যদি এই হতাশার কারণ হয় সম্পদের অভাবে দ্বীনের খেদমত করতে না পারা, তাহলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু হতাশা যদি অসন্তুষ্টিতে রূপ নেয়, তাহলে সমস্যা। আমাদের মনে রাখতে হবে–আল্লাহ আর-রাযযাক, সর্বজ্ঞানী, সবচেয়ে বিচক্ষণ। তিনি খুব ভালো করে জানেন, আপনাকে কী কী দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, কখন দিতে হবে, কেন দিতে হবে। এ পৃথিবীতে ক্বারুনের মতো অনেকেই আছে।

ক্বারুনের কাহিনি জানেন তো? ক্বারুনকে আল্লাহ অনেক ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। সেই যমানার লোকেরা প্রশ্ন করেছিল, 'আল্লাহ ক্বারুনকে এত ধনসম্পদ দিয়েছেন, আমাদের যে কেন দিলেন না?' কিন্তু ক্বারুন যখন ঔদ্ধত্য আর সীমালঙ্ঘনের কারণে ধনসম্পদের নীচে চাপা পড়ল তখন তাদের চোখ খুলে গেল। 'আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন, ভাগ্যিস তিনি আমাদেরকে ক্বারুনের মতো ধনসম্পদ দেননি'।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

> 'তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল, তিনি যদি আমাদের অনুগ্রহ করে দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা সাদাকাহ করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব।' [সূরা তাওবাহ, ৯: ৭৫]

খেয়াল করলে দেখবেন অনেক লোক বলে, 'কেন আল্লাহ আমাদের বেশি বেশি ধনসম্পদ দেন না? আমাদের ধনসম্পদ থাকলে আমরা বেশি বেশি দান-সাদকাহ করতে পারতাম। নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম।' কিন্তু ধনসম্পদ পাওয়ার পর তাদের অবস্থা কী হয়? আল্লাহ (ﷻ) আমাদের তা জানিয়ে দিচ্ছেন,

فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

> 'অতঃপর যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের (ধনসম্পদ) দান করলেন, তখন তারা (দান করার বদলে) কার্পণ্য করতে শুরু করল এবং (আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।' [সূরা তাওবাহ, ৯: ৭৬]

যখন আল্লাহ তাদের দিলেন তখন তারা কিপটেমি শুরু করল। আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেল। রিযক নিয়ে আল্লাহর ফয়সালা নিয়ে প্রশ্ন তোলার শেষ পরিণতি কী হলো?

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

'এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তাদের অন্তরে মুনাফিকী সঞ্চার করেন, কারণ তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল এবং মিথ্যা বলত।' [সূরা তাওবাহ, ৯: ৭৭]

এই আয়াতগুলো জানার পর এটা একদম স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, আল্লাহ আপনার জন্য যে রিযকের ফয়সালা করেছেন তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা একদমই উচিত না। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, এই আয়াতগুলো সা'লাবাহ (ﷺ) নামের একজন সাহাবীর ধনী হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এটা ভুল। এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল ইবনু ওয়াহিব এবং ইবনু যাইদ নামক দুইজন মুনাফিকের কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। ইবনু হাজার (ﷺ) এটা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সা'লাবাহ (ﷺ) ছিলেন এমন একজন সাহাবী যিনি বদরের দিন জিহাদের ময়দানে অবিচল ছিলেন।[১৫]

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন

আল্লাহর ফয়সালা নিয়ে অসন্তুষ্ট হবেন না। সাবধান! আল্লাহ আপনার জন্য যে রিযক নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি রিযক বৃদ্ধির দু'আ করতে থাকুন। নিজের জায়গা থেকে সাধ্যমতো দুনিয়াবি চেষ্টা চালান। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। গরিব, মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তবান যা-ই হোন না কেন, আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। এমন অসন্তুষ্টি আপনার তাওহিদ ও ঈমানে ত্রুটি নিয়ে আসবে, তৈরি করবে অপূর্ণতা। ফলে আপনি আর-রাযযাকের ওপর পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনতে পারবেন না। আল্লাহ আল-আলীম, আর-রাযযাক যখন আপনার জন্য কিছু নির্ধারণ করেছেন, তখন অবশ্যই সেটার পেছনে উপযুক্ত কারণ আছে। যখন আল্লাহ আল-হাকীম, আর-রাযযাক, কোনো কিছু থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছেন, তখন সেটার পেছনেও উপযুক্ত কারণ আছে। কাজেই অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। আপত্তি করা যাবে না।

---

[১৫] সা'লাবাহ(ﷺ)-এর ঘটনা বেশ কিছু কিতাবে এসেছে এবং অনেক মুফাসসিরের নিকটই এটা বেশ প্রসিদ্ধ। এটি আছে তাফসিরুত তাবারী : ১০/১৩৯; ইমাম বাইহাকী (ﷺ), দালাইলুল নবুওয়্যাহ : ৫/২৮৯-৯২; ইমাম তাবারানী (ﷺ), আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং : ৭৮৭৩। ইমাম হাইসামী (ﷺ) এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।-মাজমাউয যাওয়াইদ : ৭/৩৪; হাফিয ইরাকী (ﷺ) দুর্বল বলেছেন।-তাখরিজুল ইহইয়া : ৩/৩৩৪; ইমাম যাইলাঈ (ﷺ) দুর্বল বলেছেন।-তাখরিজুল কাশশাফ : ২/৮৫; এ ছাড়া ইমাম বাইহাকী (ﷺ) নিজেও এটি উল্লেখ করে এর দুর্বলতার কথা বলেছেন।

আল্লাহ যা রিযক দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা তাওহিদের অংশ।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের সামনে প্রতিটি (আনন্দের) জিনিসের দরজা খুলে দিলাম। এভাবে তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নিরাশ হয়ে যায়।' [সূরা আল আন'আম, ৬: ৪৪]

আল্লাহ দুনিয়াতে সবাইকে দেন। যাদের পছন্দ করেন না, সেই কাফির-মুশরিকদেরও তিনি দুনিয়ার সম্পদ দেন। আবার যাদের তিনি ভালোবাসেন, সেই মুমিনদেরও দেন। দুনিয়াতে কাফির আর মুমিন—দুই দলেরই অংশ আছে। কিন্তু আখিরাত শুধু মুমিনদের জন্য। আখিরাতে আল্লাহর অপছন্দনীয় লোকদের কোনো ভাগ নেই। দুনিয়াতে আল্লাহ কাউকে ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি দেয়ার মানে ওই ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় অথবা সে আখিরাতেও মর্যাদা পাবে, এমন মনে করা ভুল। আজ অনেক মানুষ এভাবে চিন্তা করে। মক্কার মুশরিক কুরাইশরাও এমন মনে করত।

কুরাইশদের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলেছেন,

وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

'তারা আরও বলেছে, আমরা এ দুনিয়ার ধনে জনে তোমাদের চাইতে সমৃদ্ধিশালী এবং পরকালে আমাদের কখনোই আযাব দেয়া হবে না।' [সূরা সাবা, ৩৪: ৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের কাছে এসে কুরাইশরা অহংকার করত, 'তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আমাদের অঢেল ধনসম্পদ আছে। আমাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা কখনোই শাস্তির সম্মুখীন হব না'।

তাদের এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'হে নবী, তুমি বলো, আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রিযক প্রশস্ত করে দেন, যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করে দেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।' [সূরা সাবা, ৩৪: ৩৬]

পছন্দীয় এবং অপছন্দীয়, দুই শ্রেণির বান্দাকেই আল্লাহ এ দুনিয়াতে রিযক দেন। সাফল্য দেন। সম্পদ দেন। কিন্তু আখিরাতের সম্পদ, সাফল্য, পুরস্কার কেবল তাঁর ভালোবাসার বান্দাদের জন্য বরাদ্দ।

প্রকৃত তাওয়াক্কুল

হাতিম আল আসম[১৬] (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো,

> 'আপনার তাওয়াক্কুল[১৭] এত শক্তিশালী হলো কীভাবে? আপনি কীভাবে এত শক্তভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করেন?'

তিনি (ﷺ) বললেন,

> 'দেখো, আমি বিশ্বাস করি আমার রিযকে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। তাই আমার অন্তর দুশ্চিন্তামুক্ত, পরিতৃপ্ত। আমি জানি মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাই আমি রসদ জোগাড় করছি পরকালের জন্য। আমি জানি আমার আমলগুলো অন্য কেউ করে দেবে না, আমার কাজ করতে হবে আমাকেই। তাই আমি মনোযোগ দিয়েছি আমলে। আমি জানি আল্লাহ্ আমাকে সব সময় দেখছেন। আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন এমন অবস্থায় পাপ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।'[১৮]

লোকেরা তাঁকে এত পরিতৃপ্ত, এত প্রশান্ত দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, আপনি কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করেন?

---

[১৬] ইমাম আবু আব্দির রাহমান হাতিম আল আসম (ﷺ) ছিলেন ৩য় হিজরি শতকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রখ্যাত ইমাম। মৃত্যু ২৩৭ হিজরি। তিনি মূলত শাকীক আল বালখী (ﷺ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর সুদীর্ঘ সুহবত পান। খুরাসানের বলখ এলাকার লোক ছিলেন। পরে বাগদাদে আসেন। এখানে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (ﷺ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।-ইমাম যাহাবী (ﷺ), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১১/৪৮৫-৮৭

[১৭] তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল শব্দের আভিধানিক অর্থ, Trust, confidence, নির্ভরতা, নির্ভরশীলতা,ভরসা।- Hans Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic, p: ১২৮৪, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃষ্ঠা : ৩৩৯। পারিভাষিকভাবে তাওয়াক্কুল বলতে কী বোঝায় এর সংজ্ঞায় ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ আল জুরজানী (ﷺ) বলেছেন, 'তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহর কাছে যা আছে তার ওপর আস্থা রাখা এবং মানুষের হাতে যা রয়েছে তার ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার নাম।'-আত তা'রিফাত, পৃষ্ঠা : ৭৪ ইমাম ইবনুল জাওযী (ﷺ) আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকে ব্যাখ্যা করেছেন, 'তাঁর ওপর আস্থা রাখো আর তোমার যাবতীয় বিষয়কে তাঁর কাছেই ন্যস্ত করো।'-যাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির : ৩/৩৫০ যে সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তাওয়াক্কুল করে তার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন :'যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।' [সূরা আত তালাক্, ৬৫: ৩]

[১৮] ইমাম যাহাবী (ﷺ), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১১/৪৮৫

হাতিম আল আসম (رحمه الله) কুরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিলেন,

وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

'আর আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় ধনভান্ডার তো আল্লাহ তা'আলারই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না।' [সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩: ৭]

আশ শাফে'ঈ (رحمه الله) বলতেন, 'রিযকের জন্য আমি পুরোপুরি আল্লাহর ওপর নির্ভর করি। আমার জন্য নির্ধারিত রিযক আমার কাছে আসবেই আসবে। এ নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গহিন অন্ধকার সাগরের তলদেশ থেকে হলেও আমার রিযক আমার কাছে আসবেই। তাহলে কেন আমি রিযক নিয়ে হা-হুতাশ করব? কেন এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করব? মন খারাপ করব? এ নিয়ে হতাশার, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নিশ্চিন্ত থাকো।'

উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) নিচের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

لو أنّكم كنتُم توَكَّلُونَ على اللهِ حقَّ توكُّلِه، لَرَزَقَكم كما يرزُقُ الطيرَ، ألا ترَوْنَ أنّها تغْدُو خِماصًا، وترُوحُ بِطانًا.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যেভাবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা উচিত, সেভাব যদি তোমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিযক দিতেন যেভাবে তিনি পাখিদের রিযক দেন। তোমরা কি দেখো না, পাখিরা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, এরপর সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাড়ি ফিরে।'[১৯]

এই হাদীসে তাগদুহ (تغْدُو) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তারা সকালে বাসা থেকে খালি পেটে বের হয়। 'তারা বের হয়' বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে তারা কোনো কিছু করতে বের হয়। তারা কাজ করতে বের হয়। এক বর্ণনায় এসেছে 'ওয়া তা'ঊদু' (تعود), আর আরেক বর্ণনায় 'তারুহু' (تروحُ) এসেছে। যার অর্থ হলো তারা সন্ধ্যার শেষ প্রহরে ঘরে ফিরে। আর বিতা'না (بِطانًا) শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণ রিযক সহকারে'।

প্রকৃত তাওয়াক্কুল কী, এই হাদীস থেকে আমরা বুঝলাম। প্রকৃত তাওয়াক্কুল হলো অন্তরে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস রেখে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করা। মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আপনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন—এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিন্তু বলেননি, তাওয়াক্কুল করলে বাসায় বসে থাকা পাখির মতো রিযক দেয়া হবে। বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তাগ্বদূ এবং তা'ঊদু। অর্থাৎ আমরা

---

[১৯] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৩৭৩, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

যদি সত্যিকারভাবে তাওয়াক্কুল করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের ওই পাখিদের মতো রিযক দেবেন যারা রিযকের সন্ধানে সকালে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ঘরে ফিরে আসে। এটাই হলো রিযকের ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করার অর্থ। অনেকেই এ ব্যাপারটা ভুল বোঝে।

ইবনু আবিদ দুনইয়া[২০] (ﷺ) মদীনায় উমরাহ করতে আসা মুসলিমদের সাথে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। আলাপ আলোচনা করতেন তাদের সাথে। একবার ইয়েমেন থেকে আসা একদল লোককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কারা?'

তিনি তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছিলেন। ইয়েমেনি লোকগুলো জবাব দিলো,

> نحن المتوكلون
>
> 'আমরা হচ্ছি মুতাওয়াক্কিল—আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী।'
>
> ইবনু আবিদ দুনইয়া বললেন, 'তোমরা মুতাওয়াক্কিলুন না, তোমরা হলে মুতাওয়াকিলুন (متواكلون)।'

মুতাওয়াকিলুন মানে যারা একে অপরের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহর ওপর না। তিনি বললেন,

> 'তোমরা হলে মুতাওয়াকিলুন। প্রকৃত মুতাওয়াক্কিলুন তো তারা, যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখেন এবং জমিতে বীজ বপণ করেন।'

এ সবই আর-রাযযাকের ওপর বিশ্বাস করার অংশ। আপনার অন্তর সব সময় আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকবে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই। আর-রাযযাকের ওপর ঈমান আনতে হলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, কোনো আসবাব বা উপকরণ আমাদের লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। আসবাব-উপকরণ আমাদের কিছু দিতেও পারে না, আমাদের কাছ থেকে কিছু নিতেও পারে না। রিযকের ফয়সালা এবং হুকুম হয় আমাদের মালিকের কাছ থেকে। রিযক দেয়ার মালিক আল্লাহ, আর-রাযযাক।

এ বিষয়ে সাহল ইবনু আবদুল্লাহ আত-তুসতারী[২১] (ﷺ) স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করে রাখার

---

[২০] ইনি হচ্ছেন ইমাম আবু বাকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (ﷺ) যিনি ইবনু আবিদ দুনইয়া নামেই পরিচিত। জন্ম বাগদাদে ২০৮ হিজরিতে, মৃত্যুও বাগদাদে ২৮১ হিজরিতে। হাফিযুল হাদীস ছিলেন, বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

[২১] ইমাম সাহল বিন আব্দিল্লাহ আত-তুসতারী (ﷺ) ছিলেন প্রথম যুগের তাসাওউফের ইমামদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ২০৩ হিজরিতে ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের শুশতার বা তুসতারে। মৃত্যু ২৮৩ হিজরিতে ইরাকের বসরায়। তাঁর প্রখ্যাত রচনা হচ্ছে এক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত তাফসির, 'তাফসিরুত তুসতারী'।

মতো একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আসবাব বা উপকরণকে অবহেলা করল, সে সুন্নাহকে অবহেলা করল। আর যে তাওয়াক্কুলকে অবহেলা করল, সে ঈমানকেই উপেক্ষা করল। তাওয়াক্কুল করা ঈমানের অংশ আর আসবাব বা উপকরণ ব্যবহার করা নবী (ﷺ)-এর সুন্নাহ। যে নবীর আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে কোনোভাবেই নবীর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করতে পারে না।'

বান্দা সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, কিন্তু অন্তর জুড়ে থাকবে আল্লাহর সাথে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সীরাত পড়ে দেখুন। তিনি আসবাব বা উপকরণ ব্যবহার করেছেন। দুনিয়ার বুকে কে আছে যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়েও বেশি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতেন। সেই সাথে সম্ভাব্য সব আসবাব তথা উপকরণ ব্যবহার করতেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কথাই ধরুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আবু বাকর (رضي الله عنه)-এর মাথার জন্য ১০০ উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল কুরাইশ। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে মদীনার পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সাধারণ রুটের বদলে ভিন্ন রুট ব্যবহার করেছিলেন। আত্মগোপন করেছিলেন পাহাড়ের গুহায়।

তিনি কি তাঁর সঙ্গী আবু বাকর (رضي الله عنه)-কে বলেছিলেন, 'আবু বাকর, এই পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো মানুষদের মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আর নবীদের ঠিক পরেই তোমার স্থান। কুরাইশ আমাদের মাথার জন্য ১০০ করে উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে তো কী হয়েছে! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। চলো, এ রকম পালিয়ে বেড়ানোর বদলে আমরা খোলা মরুভূমিতে শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিই। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন!'

তিনি (ﷺ) কি এ রকম বলেছিলেন? এটা কি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা? না, এটা কখনোই তাওয়াক্কুল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্ভাব্য সব কৌশল কাজে লাগিয়েছিলেন। সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং আবু বাকর (رضي الله عنه)-কে সাহস জুগিয়ে বলেছিলেন,

> لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
>
> 'দুঃখ পেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।' [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ৪০][২২]

---

[২২] সহীহ বুখারীর হাদীস নং : ৩৬৫৩ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (ﷺ) বলেছিলেন, 'হে আবু বাকর, সেই দুজনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ স্বয়ং?'

আমরা আসবাব ব্যবহার করব, উপকরণ ব্যবহার করব, কিন্তু অন্তরে থাকবে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল। অনেক সময় আমাদের হাতে কোনো উপকরণ না থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কিন্তু যখন সম্ভব হবে, আমরা উপকরণ ব্যবহার করব। দু-ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তর জুড়ে থাকবে আল্লাহর সাথে। আসবাব আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, আপনার প্রয়োজন পূরণ করেন একমাত্র আল্লাহ (ﷻ)। কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে আসবাব বা উপকরণ কাজে লাগাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ক্ষুধার্ত হতেন তখন তিনি (ﷺ) কি আসমান থেকে থালা ভর্তি খাবার নেমে আসার আশায় ঘরে বসে থাকতেন? নাকি খাবারের সন্ধান করতেন, তারপর খাবার প্রস্তুত করে খেতে বসতেন?

বদরের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেয়া এক যুদ্ধ। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ১ হাজার কুরাইশদের বিরুদ্ধে ছিলেন মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী (رضي الله عنهم)। এক অসম লড়াই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বদরের প্রান্তে সাহাবীদের জড়ো করে বলেছিলেন, ‘তোমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখো, আর আল্লাহর কাছে দু’আ করো। শত্রুরা যত কাছাকাছি আসবে তোমরা তত বেশি করে দু’আ করবে। চিৎকার করে করে দু’আ করবে। এতেই শত্রুরা পরাজিত হয়ে যাবে।’ তিনি (ﷺ) কি এ রকম বলেছিলেন?

না। তিনি লড়াই করেছিলেন। তিনি দু’আ করেছিলেন আবার সব রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দীর্ঘ সময় নিয়ে দু’আ করেছিলেন। দু’আয় মগ্ন থাকা অবস্থায় তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বাংশের কাপড় সরে গিয়েছিল। আবু বাকর (رضي الله عنه) এসে সেই কাপড় তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দু’আ শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী করলেন?

তিনি সাহাবী (رضي الله عنهم)-দেরকে সারিবদ্ধ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান ঠিক করে দিলেন। এমনভাবে অবস্থান সাজালেন যাতে কুরাইশরা পানির কুয়োগুলোর দখল নিতে না পারে। তারপর সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের বললেন, ‘ওদেরকে কাছে আসতে দাও। যতক্ষণ না ওদের চোখের সাদা অংশ তোমরা দেখতে পাবে—ততক্ষণ আক্রমণ করবে না। যখন ওরা কাছে চলে আসবে তখন আক্রমণ শুরু করবে।’[২৩]

রিযকের ব্যাপারটিও এ রকম। আপনার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সব করবেন এবং পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ

---

[২৩] আল্লামা শফিউর রাহমান মুবারাকপুরী (رحمه الله), আর রাহীকুল মাখতুম (مع بعض التعديلات والزيادات من د علاء الدين زعتري وغسان محمد رشيد الحموي), পৃষ্ঠা : ১৫৭-৫৮

'তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন। তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে উদ্গত রিযক তোমরা উপভোগ করো।' [সূরা আল মুলক, ৬৭:১৫]

লক্ষ করুন, আল্লাহ এই আয়াতে 'ফামশু' (فَٱمْشُواْ) বলেছেন। এর অর্থ কী? (فَٱمْشُواْ) এর অর্থ হলো: হাঁটা, খোঁজা, তালাশ করা। অর্থাৎ রিযকের খোঁজ করো, চেষ্টা চালাও। আল্লাহ কিন্তু বলেননি, রিযক তোমাদের বাসায় নিজেই হাজির হবে। 'ফামশু' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন তোমরা ঘর থেকে বের হও, রিযকের তালাশ করো, তোমার নাগালে থাকা উপায়গুলোকে কাজে লাগাও।

আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন। (فَٱمْشُوا) এর দ্বারা আল্লাহ বলছেন রিযকের জন্য তোমরা পৃথিবীর অলিগলিতে 'হেঁটে' বেড়াও। তিনি কিন্তু বলেননি তোমরা ছোটাছুটি করো। হাঁটা আর ছোটাছুটি করার মধ্যে পার্থক্য আছে।

সুবহান আল্লাহ! আল্লাহর কালাম কত সুন্দর! আল্লাহ আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন, তোমরা রিযকের জন্য চেষ্টা করবে ঠিক আছে। কিন্তু এ নিয়ে পেরেশান হয়ে যেয়ো না। এ নিয়ে বেপরোয়া হয়ে যেয়ো না। সবকিছু ভুলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রিযকের পেছনে ছোটাছুটি করার প্রয়োজন নেই। রিযকের জন্য হেঁটে দেখো, কিন্তু তেজি ঘোড়ার মতো ছোটাছুটি করবে না। দুনিয়ার জন্য পেরেশান হবে না।

মারইয়াম (ﷺ)-এর যখন প্রসববেদনা উঠল তখন আল্লাহ মারইয়াম (ﷺ)-কে বলেছিলেন,

وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ تُسَٰقِطۡ عَلَيۡكِ رُطَبٗا جَنِيّٗا

'তুমি এ খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, দেখবে তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে।' [সূরা মারইয়াম, ১৯: ২৫]

আপনারা যারা খেজুর গাছ দেখেছেন তারা বলুন তো, খেজুর গাছ নাড়িয়ে কি খেজুর পাড়া যায়? খুব শক্তিশালী পালোয়ানও কি খেজুর গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খেজুর পাড়তে পারবে? পারবে না। সম্ভব না। তাহলে প্রসববেদনায় কাতরাতে থাকে একজন নারী কীভাবে পারবে? আল্লাহ কেন মারইয়াম (ﷺ)-কে খেজুরের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বললেন? আল্লাহর পক্ষে কি ঝাঁকুনি দেয়া ছাড়াই মারইয়াম (ﷺ)-এর কাছে খেজুর পৌঁছে দেয়া সম্ভব ছিল না?

আল্লাহ (ﷻ) এখানে মারইয়াম (ﷺ)-কে এবং আমাদের একটি বিষয় শেখাচ্ছেন। শিক্ষাটি তাওয়াক্কুলের। হে মারইয়াম, তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা করো। সেই সাথে তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা করো। গাছটা ধরে তোমার সাধ্যমতো নাড়া দেয়ার চেষ্টা করো।

বাকিটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

চাকরির জন্য সিভি জমা দিন, ইন্টারভিউ দিতে যান। ব্যবসা করুন। আপনার সাধ্যমতো যা করার আছে, করুন। কিন্তু সব সময় মাথায় রাখতে হবে, এগুলো আপনার রিযক নির্ধারণ করে না। আপনার রিযক আসে আসমান থেকে। আপনার জন্য যদি কোনো রিযক নির্ধারণ করা থাকে, তাহলে দুনিয়ার কেউ আপনাকে সেই রিযক থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ঠিক একইভাবে, কোনো রিযক থেকে আল্লাহ যদি আপনাকে বঞ্চিত করতে চান, তাহলে দুনিয়ার সবাই চেষ্টা করলেও আপনি সেই রিযকের নাগাল পাবেন না। আপনি কাজ করবেন, চাকরি করবেন, ব্যবসা করবেন ঠিকই; কিন্তু আপনার পূর্ণ ভরসা থাকবে আল্লাহর ওপর। যদি আপনি মনে করেন আপনার চাকরি আপনাকে খাওয়ায়, আপনার ব্যবসা আপনাকে খাওয়ায়, তাহলে বুঝতে হবে আর-রাযযাকের ওপর আপনি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে পারেননি। আপনি ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারেননি যে আল্লাহ হলেন আর-রাযযাক। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন আপনার ঈমানে অপূর্ণতা রয়ে গেছে।

ইব্রাহীম ইবনু আদহাম (ﷺ)[২৪] একবার মাংস কাটছিলেন। একটা বিড়াল এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে পালাল। ইব্রাহীম ইবনু আদহাম খেয়াল করে দেখলেন বিড়ালটি মাংস খাচ্ছে না। খোলা মাঠের মধ্যে এক গর্তের পাশে মাংসের টুকরো সে রেখে দিয়েছে। ইব্রাহীম ইবনু আদহাম বিড়ালের পিছু পিছু গিয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। বিড়ালটা মাংস খেলো না কেন?

হঠাৎ গর্ত থেকে বের হয়ে এল একটা অন্ধ সাপ। তারপর মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে ফেরত গেল গর্তের ভেতরে। সাপ আর বিড়াল একে অপরের শত্রু। তাদের মধ্যে সম্পর্ক শিকার আর শিকারির। অথচ এই বিড়ালকে দিয়ে আল্লাহ সাপের কাছে রিযক পাঠালেন। ইব্রাহীম ইবনু আদহাম তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি শত্রুর মাধ্যমেও রিযকের ব্যবস্থা করে দেন।'

পূর্ববর্তীদের অনেকে দু'আ করতেন,

اللهم يامن يرزق النعاب فى عشه ارزقني

'ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে সেভাবেই রিযক দান করুন, যেভাবে আপনি অসহায়

---

[২৪] তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রখ্যাত ইমাম, পুরো নাম আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন আদহাম। তিনি আফগানিস্তানের বলখের লোক ছিলেন। জন্ম ১০০ হিজরি, মৃত্যু ১৬২ হিজরি।

ছোট্ট কাক শাবককে তার বাসায় রিযক দান করেন।'[২৫]

আরবীতে কাককে বলা হয় গুরাব। কাকের ছোট্ট বাচ্চাকে বলা হয় নাআ'বাতুন। কাক কিন্তু খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। কাকের বাচ্চা ডিম ফেটে বের হবার পর খুব অসহায় থাকে। চোখ ফোটেনি, ওজন ১০ গ্রামের একটু বেশি। ছোট্ট, অসহায় একটা প্রাণী। কাকের বাচ্চার গায়ের ওপর লেপ্টে থাকে গোলাপি চামড়ার একটা পাতলা আবরণ। কাক যখন দেখে তার বাচ্চার রং কালো না, গোলাপি তখন সে দীর্ঘ সময়ের জন্য সেই বাসা থেকে বের হয়ে পড়ে। এর দুটো কারণ হতে পারে। হয় গোলাপি রং দেখে সে ভাবে এটা তার বাচ্চা না, তাই হতাশ হয়ে বের হয়ে যায়। অথবা সে বাচ্চার জন্য খাবার আনতে বের হয়। যে কারণেই বের হোক, বাচ্চা তখন বাসায় একা। আনুমানিক ৩০ মিনিট পরপর তার খাওয়া দরকার। নইলে সে বাঁচবে না। কিন্তু মা তো বের হয়ে গেছে। এখন তাকে কে খাওয়াবে?

এই হলো আন-নাআ'বাহ এর অবস্থা। এই দৃষ্টিহীন, শক্তিহীন, অসহায় শিশুকে কে খাওয়ায়?

আল্লাহ! আর-রাযযাক!

আল্লাহই এই অসহায় নিঃসঙ্গ শিশুর কাছে ছোট ছোট পোকামাকড়, ঘাসফড়িং, মাকড়সা ইত্যাদি পাঠান। ছোট্ট ছানার ঠোঁট দেখে আগ্রহী হয়ে ওরা কাছে চলে আসে। ঠোঁটের সাথে লেগে যায়। এভাবে সে খেতে পায়। তারপর একসময় মা বাড়ি ফিরে আসে, দেখে বাচ্চার পালকের রং কালো। তখন সে বোঝে এটা আসলে তারই বাচ্চা, একে খাওয়াতে হবে। এভাবে আল্লাহ আন নাআ'বাহকে রিযক দেন।

এজন্য সালাফদের অনেকে দু'আ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে সেভাবেই রিযক দান করুন, যেভাবে আপনি অসহায় ছোট্ট কাক শাবককে রিযক দান করেন।'

অবলা, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত কাকের ছানার খাবারের ব্যবস্থা করেন কে? কে নিঃসহায় অন্ধ সাপের দোরগোড়ায় মাংসের টুকরো পৌঁছে দেন তার শত্রুর মাধ্যমেই? কে সেই মহান সত্তা?

আর-রাযযাক।

هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

---

[২৫] বিভিন্ন গ্রন্থে দু'আটি দাউদ (ﷺ)-এর দু'আ হিসেবে বর্ণিত আছে। যেমন : আদ দিনওয়ারী (ﷺ), আল মাজালিসাহ : ১৩৫৩; ইবনুল আদিম (ﷺ), বুগইয়াতুত তালিব : ৭/৩৪২৯; ইমাম আবু নু'আইম (ﷺ), আল হিলইয়াহ : ৫/১৮৩; ইমাম ইবনু আসাকির (ﷺ), তারিখু দিমাশক : ১৭/১০৭, তবে এগুলোর সনদ দুর্বল। মূলত দু'আটি উমার বিন সাঈদ (ﷺ)-এর করা।

'আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রিযক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনোই মাবুদ নেই। তারপরও তোমরা কীভাবে ফিরে যাচ্ছ?' [সূরা ফাতির, ৩৫: ৩]

আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে? আসমান ও যমীনে কি আর কোনো রিযকদাতা আছে?

তাহলে কী আমাদের বিভ্রান্ত করল?

রিযক শুধু দুনিয়াবি সম্পদ না

মানুষ রিযককে খুব সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। আমরা রিযককে দেখি বস্তুবাদী চোখে। রিযক যেন শুধু টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি। এ কারণে অনেকে দারিদ্র্যের কথা বলে হা-হুতাশ করে। নিচের উদাহরণটা লক্ষ করুন।

ইবনুস সাম্মাক[২৬] (রহ.) নামে একজন দা'ঈ ছিলেন খলীফা হারুনুর রশীদের উপদেষ্টা। খলীফা সব সময় তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন যাতে ইবনুস সাম্মাকের ইলম থেকে উপকৃত হতে পারেন। খলীফা হারুনুর রশীদের সময় ইসলামী খিলাফাহ এত বিস্তৃত হয়েছিল যে, তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে বলতেন, হে মেঘ, তুমি যেখানে চাও সেখানে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে নামো। কারণ, একসময় তোমার সম্পদ আমার কাছেই ফিরে আসবে।

তো হারুনুর রশীদ একগ্লাস ঠান্ডা পানি চাইলেন। তিনি বারবার পানি চাচ্ছিলেন কিন্তু আশেপাশে সাড়া দেবার কেউ ছিল না। ইবনুস সাম্মাক খলীফার সাথেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা পানি এল। খলীফা সেই পানি মুখে দেয়ার আগে ইবনুস সাম্মাক প্রশ্ন করলেন,

'ইয়া আমীরুল মুমিনীন, মনে করুন দুনিয়াতে শুধু এই এক গ্লাস পানিই অবশিষ্ট আছে। পানি পেতে হলে দাম দিতে হবে। এই এক গ্লাস পানির জন্য আপনি কী দাম দেবেন?'

খলীফা উত্তর দিলেন, 'আমি আমার রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেবো। প্রয়োজনে আরও বেশি।'

---

[২৬] তাঁর নাম ছিল আবু আমর উসমান বিন আহমাদ আদ দাক্কাক, তিনি ইবনুস সাম্মাক নামেই পরিচিত। মৃত্যু ৩৪৪ হিজরিতে। তিনি ছিলেন ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ আদ দিবাজ, আল আমালী, ওয়াফাতুশ শুয়ুখ।

খলীফা পানি পান করলেন। ইবনুস সাম্মাক আবার প্রশ্ন করলেন,

'ইয়া আমিরুল মুমিনীন, যদি দাম দেয়া ছাড়া এই পানির বর্জ্য দেহ থেকে বের করতে না পারেন, তাহলে কী দাম দেবেন?'

অর্থাৎ যদি আপনি প্রস্রাব করতে না পারেন, তাহলে প্রস্রাব করার জন্য আপনি কী দাম দিতে রাজি আছেন?

খলীফা বললেন, 'তাহলে আমার রাজ্যের বাকি অর্ধেক দিয়ে দেবো। আর যদি এর চেয়ে বেশি থাকে বা দরকার হয়, তাহলে এর চেয়ে বেশিও দেবো।'

খলীফার উত্তর শুনে ইবনুস সাম্মাকের দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করল। তিনি বললেন,

'পান করুন ইয়া আমীরুল মুমিনীন, পান করুন। আল্লাহ আপনাকে পান করাক। আফসোস সেই রাজত্বের জন্য, যা এক চুমুক পানিও কিনতে পারে না।'[২৭]

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন শাইখ কিশক[২৮] (ﷺ)-এর কবিতা মুখস্থ করতাম। শাইখের বয়ান শুনতাম। আল্লাহ তাঁকে অসাধারণ বাগ্মিতা দিয়েছিলেন। ইরানের শাহ (বাদশাহ) যখন মারা গেল তখন তিনি বলেছিলেন,

'যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো,

কেবল মনের সন্তুষ্টি নিয়েও তখন নিজেকে রাজা মনে হবে।

যারা জীবনভর শাসন করল তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো

কাফনের কাপড় ছাড়া এ দুনিয়া থেকে তারা আর কী নিয়ে গেল?'

আমরা কীভাবে রিযকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন মনে করে দেখুন। রিযক শুধু দুনিয়াবি সম্পদ না। অর্থকড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্সই শুধু রিযক না। সবচেয়ে বড় রিযক তো হলো আপনার আকীদাহ, আপনার ঈমান, আপনার বিশ্বাস। এর চেয়ে বড় কোনো রিযক নেই।

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ

'আর আজ, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম, তোমাদের

---

[২৭] ঘটনাটি রয়েছে ইমাম ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী (ﷺ)-এর শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব : ১/৩৩৬ এ।

[২৮] শাইখ আব্দুল হামীদ কিশক (ﷺ)-এর জন্ম ১০ মার্চ, ১৯৩৩ সালে মিসরের শুবরা খীতে। মৃত্যু ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে কায়রোয়। তিনি খতিব হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেকালেই তার ২০০০ টেপ প্রচারিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি তিনি ৩০টি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক।

ওপর আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করলাম।' [সূরা মায়িদাহ, ৫: ৩]

রিযকের জন্য তাক্বদীর মেনে নেওয়া, বিশ্বাস করা আকীদাহর অংশ। যে মুহূর্তে আপনি অন্তরে এ বিষয়টি গেঁথে নিতে পারবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই আপনি পাবেন প্রশান্তিময়, মুক্ত, স্বাধীন এক জীবন। আর-রাযযাকের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সুনানু আবি দাউদের এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

من نزَلَت بهِ فَاقَةٌ فأَنزَلَها بالناسِ لم تُسَدَّ فَاقتُهُ . ومَن نزَلتْ به فَاقَةٌ فأنزَلَها باللهِ فيوشِكُ اللهُ لهُ برزْقٍ عاجِلٍ أو آجِلٍ

'কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়ে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থাপন করে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযক দান করেন।'[২৯]

রিযকের ওপর তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোনো মালিকানা নেই

এই আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

'এরা কি আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের বানানো মাবুদদের উপাসনা করে, যাদের আকাশমণ্ডলী ও যমীনের কোথাও থেকে কোনোপ্রকারের রিযকের মালিকানা নেই এবং তারা (মালিক হতে) সক্ষমও নয়?' [সূরা নাহল, ১৬: ৭৩]

মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। দেখুন, আল্লাহ এই আয়াতে রিযক্বান (رِزْقًا) এবং শাইয়্যান (شَيْـًٔا) এ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আয়াতে এই দুটি শব্দ না থাকলেও মূল অর্থ একই থাকত। তবু কেন আল্লাহ এই দুটি শব্দ ব্যবহার করলেন? কুরআন সূক্ষ্ম। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরের অবস্থানের পেছনে কারণ আছে। তাই প্রশ্ন হলো সূরা নাহলের ৭৩ নম্বর আয়াতে এ দুইটি শব্দ ব্যবহারের পেছনে হিকমাহ কী? একমাত্র আল্লাহই রিযক দেন—এই বক্তব্যকে এই দুটি শব্দ দিয়ে জোরালো করা হয়েছে এবং সত্যায়ন করা হয়েছে।

উসুলের একটি নিয়ম হলো,

---

[২৯] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৩২৬, ইমাম তিরমিযি (رحمه الله) বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ গরিব। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৪২১৯, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সহীহ।

النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطاق

'ইসবাত (সত্যায়নের) ক্ষেত্রে নাকিরাহ প্রয়োগ হলে তা সাধারণকরণের অর্থ বোঝায়।'

এই আয়াতের রিযক্বান এবং শাইয়্যান শব্দ দুটো এসেছে ইসমে নাকিরাহ (إسم نكرة) বা অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য হিসেবে। এই দুটো বাড়তি শব্দ অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য। উসুলের নিয়ম হলো কোনো সাধারণ বাক্যে (general statement) কোনো কিছুর ঘোষণা, প্রতিষ্ঠা কিংবা সত্যায়নের জন্যে যখন ইসমে নাকিরাহ বা অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা হয় তখন সেটা চূড়ান্ত, শর্তহীন, সুনিশ্চিত অর্থ প্রকাশ করে।

আমি বিষয়টা ভেঙে বলছি। এই নিয়মগুলো এমনিতেই জটিল। আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় বোঝাতে গেলে ব্যাপারগুলো আরও জটিল হয়ে যায়। তাই আমি ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

ধরুন, কোনো বাক্যে কোনো কিছুর সত্যায়ন করা হচ্ছে। সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে। ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। কোনো বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এ ধরনের বাক্যে ইসমে নাকিরাহ বা অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা হলে সেটি শর্তহীন এবং পরিপূর্ণ অর্থ ধারণ করবে। অর্থাৎ যা বলা হচ্ছে তা-ই চূড়ান্ত। তা শর্তহীনভাবে সব অবস্থায় প্রযোজ্য।

কোনো বাক্যে ইসমে নাকিরাহ ব্যবহার আবশ্যিক না হওয়া সত্ত্বেও যখন তা ব্যবহার করা হয়, তখন সেটি মূল বক্তব্যকে আরও জোরালো করে। মূল বক্তব্যকে একটি চূড়ান্ত ও শর্তহীন অর্থ দেয়। অর্থাৎ এই বাক্যে যা বলা হচ্ছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কাজেই এই আয়াতে রিযক্বান ও শাইয়্যান শব্দদুটি বোঝাচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত মুশরিকরা করে, রিযকের ওপর তাদের কারও কোনো ক্ষমতা নেই। বিন্দুমাত্র, এক চুল পরিমাণও কোনো নিয়ন্ত্রণ তাদের নেই। আল্লাহই রিযক নিয়ন্ত্রণ করেন। রিযকের নিয়ন্ত্রণ যে আল্লাহর হাতে তা পরম, সন্দেহাতীত, সুনিশ্চিত, চিরন্তন বিষয়।

আরেকটু সহজ করে বলা যাক।

শাইয়্যান শব্দের অর্থ হলো, কোনো কিছু (anything)। এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয়, উপাসনাকারীদের দেয়ার মতো কিছু তাদের নেই। আল্লাহ কেন এখানে আবার শাইয়্যান (কোনো কিছু/anything) শব্দটি ব্যবহার করলেন? আল্লাহ তো একবার বলছেন, তাদের কিছু নেই। তিনি আবার শাইয়্যান শব্দটি যোগ করলেন কেন?

ধরুন, ঘরভাড়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি দেয়ার পর আপনার হাতে বেতনের টাকা অবাকি

আছে ১০ হাজার ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আমি যদি প্রশ্ন করি, 'তোমার কাছে এখন কত টাকা আছে?' আপনি কী জবাব দেবেন?

আপনি বলবেন, ১০ হাজার টাকা। কিংবা বলবেন, ১০ হাজারের মতো। ৪ টাকা ৫০ পয়সা এত ছোট একটা সংখ্যা যে আপনি আলাদা করে এটা বলবেন না।

আরেকটা উদাহরণ দিই। ধরুন আমি প্রশ্ন করলাম, এখন কয়টা বাজে? আপনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ৭টা ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড। আপনি কী বলবেন এখন ৭টা বেজে ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড?

না! বরং আপনি বলবেন এখন ৮টা বাজে। কারণ দুটোর মধ্যে পার্থক্য এত ছোট যে, সেটা উপেক্ষা করা যায়।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। ধরুন একজন মানুষ গরিব। তার বলার মতো তেমন কোনো সম্পদ নেই। হয়তো হাজার বিশেক টাকা জমানো আছে। হঠাৎ তার অসুখ হলো। চিকিৎসার জন্য লাগবে পঞ্চাশ লাখ টাকা। কেউ প্রশ্ন করল, তার ধনসম্পদের কী অবস্থা? তাঁর আর্থিক অবস্থা কেমন? টাকাপয়সা কেমন আছে?

এই ক্ষেত্রে আমরা কী বলি? আমরা বলি, তার কিছুই নেই।

তার যে একেবারেই কিছু নেই, তা না। কিন্তু সেটা এখানে ধরার মতো না। যদিও তার অল্প হলেও আছে, কিন্তু সেই থাকাটা এত কম যে আমরা সেটাকে গোনায় ধরি না। এই ব্যক্তির অল্প কিছু টাকা আছে, কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সেটি এতটাই ক্ষুদ্র, এতটাই তুচ্ছ যে, আপনি সেটাকে গোনার মধ্যেই ধরবেন না। ১০ হাজার ৪ টাকা ৫০ পয়সা, ৭টা বেজে ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড, কিংবা সামান্য সঞ্চয়ের মতো সামান্য পরিমাণগুলো আমরা হিসেবে ধরি না।

কিন্তু এই আয়াতে শাইয়্যান যোগ করে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তাদের কাছে কিছুই নেই। এই যে সামান্য পরিমাণ, যেটাকে আমরা গোনায় ধরছি না, সেটুকুও তাদের কাছে নেই। ভগ্নাংশ পরিমাণও নেই। অণু পরিমাণও নেই। এই হলো এই আয়াতে শাইয়্যান ব্যবহারের অর্থ। আল্লাহ সব সন্দেহ, সব সম্ভাবনা মুছে দিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন–রিযকের মালিক কেবলই তিনি। এবং আল্লাহ চান আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে আর-রাযযাকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। আমাদের তাওহিদের মধ্যে যেন কোনো অসম্পূর্ণতা না থাকে। কোনো ফাঁকফোকর, কোনো গলদ যেন না থাকে। তাই বিষয়টি আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রিযকের সর্বময় কর্তৃত্ব এক আল্লাহর কাছে।

একইভাবে আয়াতে 'রিযকান' শব্দটি ব্যবহার করে এ অর্থটি আল্লাহ আরও জোরালো করেছেন। অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ দুটি ইসমে নাকিরাহ ব্যবহার করেছেন। এভাবে একদম দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, মুশরিকরা যাদের উপাসনা করে, রিযকের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ০.০০০০০১ পরিমাণ রিযকও তাদের কাছে নেই। এতটুকু কর্তৃত্বও তাদের কারও নেই।

আর-রাযযাক হলেন আল্লাহ। কেবল তিনিই রিযক প্রদান করেন এবং রিযকের ওপর একমাত্র কর্তৃত্ব তাঁরই। এই হলো এই আয়াতে রিযকান ও শাইয়্যান শব্দটি ব্যবহারের অর্থ। আশা করি বিষয়টা বোঝা গেছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন। এই আয়াতের শেষের দিকে বলা হয়েছে,

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

'এবং তারা সক্ষম নয়।'

আল্লাহ এখানে বলছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয় তারা অক্ষম। তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। রিযক নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সামর্থ্য, সক্ষমতা তাদের নেই।

'নিয়ন্ত্রণ করে না', আর 'নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই' এই দুটি কথার মধ্যে কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য আছে। অনেক সময় আমাদের কোনো কাজ করার ক্ষমতা থাকে কিন্তু সুযোগ থাকে না। সুযোগ পেলে আমি কাজটা করতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ বলছেন তাদের ক্ষমতাই নেই। সুযোগ পেলেও তারা সেটা করতে পারবে না। আল্লাহ আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ আয়াতে তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়– তাদের দেয়ার মতো কিছু নেই। রিযকের ওপর তাদের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং তাদের কোনো সামর্থ্য নেই, ক্ষমতা নেই।

আজ দুঃশ্চিন্তা, হতাশা, ডিপ্রেশন, স্ট্রেস, অস্থিরতা, মানসিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় কারণ কী? পরীক্ষার রেসাল্ট, চাকরি, ব্যবসা, ক্যারিয়ার–রিযক। এগুলোর সমাধান কী জানেন? তাওহিদকে পরিপূর্ণ করা। আল্লাহ যে আর-রাযযাক তা সত্যিকারভাবে বোঝা, বিশ্বাস করা। একজন মানুষ যখন জানবে, এসব কিছু নির্ধারিত, সবকিছু আল্লাহর হাতে, তখন এই হতাশা-দুশ্চিন্তা-স্ট্রেস দূর হয়ে যাবে। মানুষ হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করবে। তার নিজেকে অনেক হালকা মনে হবে। এগুলো আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। দুনিয়ার এসব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে? আখিরাত নিয়ে চিন্তা করুন।

আপনি যখন নিশ্চিত জানবেন, রিযক আসে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে। পৃথিবীর

কোনো শক্তি আপনার রিযকের সামান্যতম অংশও আটকিয়ে রাখতে বা কেড়ে নিতে পারে না। তখন কেউ আপনার অন্তরের শান্তি কেড়ে নিতে পারবে না।

আপনার অন্তর জুড়ে রাখুন আল্লাহর সঙ্গে। সব সময়। তাঁর ওপর আস্থা রাখুন। যদি চাকরির ভাইভাতে বা ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হন, তাহলে হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। হাসিমুখে ব্যর্থতা গ্রহণ করে সামনে তাকান। ফয়সালা আসমানে হয়। ভাইভাবোর্ডে সুট-টাই পরে যারা আপনার সামনে বসে থাকে, আল্লাহর ফয়সালার বাইরে তারা আঙুলও নাড়াতে পারে না; একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না। আপনি ভাইভা দিতে যাচ্ছেন কারণ আল্লাহ্ আমাদের রিযকের তালাশ করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে বলেছেন। কিন্তু ভাইভা দিতে যাবার আগে, ভাইভার সময় এবং পরে, পুরোপুরিভাবে আস্থা থাকতে হবে আল্লাহর ওপর। দেহ থাকবে এই দুনিয়ায়, কিন্তু অন্তর যেন আল্লাহর স্মরণে লেগে থাকে।

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ

'আর জেনে রাখুন, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন।' [সূরা আল আনফাল, ৮: ২৪]

আর-রাযযাক পথ করে দেবেন

আফফান ইবনু মুসলিম আস-সাফফার[৩০] (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর শিক্ষকদের একজন। মু'তাযিলা আর খালকে কুরআনের ফিতনা যখন দেখা দিলো তখন আলিমদের এ ব্যাপারে জেরা করা শুরু হলো।[৩১] খলীফার লোকজন গিয়ে

[৩০] আফফান বিন মুসলিম আস-সাফফার ছিলেন ইরাকের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। জন্ম ১৩৪ হিজরিতে মৃত্যু ২২০ হিজরিতে। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন আহমাদ বিন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদিনী, আল ফাল্লাস ও ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ)।

[৩১] খলকে কুরআনের মাসআলা মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত বড় বড় ফিতনাসমূহের একটি। এই পরীক্ষা আব্বাসী খলীফা মামুনের সময় শুরু হয়। এর প্রবর্তক ছিল মু'তাযিলারা। এদের দাবি ছিল, আল্লাহর কালাম মাখলুক বা সৃষ্ট এই হিসেবে কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। অথচ কুরআন আল্লাহর নিজের কালাম বা কথা—যা তাঁর সত্তার মতোই অনাদি অনন্ত।

এই প্রসঙ্গে মু'তাযিলাদের ব্যাপারেও জানা দরকার। এই দলটি প্রবর্তন করে ওয়াসিল বিন আতা। এরা গ্রিক দর্শন দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিল এবং এর আলোকে যুক্তির কষ্টিপাথরে শরীয়াহ মাপতে চাইত। ফলে যা কিছু অযৌক্তিক লাগত তা প্রত্যাখ্যান করত এবং শরীয়াহর মাঝে আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু যুক্তিবিরোধী মনে হতো তাকে তাদের দৃষ্টিতে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করত। এরা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করত, এদের মতে কবিরা গুনাহগার না মুমিন না কাফির। মু'তাযিলারা পরকালে আল্লাহর দর্শনকে স্বীকার করে না, কবরের আযাব স্বীকার করে না। এ রকম আরও অনেক কুফরি আকীদাহ এদের রয়েছে। প্রসিদ্ধ মু'তাযিলা হচ্ছে আব্বাসী খলীফা মামুন, তাফসিরু কাশশাফের লেখক যামাখশারী, কাযিউল কুযাত আবুল হাসান আব্দুল জব্বার প্রমুখ।

গিয়ে আলিমদের প্রশ্ন করত—কুরআন সৃষ্ট কি না। মু'তাযিলারা বিশ্বাস করত, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। এটি বাতিল আকীদাহ এবং কুফর আকবর। সঠিক আকীদাহ হচ্ছে, কুরআন হলো কালামুল্লাহ। আল্লাহর কালাম। যাই হোক, আফফানকে জেরা করা হলো। গর্ভনরের পক্ষ থেকে এক লোক এসে তাকে বলল,

'আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব। ওপরের নির্দেশ আছে। বলুন, কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি নাকি কুরআন আল্লাহর কালাম?

আফফান (ﷺ) প্রথম সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াত পড়লেন,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ

'বলুন (হে মুহাম্মাদ) তিনি আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়।' [সূরা ইখলাস, ১১২: ১]

তারপর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। তিনি ছিলেন একজন আলিম, তাই তিনি বিস্তারিত বিষয়টা বোঝাতে শুরু করলেন।

প্রশ্নকর্তা তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমি আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতে আসিনি। আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে। আপনি যা উত্তর দেবেন আমি সেটা লিখে নিয়ে যাব। আমার কাজ এতটুকুই। আপনাকে যখন ওরা জেলে ছুড়ে দেবে তখন ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। আর আপনার ভালোর জন্য বলি, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যেসব লোক বলেছে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, তাদেরকে ভালো চাকরি দেয়া হয়েছে। বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা সুখে শান্তিতে আছে। আর যারা 'কুরআনকে সৃষ্টি করা হয়েছে', এই কথা মেনে নেয়নি, প্রথমে তাদের বেতন বন্ধ হয়েছে। তাদের পরিবারসহ উপোস করতে হয়েছে। তারপর আরও খারাপ পরিণতি হয়েছে। এখন বলুন আপনার উত্তর কী?'

আফফান ইবনু মুসলিম বললেন, 'কুরআন আল্লাহর কালাম। কালামুল্লাহ। কুরআন সৃষ্টি না।'

প্রশ্নকর্তা এবার বলল, 'আপনি কি জানেন, এই উত্তরের কারণে আপনার কপালে কী জুটবে?' জবাবে আফফান (ﷺ) কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। বলুন তো সেটা কোন আয়াত?

আফফান ইবনু মুসলিম সূরা আয-যারিয়াতের ২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করলেন। যে আয়াত নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে অনেক আলোচনা করেছি।

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক এবং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।'

এমন সময়েই অন্তরের তাওহিদ আত্মপ্রকাশ করে। এমন পরীক্ষার মুহূর্তে, এমন

নাজুক পরিস্থিতিগুলোতে আপনি বুঝবেন আপনার তাওহিদ আসলে কত মজবুত।

জেরাকারী আফফান ইবনু মুসলিমের উত্তর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিলো। তারপর যা হবার তা-ই হলো। তাঁর বেতন বন্ধ করে দেয়া হলো।

গভীর রাতে দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল আফফানের। কে জানি খুব জোরে দরজায় কড়া নাড়ছে। আফফান ইবনু মুসলিম দরজা খুলে একজন বয়স্ক লোককে দেখতে পেলেন। লোকটি ছিল একজন তেল বিক্রেতা। তাঁর পরনের জামাকাপড় ছিল বেশ নোংরা। যারা তেল বিক্রি করত তাদের পরনের পোশাকে, শরীরে তেল লেগে থাকত। এটাকে খুব সম্মানিত কাজ মনে করা হতো না। কিন্তু এই তেল বিক্রেতাই উম্মাহর খেদমতের দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে।

তেল বিক্রেতা আফফান বিন মুসলিমকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

আফফান তাঁর পরিচয় দিলেন। তেল বিক্রেতা এবার প্রশ্ন করলেন,

'আপনি কি সেই ব্যক্তি, সত্য বলার অপরাধে সরকার আজকে যার বেতন বন্ধ করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।'

তেল বিক্রেতা তখন আফফানে হাতে একটি থলে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে ১ হাজার দিনার আছে। যতদিন না আল্লাহ আপনার জন্য অন্য কোনো পথ খুলে না দেন, ততদিন প্রতিমাসের আজকের তারিখে আমি আপনার জন্য এমন একটা থলে নিয়ে আসব।

তেল বিক্রেতা হয়তো মসজিদে, বাজারে বা অন্য কোথাও শাইখ আফফানের ব্যাপারে শুনেছিলেন। আর হক্কের পক্ষ নেয়া এই আলিমকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিলেন গভীর রাতে। আফফান ইবনু মুসলিম প্রতিমাসে যে বেতন পেতেন তার চেয়ে এই টাকা ছিল বেশি।[৩২] হক্কের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে এক বান্দা যখন আফফানের বেতন বন্ধ করে দিলো, আল্লাহ তখন আরও বেশি টাকা দিয়ে আরেক বান্দাকে আফফানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।[৩৩]

وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

'আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক এবং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।'

---

[৩২] খলীফা মামুন ইমাম আফফান (ﷺ)-কে প্রতিমাসে ৫০০ দিরহাম করে মাসোয়ারা দিতেন।- ইমাম যাহাবী (ﷺ), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১০/২৪৪

[৩৩] পুরো ঘটনাটি রয়েছে ইমাম যাহাবী (ﷺ)-এর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১০/২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়।

আফসোস! আজকে আমাদের উম্মাহর মধ্যে এই তেল বিক্রেতার মতো গাইরাহ[৩৪] সম্পন্ন মানুষের বড়ই অভাব। তবে নিশ্চিত থাকুন, যেই আল্লাহ আফফান ইবনু মুসলিমের জন্য এই তেল বিক্রেতাকে পাঠিয়েছিলেন, সেই আল্লাহই আপনার জন্য কোনো না কোনো কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন। কেননা, তিনি হলেন আর-রাযযাক।

একটি গল্প দিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ। এই গল্পটা আমাদের সবার জন্যই, তবে বিশেষভাবে আমাদের ওই বোনদের জন্য যাদের স্বামীরা আজ কারাগারে বন্দী। এটা আসলে গল্প না, বাস্তব ঘটনা। আমাদের বর্তমান সময়ের ঘটনা। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমাদের সবার এই গল্প থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।

মিসরের এক ভাই গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলেন। স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে গরিব ভাইটির ছোট সংসার। তিনি যখন জেলে গেলেন তাঁর স্ত্রী বাধ্য হলেন দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতে। আজ পৃথিবীজুড়ে অনেক মুসলিম পরিবারের সাথে এমন হচ্ছে।

এক রাতে আমাদের এই বোনের ছেলের মারাত্মক জ্বর এল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। সেই বোনের অবস্থা একটু চিন্তা করুন। স্বামী জেলে। বাপের বাড়িতে অসহায় দিন কাটাচ্ছেন আশ্রিত হিসেবে। এত রাতে ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবেন তিনি? সাথে কোনো টাকা নেই। ডাক্তারের বিল, ওষুধের দাম, কোনো কিছু দেয়ার মতো সামর্থ্য নেই।

আমাদের বোন আল্লাহ আর-রাযযাককে ডাকতে শুরু করলেন। বুকভরা কষ্ট, আর আকুতি নিয়ে সিজদায় পড়ে মালিককে ডাকতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ ছেলের সেবা করছেন তারপর আবার উঠে গিয়ে সালাত আদায় করছেন। দু'আ করছেন চোখভর্তি পানি নিয়ে।

সন্তান যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে মায়ের মন তখন কেমন করে তা বোধহয় মা হওয়া ছাড়া বোঝা সম্ভব না। আমাদের জন্য তাঁরা যে কষ্ট সহ্য করেছেন, তাঁর বিনিময়ে আমার মা এবং আপনাদের সবার মাকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমাদের সেই বোন একবার ঠান্ডা পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে সন্তানের গা মুছে দিচ্ছেন, মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন। আর ফাঁকে ফাঁকে সালাত আদায় করছেন। গভীর, অন্ধকার রাতে আল্লাহর এই বান্দি আল্লাহকে ডাকছেন, আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাইছেন। এবং এটা

[৩৪] গাইরাহ/গাইরাত : আরবী غيرةٌ বা গাইরাহ শব্দের অর্থ আত্মসম্মান, আত্মসম্মানবোধ, (ইংরেজিতে বলা হয় protective jealousy)। পারিভাষিকভাবে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম যাইনুদ্দীন আর রাযী (রহ.) বলেন, 'স্বামী হিসেবে একজন পুরুষ তার পরিবার বা স্ত্রীর ব্যাপারে যে ঈর্ষা পোষণ করে তা হচ্ছে গাইরাহ।'-মুখতারুস সিহাহ, পৃষ্ঠা : ২৩২

দু'আ কবুলের খুব ভালো সময়।

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে?' [সূরা আন-নামল, ২৭: ৬২]

হঠাৎ বাইরে করিডোরে পায়ের আওয়াজ। দরজায় ঠকঠক শব্দ। আমাদের বোন হিজাব পরে দরজা খুললেন। দেখলেন সাদা কাপড় পরা ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আবারও বলি, এটি অতীতের কোনো ঘটনা না। কয়েক শতাব্দী আগের কথা না। আমাদের সময়ের ঘটনা। বোন চমকে উঠলেন। এই সময়ে, এখানে একজন ডাক্তার কীভাবে এল? ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, রোগী কোথায়?

তিনি ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন। ডাক্তার রোগী দেখলেন, প্রেসক্রিপশান লিখলেন। আশ্বস্ত করলেন, গুরুতর কিছু হয়নি, কিছু ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। তারপর বিলের কাগজ দিলেন।

'এই যে, আমার ফী।'

ডাক্তার যখন হাউসকলে আসে তখন তাকে সাথে সাথে টাকা দিয়ে দিতে হয়। আমাদের বোন তখন বললেন, 'আমার কাছে কোনো টাকা নেই, আমি আপনাকে কীভাবে ফী দেবো?'

ডাক্তার তখন বলল, 'আপনার স্বামীকে ডাকুন। তিনিই তো আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি কোথায়?'

সেই বোন আরও অবাক হয়ে বললেন, 'আমার স্বামী আপনাকে ফোন করেননি। তিনি তো আজ অনেক দিন যাবৎ জেলে।'

ডাক্তার ক্ষেপে গেল, 'এটা কেমন কথা? আপনারা আমাকে এত রাতে ডেকে আনলেন। এখন বলছেন ফী দেয়ার টাকা নেই। আবার বলছেন ঘরে আপনার স্বামীও নেই! এটা কি ১৮ নম্বর ফ্ল্যাট না?'

'না, এটা তো ১৮ নম্বর ফ্ল্যাট না। ১৮ নম্বর হলো আমাদের পাশের বাসা।'

এবার ডাক্তার অবাক হয়ে গেল।

সুবহান আল্লাহ!

তিনি ভুল দরজায় বেল দিয়েছিলেন। রাতের বেলা অপরিচিত বাসায় এটা হতেই পারে। কিন্তু ভুল করে ডাক্তার এমন এক ফ্ল্যাটেই বেল দিলেন যেখানে রোগী আছে, যার চিকিৎসা দরকার—এটা কীভাবে হলো? তিনি ভুল করে এ বাসাতে বেল দিলেন আর

এই বাসাতেই একজন রোগী পাওয়া গেল?

'সুবহান আল্লাহ!' ডাক্তার সাহেব আনমনে বলে উঠলেন।

এবার তিনি সেই বোনকে প্রশ্ন করলেন। আপনার পরিচয় কী? আপনারা আসলে কী ধরনের পরিস্থিতিতে আছেন? সবকিছু খুলে বলুন তো।'

বোন তাঁর অবস্থা খুলে বললেন। বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করলেন। ডাক্তারও কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, 'ওয়াল্লাহি! আল্লাহর কসম! আল্লাহই আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে আপনার ছেলের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার গাড়িতে কিছু ওষুধ আছে আমি নিয়ে আসছি। আর এই টাকাগুলো রাখুন। প্রতি সপ্তাহে এসে একবার আপনাদের দেখে যাব।'

এরপর প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার সাহেব ভদ্রমহিলার ছেলেকে দেখতে যেতেন এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন।

এ ঘটনার পর আমাদের এই বোন কারাগারে তার স্বামীর সাথে দেখা করার সময় মজা করে বলতেন, আপনি হয়তো জেলে আরও কিছুদিন থাকতে চাইবেন। আপনি যেভাবে আমাদের দেখাশোনা করতেন তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে আল্লাহ আমাদের দেখাশোনা করছেন।

দারস ৩

উসুলুস সালাসা কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক দারস চলছে। গত দারসগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহর রুবুবিয়্যাত নিয়ে। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা, তিনিই এক ও অদ্বিতীয় রিযকদাতা, এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

লেখক, অর্থাৎ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ) এরপর আলোচনা করেছেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। আল্লাহ আমাদের রব, তিনি আমাদের রিযকদাতা। কিন্তু তিনি কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? দুনিয়াতে আমাদের উদ্দেশ্য কী? নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমাদের কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেননি। সেই উদ্দেশ্যটি কী?

এটা নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ) বলেছেন,

> أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلا ب
>
> আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযক দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি।

আসুন বিষয়টির আরেকটু গভীরে ঢোকা যাক।

হামালা কী?

লেখক বলছেন,

> لَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلا
>
> ...তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি।

হামিল (هامل) বা হামালা (هملا) শব্দের অর্থ কী?

বর্তমানে আরবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ও কথ্যরূপ তৈরি হয়েছে। তবুও হামিল শব্দটা

অহরহ শোনা যায়। হামিল হলো এমন মানুষ যার কোনো কাজ বা উদ্দেশ্য নেই। আজকাল হামিল বলে এমন কাউকে বোঝানো হয়, যার দুনিয়াবি কোনো সফলতা নেই। তবে আরবের মানুষ এই শব্দ ব্যবহার করছে প্রাচীনকাল থেকে। হামিল শব্দের আদি অর্থ হলো, এমন কোনো উট বা প্রাণী যার রাখাল নেই। যা ঘুরে বেড়ায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। এই প্রাণীগুলো দিন-রাত বনে-জঙ্গলে উদ্দেশহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখার কেউ নেই, নিয়ন্ত্রণ করা কেউ নেই। এমন প্রাণীকে বলা হয় হামিল। আর এমন অবস্থাকে বলা হয় হামালা।

লেখক এখানে হামালা দ্বারা মানুষের কথা বোঝাচ্ছেন। এমন মানুষ যাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তারা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখার অনুসরণ করে না। বন্য জন্তু যেমন দিন-রাত নিজের মতো ঘুরে বেড়ায়, এদেরও তেমন অবস্থা। সারা জীবন এরা এলোমেলো ঘুড়ে কাটিয়ে দেয়। দেখুন কুরআনে কীভাবে এই অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

'আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল।' [সূরা আল-আরাফ, ৭: ১৭৯]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

'তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল।'

সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

'আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১২]

সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা

একজন মুমিনকে জানতে হবে, দুনিয়াতে তার উদ্দেশ্য কী। কেন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করলেন? কেন তিনি আমাদের রিযক দেন? এ বিষয়গুলো জানা মুমিন হিসেবে আমার ও আপনার দায়িত্ব।

যদি প্রশ্ন করেন, 'কেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে?'দেখবেন একেকজন একেক ধরনের উত্তর দিচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় বিভিন্ন মতবাদ। কেউ বলে, এটা আল্লাহর হিকমাহ, এটা শুধু আল্লাহই জানেন। এ কথা সঠিক না। যারা এমন বলে তারা আসলে অজ্ঞতার ওপর ইসলামী লেবাস পরাচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহর হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক বিষয় আছে যে ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন না। কারণ, এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

'মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?' [সূরা আল কিয়ামাহ, ৭৫: ৩৬]

মানুষ কি মনে করে, তাকে কোনো হুকুম করা হবে না? কোনো কিছু থেকে নিষেধ করা হবে না? সে কি মনে করে, তাকে দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, তার ওপর শরীয়াহর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না, আর সে যা খুশি তা-ই করতে থাকবে?

মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে—এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে আরেকটা উত্তর দিয়ে থাকে। গত শতাব্দীর বিখ্যাত এক আরব কবি লিখেছিল,

আমি জানি না কীভাবে এখানে এলাম, কিন্তু এসেছি

সামনে যে পথ পেয়েছি তাতে হেঁটেছি

ভালো লাগুক আর না লাগুক, হেঁটে যাব এ পথেই

কীভাবে এলাম?

কীভাবে পথ খুঁজে পেলাম?

জানি না, কিন্তু আমি এসেছি।[৩৫]

এই ধরনের বিশ্বাস আরব বিশ্বের বহু লোকের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। আজও পৃথিবীর অনেক মানুষ এভাবে চিন্তা করে। এক সময় এই কবিতাকে গান বানানো হয়। ষাটের দশকে এই গান বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তখন কবিতার কথাগুলো আরও ছড়িয়ে পড়ে। যে গায়ক এই কবিতার কথাগুলো দিয়ে গান বানিয়েছিল তার নামও ছিল মুহাম্মাদ

---

[৩৫] কবিতাটির রচয়িতা লেবাননের প্রসিদ্ধ কবি ইলইয়া আবু মাদ্বীর (১৮৯০-১৯৫৭ ঈসায়ী)। সুরকার মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাবের সুরে কণ্ঠশিল্পী আব্দুল হালীম হাফিযের কণ্ঠে এটি গান হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে।

ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব। আমরা যে বই পড়ছি—উসুলুস সালাসাহ—সেই বইয়ের লেখকের নামও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব। দুজনের নাম এক; কিন্তু কাজে কত পার্থক্য। একজন তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন, আরেকজন নিজের জীবন নষ্ট করেছে গানবাজনা করে।

এই কবিতা এবং গান নিয়ে শাইখ আব্দুল হামিদ কিশক (ﷺ) সেই সময় একটি খুতবাহ দিয়েছিলেন। ওই গায়কের বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। শাইখ কিশক এই গায়ককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তোমার এক পা কবরে চলে গেছে। অথচ তুমি এখনো জানো না তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অবস্থাতেও তুমি এসব কুফরি কথা বলে যাচ্ছ'। শাইখ কিশক তার খুতবায় লাইন ধরে ধরে এই কবিতার কথাগুলোর সমস্যা তুলে ধরেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন, কেন এই কথাগুলো কুফর।

শাইখ কিশকের খুতবাহ শোনার পর ভেবেছিলাম এই কথাগুলো আসলে ওই গায়কেরই। পরে জানতে পারলাম, এই ফালতু কথাগুলো ইলিয়া আবু মাদ্বীর নামে এক কবির লেখা। তার জন্ম লেবাননে, পরে সে অ্যামেরিকা চলে আসে। আপনারা অনেকেই হয়তো তার নাম শুনেছেন। ১৯১০ সালের দিকে সে অ্যামেরিকাতে চলে আসে এবং স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

এই কবি এবং গায়কের মতো লোকগুলো আরব বিশ্বে অনেক জনপ্রিয় ছিল। তাদের ছিল লক্ষ লক্ষ ভক্ত। জনপ্রিয়তার দিক থেকে গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিল উম্মে কুলসুমের কাছাকাছি। উম্মে কুলসুম কত জনপ্রিয় ছিল সেটা আজ হয়তো আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না। তার জানাযায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ হয়েছিল। যারা আরব তারা নিজেদের বাবা-মা অথবা দাদা-দাদিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তারা উম্মে কুলসুম কিংবা গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে চেনেন কি না। দেখবেন তারা এক নামে চিনবে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন গায়ক-গায়িকা আর কবিদের অনুসারী হয়, যখন নর্দমার আবর্জনাদের বসানো হয় সম্মানের আসনে, তখন সেই জাতি তো পরাজিত হবেই। এমন প্রজন্মের পরাজয় আর অপমান ছাড়া আর কিছু জুটবে না। যে প্রজন্ম গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব আর গায়িকা উম্মে কুলসুমদের মোহে পাগল হয়েছে তারা অপমানিত, পরাজিত আর লাঞ্ছিত হয়েছে বারবার। ১৯৪৮ সালে, পঞ্চাশের দশকে, ৬৭-তে, ৬৯-এ, ৭১-এ ৮০-তে—বারবার তারা পরাজিত হয়েছে। গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিল, যারা অপমানিত। যারা পরাজিত। যারা উদ্দেশ্যহীন—হামাল। নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য কী তা-ই তারা জানে না। আর তাই অপমানিত হয় প্রতি পদেপদে। আর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল

ওয়াহ্হাব (رحمه الله) এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিলেন যারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্ট জানত। তিনি উসুলুস সালাসা আর তাওহিদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর হাতে গড়া প্রজন্ম এই উম্মাহর মধ্যে তাওহিদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

'মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে' এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলে, এটা আল্লাহর হিকমাহ যা আমাদের জানার কোনো উপায় নেই। এটি ভুল ধারণা। আল্লাহ এটি আমাদের জানিয়েছেন। আর এই প্রশ্নের উত্তর জানা আমাদের দায়িত্ব। অন্যদিকে অনেক কবি-গায়ক কিংবা এদের অনুসারীরা বলে, তারা দুনিয়াতে কীভাবে এসেছে জানে না, কেন এসেছে সেটাও জানে না। এসব কথা সম্পূর্ণ কুফর।

অনেকে এ প্রশ্নের জবাবে বলে, আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটাই সঠিক উত্তর। কিন্তু এই উত্তর দেয়া অনেকেরই এ বিষয়ে জ্ঞান এবং বুঝের ঘাটতি রয়েছে। ইবাদাত কী—এই ব্যাপারে তাদের গভীর ও সুষ্ঠু বুঝ নেই। কিন্তু এটাই তাওহিদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে এটা বুঝতে হলে তাওহিদ ও ইবাদাতকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

অনেকে আবার অভিশপ্ত গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে বলে, আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর বিস্মৃত হয়েছেন। ভুলে গেছেন। আর তাই পৃথিবীতে এত সমস্যা। আস্তাগফিরুল্লাহ। এই ধরনের জঘন্য কথাবার্তার জবাব আল্লাহ (عز وجل) অনেক আগে দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ (عز وجل) বলেছেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

'এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন।' [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৬৪]

আরেক ধরনের মানুষ বলে, এই সৃষ্টিজগৎ হলো আল্লাহর খেয়ালখুশির ফসল। স্রষ্টার লীলাখেলা। আস্তাগফিরুল্লাহ। এমন জঘন্য মিথ্যাচার থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এই মিথ্যাচারের জবাবও মহান আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?' [সূরা আল মুমিনুন, ২৩: ১১৫]

আরেক দল লোক বলে, দুনিয়াবি জীবন ছাড়া আর কিছু নেই। মারা গেলে সব শেষ। যদি তা সত্যি হতো, তাহলে মৃত্যুই হতো প্রতিটি জীবের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মৃত্যু কেবল শুরু—এরপরে রয়েছে কবরের জীবন, তারপর পুনরুত্থান, তারপর বিচার, অতঃপর পুলসিরাত পার হয়ে অনন্ত জান্নাত কিংবা জাহান্নামের জীবন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

'কাফিররা দাবি করে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।' [সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪: ৭]

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে

আমাদের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এই উদ্দেশ্য জানা আমাদের দায়িত্ব। এই দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে যাচাই করা হবে কে সফল আর কে ব্যর্থ।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন–কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?' [সূরা আল মূলক, ৬৭: ২]

কে সৎকর্মশীল আর কে নয়–আল্লাহ চান আমরা সেটা আমাদের আমলের মাধ্যমে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করি। জীবন কোনো সুপার মার্কেট কিংবা বাজার না যে, আটটা বা নয়টা বাজবে আর বন্ধ হয়ে যাবে। মৃত্যু আসবে আর তারপর সব শেষ হয়ে যাবে। না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

'আমি কিয়ামাতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।' [সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৪৭]

বিচারের দিন আল্লাহ ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবেন। সেই দিন কারও সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। সরিষার দানার মতো ছোট, অণু পরিমাণ কাজের হিসাবও বাদ যাবে না। সবকিছু মানুষের সামনে হাজির করা হবে–মানুষ দেখবে সে পৃথিবীতে কী কী করেছে। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا

‘এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো?’ [সূরা যিলযাল, ৯৯: ৩]

সেদিন মানুষ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকবে। পেরেশান হয়ে বলবে, এখানে কী হচ্ছে? আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

‘আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামাতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (তাকে বলা হবে) পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।’ [সূরা আল-ইসরা, ১৭: ১৩-১৪]

হাশরের দিন আমাদের সামনে নিজ নিজ আমলনামা পেশ করা হবে এবং বলা হবে,

اقْرَأْ كِتَٰبَكَ

‘পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব।’

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ

‘ছোট-বড় সবকিছুই লেখা আছে।’ [সূরা আল-কামার, ৫৪: ৫৩]

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

‘মানুষ তা-ই পায় যার চেষ্টা সে করে।’ [সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৩৯]

لَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا

আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি।

এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত কুরআনে রয়েছে।

নিজেকে আগুন থেকে বাঁচান

একবার ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে এক লোক হাজির হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আল্লাহ ও বান্দার গোপন কথা সম্পর্কে কী শুনেছেন?’

ইবনু উমার (رضي الله عنه) বললেন ‘আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মুমিনদেরকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ (ﷻ)-এর নিকটবর্তী করা হবে। আল্লাহ তার ওপর পর্দা ঢেলে দেবেন। তারপর তাকে গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

আল্লাহ তাকে বলবেন, ‘তুমি তোমার পাপের সম্পর্কে জানো কি?’

বান্দা বলবে, 'হে আমার রব, আমি জানি।'

বান্দা তাঁর ভুল স্বীকার করে নেবে। সেই দিন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তখন বলবেন, 'তোমার এ পাপ দুনিয়ায় আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ এ পাপগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম।'

এরপর তার নেকির আমলনামা তার কাছে দেয়া হবে। এরপর উপস্থিত সকল মানুষের সামনে কাফির ও মুনাফিকদের ডেকে বলা হবে, এরাই তারা যারা আল্লাহ তা'আলার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল।'[৩৬]

তিরমিযিতে এসেছে, আদি বিন হাতিম (ﷺ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার সাথে তার রব কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না। তখন তার এবং তার রবের মাঝে কোনো অনুবাদকও থাকবে না। পরে সে তার ডানপাশে তাকাবে, কিন্তু যা সে আগে করে পাঠিয়েছিল তা ছাড়া অন্য কিছুই সে দেখবে না। এরপর সে তার বাম দিকে তাকাবে, কিন্তু যা সে আগে করে পাঠিয়েছিল তা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে—সামনে তখন জাহান্নামকে পাবে।

একটি খেজুরের সামান্য অংশ দান করে হলেও তোমাদের যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারে, সে যেন তা করে।'[৩৭]

অর্থাৎ আপনি সেই দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর এই মুহূর্তের কথা চিন্তা করুন। এই পরিস্থিতির ওজনের কথা চিন্তা করুন। ওয়াল্লাহিল আযীম সেই দিন আমাদের অতি সন্নিকটে। তাই সেই দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন। আল্লাহ কারও সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। চিন্তা করুন, একজন মানুষ মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডান দিকে তাকাবে, আর শুধু তার উত্তম আমল দেখতে পাবে। তারপর সে তার বাম দিকে তাকাবে। সেখানে সে শুধু নিজের গুনাহগুলো দেখতে পাবে। ওয়াল্লাহি, এটি এমন এক দৃশ্য যা হৃদয় ভেঙে দেয়। ডান দিকে তার উত্তম আমলগুলো। তার বাম দিকে তার গুনাহ। আর সে যখন সামনে তাকাবে তখন দেখবে জাহান্নাম। পালানোর কোনো রাস্তা নেই। ভালো, মন্দ, সফল অথবা ব্যর্থ সবাই জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে।

সৎকর্মশীল ব্যক্তিরা জাহান্নামের ওপর দিয়ে নিরাপদে চলে যাবেন। আর কাফিররা,

---

[৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৬৮

[৩৭] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৪১৫, ইমাম তিরমিযি (ﷺ)-এর মতে হাসান সহীহ।

আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা যাবে জাহান্নামের ভেতরে। কিছু মানুষ থাকবে, জাহান্নামের ওপর দিয়ে যাবার সময় যাদেরকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। একটি বিখ্যাত হাদীস থেকে আমরা জানি, বিভিন্ন মানুষ পুলসিরাত পার হবে বিভিন্ন গতিতে। হাদীসে এসেছে, সবাই তাদের সামনে জাহান্নামকে দেখতে পাবে। তারপর কেউ জাহান্নামে পড়ে যাবে, আর কেউ তা পার হয়ে চলে যাবে।[৩৮]

আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। এই জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। একটু খেজুর থাকলে সেটাও দান করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। যাতে হাশরের দিন অন্তত কিছু নিয়ে আমরা আল্লাহর সামনে হাজির হতে পারি। ক্ষুদ্র কোনো জিনিস হলেও তা দান করে আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

'তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফল। আর পার্থিব জীবন তো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৮৫)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজন। কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। অথবা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রয়োজনে। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আল গনী। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌম, সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

---

[৩৮] হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) আস সহীহতে (হাদীস নং : ৭৪৩৯) উল্লেখ করেছেন। এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। সেখানে আছে, 'এমন সময় জাহান্নামের ওপর পুল স্থাপন করা হবে।' সাহাবী (রা.)-গণ জিজ্ঞেস করলেন, 'সে পুলটি কেমন হবে, হে রাসূলুল্লাহ?' তিনি উত্তরে বললেন, 'দুর্গম পিচ্ছিল স্থান। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে। শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটাবিশিষ্ট হবে, যা নজদ এলাকার সাদান বৃক্ষের কাঁটার মতো হবে। সে পুলের ওপর দিয়ে ঈমানদারগণ কেউ পার হবে চোখের পলকে, কেউ পার হবে বিদ্যুতের গতিতে, কেউ পার হবে বাতাসের মতো, আবার কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তিপ্রাপ্তরা কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। সবার শেষে যে লোকটি পুল অতিক্রম করবে, সে হেঁচড়িয়ে কোনোভাবে পার হয়ে আসবে।'

يا عِبادِي إنَّكُمْ لَنْ تبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تبْلُغُوا نَفْعِي، فَتَنْفَعُونِي، يا عِبَادِي لو أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا علَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنكُمْ، ما زَادَ ذلكَ في مُلْكِي شيئًا،

'হে আমার বান্দাগণ, তোমরা কখনো আমার এমন অনিষ্ট করতে পারবে না যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং তোমরা কখনো আমার এমন উপকার করতে পারবে না যাতে আমি আসলেই উপকৃত হব। হে আমার বান্দারা, তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিনের অবস্থা যদি এমন হয়, তারা সেই ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে, যে আমাকে সবচাইতে বেশি ভয় করে তাতেও আমার রাজত্ব সামান্যতমও বাড়বে না।'

আল্লাহ্ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের ইবাদাত আল্লাহ্র সাম্রাজ্যের তিল পরিমাণ বৃদ্ধি করবে না। কখনো ভাববেন না, আমরা ইবাদাত করে আল্লাহ্র উপকার করছি।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ (ﷻ) আরও বলেছেন,

يا عِبَادِي لو أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا علَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ما نَقَصَ ذلكَ مِن مُلْكِي شيئًا، يا عِبَادِي لو أنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فأعْطَيْتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ما نَقَصَ ذلكَ ممَّا عِندِي إلَّا كما يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ البَحْرَ،

'হে আমার বান্দারা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জ্বিন মিলে সবার অন্তর যদি সেই ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ, তাহলেও আমার রাজত্বে সামান্যতম হ্রাস হবে না।

হে আমার বান্দাগণ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জ্বিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে যা আছে তা কেবল অতটুকুই কমবে যতটা সাগরের মাঝে সুই ডোবালে সেই সুই (সাগর থেকে) কমাতে পারে।'

আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে একটা সুই পানিতে ডুবিয়ে আবার তুলুন। কতটুকু পানি আপনি সরাতে পারবেন? আল্লাহ্ এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন এবং তিনিই এর মালিক। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

তারপর এই হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ্ কী বলছেন লক্ষ করুন। এই হলো উপসংহার :

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يا عِبَادِي إنَّما هي أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا، فمَن وَجَدَ

خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غيرَ ذلكَ، فلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ.

'হে আমার বান্দারা, আমি কেবল তোমাদের আমলসমূহই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় প্রদান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ অর্জন করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে অন্য কিছু পায় সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।'[৩৯]

আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলেছেন,

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا

'দুনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোরো না।' [সূরা আল-আরাফ, ৭: ৫৬]

অর্থাৎ পুরো দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। এই সৃষ্টিজগতের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা; আর কেউ যখন তা পরিত্যাগ করে তখন সেটাকে বলা হয় বিপর্যয়। এটাই হলো এই আয়াতের অর্থ। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

'মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?' [সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫: ৩৬]

মানুষ কি মনে করে তাকে কোনো হুকুম করা হবে না? কোনো কিছু থেকে নিষেধ করা হবে না? সে কি মনে করে তাকে দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, তার ওপর শরীয়াহর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না আর সে যা খুশি তা-ই করতে থাকবে? আপনি জীবনভর আল্লাহর দেয়া নিয়ামাত ব্যবহার করবেন তারপর মারা গেলে সব শেষ হয়ে যাবে?

এর পরের আয়াতে আল্লাহ মানুষকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। তারপর আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ

'তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?' [সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫: ৪০]

আল্লাহ মানুষকে সামান্য এক ফোঁটা নিক্ষিপ্ত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তারপর পূর্ণ আকৃতি দান করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। সেই একই আল্লাহ কি আমাদের পুনরায়

---

[৩৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৭৭

সৃষ্টি করতে পারবেন না? আমাদের পুনরুত্থিত করে বিচার করতে পারেন না?

আশা করি এতক্ষণের আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, আমাদের জীবনের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে–আর তা হলো জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান হাসিল করা। এই হলো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

আল্লাহ মানবজাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন

উসূলুস সালাসাহর লেখক তারপর বলছেন,

> (الأُولَى) أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً)
>
> আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিযক দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। (বরং হিদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের রিযক দিয়েছেন। তিনি সকল প্রয়োজনের জোগান দিচ্ছেন। কেন? যাতে আমরা তাঁর ইবাদাত করতে পারি।

আর ইবাদাত কীভাবে করব তা শিখিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূল (ﷺ)-গণ ছিলেন সুসংবাদ দানকারী এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী। আল্লাহর সন্তুষ্টি কীভাবে অর্জন করতে হবে তারা সেটা শিখিয়েছেন। এটা আমাদের নিজেদের পক্ষে জানা সম্ভব না। তাই আল্লাহ নবী-রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে তা আমাদের জানিয়েছেন। বর্তমানে আমরা বসবাস করছি প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে। যোগাযোগ, চিকিৎসাসহ অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অভাবনীয় উন্নতি করেছে। আমাদের ঘরে ঘরে কম্পিউটার, হাতে হাতে আইফোন। কিন্তু আজও আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের পথ কী, উপায় কী, পদ্ধতি কী–সেটা জানতে হলে আমাদের যেতে হবে নবী-রাসূল (ﷺ)-এর আনা বার্তার কাছে।

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য নবী-রাসূলগণের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ (ﷻ) তাঁর অসীম দয়া এবং রহমতের কারণে আমাদেরকে হাতেকলমে শেখানোর জন্য নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহ এ উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে জাহিলিয়াত থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, আমাদের কুরআন শিখিয়েছেন। কুরআনের আলো আসার আগে সমগ্র মানবজাতি ডুবে ছিল জাহিলিয়াতের ভয়ংকর আবর্জনায়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ। ইতিপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।' [সূরা আল জুমুআ, ৬২: ২]

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগে তাঁর মতো আরও অনেক রাসূলগণকে বিভিন্ন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাতে সতর্ককারী আসেনি।' [সূরা ফাতির, ৩৫: ২৪]

এমন কোনো জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠাননি এবং তাঁরা মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেননি। আল্লাহ মানবজাতির নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে করে তাঁরা সেসব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সাক্ষী থাকেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে আহলে কিতাব, রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে পৌঁছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাতের দিন) বলতে না পারো, তোমাদের নিকট কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি। এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ১৯]

আল্লাহ বলেছেন, আমরা তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের বিষয়গুলো স্পষ্ট করার জন্য। যাতে মানুষ এ কথা বলতে না পারে, আল্লাহ আমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী পাঠাননি। তারা যেন অজুহাত দিতে না পারে, জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য কেউ আমাদের কাছে আসেনি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছেই সুসংবাদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠানো হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা যে, তিনি আমাদের নিকট সুসংবাদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠিয়েছেন। কারণ কীভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে, কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে তা খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এটা আমাদের কাজ না। এবং আমাদের

পক্ষে তা জানা অসম্ভব। নবী-রাসূল (ﷺ)-গণ এ বিষয়গুলো আমাদের হাতেকলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। আর নবুওয়াতের ধারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' [সূরা সাবা, ৩৪: ২৮]

আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণ করেছেন শেষ নবী এবং সমস্ত মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাদের কাছে আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাতে সতর্ককারী আসেনি।' [সূরা ফাতির, ৩৫: ২৪]

এবং তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।' [সূরা আন-নাহল, ১৬: ৩৬]

লেখকের বক্তব্য,

بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً

...(বরং হিদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।

এর পক্ষে এমন অনেক আয়াত আছে। পরে রাসূলগণের ব্যাপারে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতী হবে

লেখক বলেছেন,

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করা আবশ্যক। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

‘যে লোক রাসূলের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৮০]

শরীয়াহর উৎস হিসেবে কুরআন এবং সুন্নাহ সমপর্যায়ের

আমরা এখানে নবী-রাসূল (ﷺ)-গণের আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করব। দ্বীনের কোনো বিধানের ব্যাপারে যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে প্রমাণ হিসেবে তার গুরুত্ব কুরআনের সমপর্যায়ের হবে। আপনার সামনে কোনো সহীহ হাদীসকে যদি দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, তাহলে তার গুরুত্ব কুরআনের অনুরূপ হবে। হালাল-হারামসহ অন্যান্য সব বিষয়ে এ মূলনীতি অনুসরণ করা হয়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ

‘তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৩]

দেখুন এই আয়াতে আল্লাহ সব মৃত জীব এবং রক্ত হারাম ঘোষণা করেছেন। যদি আমরা শুধু এতটুকু নিই, তাহলে মাছ হারাম হয়ে যাবে। কারণ এই আয়াতে বলা হচ্ছে সব মৃত জীব হারাম। অনেক ভ্রান্ত ও মূর্খ লোক আছে যারা কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে এসে মনমতো বিভিন্ন কথা বলে আর হাদীসের বক্তব্য উপেক্ষা করে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো কুরআন এবং সুন্নাহকে একসাথে আঁকড়ে ধরা। কুরআন এবং সুন্নাহকে একসাথে বুঝতে এবং অনুসরণ করতে হবে। শুধু কুরআনের বক্তব্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি, মাছ হারাম। কিন্তু এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أُحِلَّتْ لنا مَيتَتانِ، ودَمانِ؛ فأمَّا الميتَتانِ: فالحوتُ والجَرادُ، وأمَّا الدَّمانِ: فالكَبِدُ والطِّحالُ.

‘আমাদের জন্য দুটি মৃতকে হালাল করা হয়েছে, হালাল করা হয়েছে দুই প্রকার রক্তকে। মৃত দুটি হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল; আর দুই প্রকারের রক্ত হচ্ছে যকৃৎ ও প্লিহা।’[৪০]

খাওয়ার মতো দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারেও পুরো হুকুম পেতে হলে আমাদের কুরআন এবং হাদীস দুটোই দেখতে হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

[৪০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৫৭২৩, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (ﷺ)-এর মতে হাসান।

ألا إنِّي أُوتيتُ الكِتابَ ومثلَه معه

'আমাকে কুরআন এবং এর অনুরূপ একটি জিনিস দেয়া হয়েছে।'[৪১]

লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন 'কুরআনের অনুরূপ' (مِثلَه) কিছু দেয়া হয়েছে। 'এর চেয়ে নিচের কিছু' বা 'এর অধীনস্থ কিছু' দেয়া হয়েছে–এমন কিন্তু তিনি (ﷺ) বলেননি।

রাসূলের আনুগত্য করার কথা কুরআনে বহু জায়গায় এসেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।' [সূরা আল-আনফাল, ৮: ৪৬]

এবং তিনি (ﷻ) বলেছেন,

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, এবং রাসূলের আনুগত্য করো।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৯২]

দেখুন আল্লাহ এখানে বলেছেন আত্বি'উল্লাহ ওয়া আত্বি'উর রাসূল। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। তিনি কিন্তু বলেননি আত্বি'উল্লাহ সুম্মা আত্বি'উর রাসূল–আল্লাহর ইবাদাত করো, তারপর রাসূলের আনুগত্য করো। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, এবং রাসূলের আনুগত্য করো। ওয়া অর্থ 'এবং'। 'সুম্মা' অর্থ 'তারপর'। আল্লাহ এই ক্ষেত্রে সব সময় ওয়া বলেছেন। কখনো সুম্মা বলেননি।

অনেকে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করার জন্য একটি বহুল প্রচলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। উসুলের খুব কম এমন বই আছে, যেখানে এই হাদীসটি নেই। বিশেষ করে উসুলের আগেকার বইগুলোতে। এই বর্ণনাটি আপনারা সবাই হয়তো শুনে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুয়ায (رضي الله عنه)-কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। হাদীসের এই অংশটুকু ঠিক আছে। পরের অংশে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুয়ায (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء

'বিচার করতে হলে তুমি কীভাবে বিচার ফয়সালা করবে?'

মুয়ায (رضي الله عنه) উত্তরে বললেন,

---

[৪১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৭১৭৪, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সহীহ।

أقضي بكتاب الله

'আমি কুরআন দিয়ে ফয়সালা করব।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন,

فإن لم تجد في كتاب الله

'যদি (এই বিধান) কুরআনে না পাও, (তাহলে) কী করবে?'

তিনি (রা.) উত্তরে বললেন,

فبسنة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم

'তাহলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করব।'

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন,

فإن لم تجد في سنة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله

'যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ ও আল্লাহর কিতাবে খুঁজে না পাও (তাহলে কী করবে)?

তিনি (রা.) উত্তর দিলেন,

أجتهد رأيي

'তাহলে আমি আমার চিন্তা অনুযায়ী ইজতিহাদ করব।'[৪২]

হাদীসের এই দ্বিতীয় অংশটিতে কুরআনের কথা এসেছে তারপর হাদীসের কথা এসেছে। আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এই হাদীসের বক্তব্য তার বিপরীত। কিন্তু এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশের সমস্যা হলো, সনদসূত্রে তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছায় না। এই বর্ণনা যদি সঠিক হয়, তাহলে এটি আমাদের কথার বিরুদ্ধে শক্ত একটি দলিল হবে। কিন্তু সমস্যা হলো হাদীসের এই অংশের সনদ এবং মতন মুনকার।

বিধানের ক্ষেত্রে—হালাল এবং হারামের ব্যাপারে—কুরআন এবং হাদীসের গুরুত্ব সমান। আকীদাহগত বিষয়গুলোতে কুরআন এবং সুন্নাহর গুরুত্ব সমান। ইবাদাতের নিয়মকানুন এবং পদ্ধতিগত বিষয়গুলোতেও কুরআন এবং হাদীসের মর্যাদা একই। লেনদেন এবং মুয়ামালাতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বক্তব্য মেনে চলার গুরুত্ব একই। যদি সহীহ হাদীস থেকে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে সেটা কুরআন থেকে পাওয়া নির্দেশের সমান গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ কোনো কিছুর নির্দেশ দেয়া বা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলা, আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো কিছুর নির্দেশ দেয়া

---

[৪২] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৫৯২

বা কোনো কিছু থেকে বিরত থাকতে বলার গুরুত্ব একই। কারণ, কুরআন এবং সুন্নাহ দুটোই আল্লাহর কাছ থেকে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। তিনি (ﷺ) আমাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন এবং সুন্নাহতে আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে তা করতে আপনি বাধ্য। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি হবে 'শুনলাম এবং মানলাম'। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

'এটা তো ওয়াহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' [সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৪]

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজে থেকে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন।

হাদীসের ওপরে কুরআনের অগ্রাধিকার

তবে এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে হাদীসের ওপর কুরআনের প্রাধান্য আছে। কুরআন সরাসরি আল্লাহর কালাম। কুরআন এবং হাদীস দুটোর অর্থ বা বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, তবে হাদীসের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে; মূল বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কুরআন হলো সরাসরি আল্লাহর কালাম।

আরেকটি দিক আছে যেখানে হাদীসের ওপর কুরআনের প্রাধান্য আছে, তা হলো তিলাওয়াত। কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের জন্য আপনি দশটি করে সওয়াব পাবেন। কিন্তু হাদীসের জন্য এটা প্রযোজ্য না।

তৃতীয় আরেকটি ক্ষেত্রে কুরআন অগ্রাধিকার পাবে। সেটি হলো, কুরআন স্পর্শ করার বিধান। অনেক আলিমের মতো ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। যদিও এ মতটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে অধিকাংশের মতো হলো ওযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। আমাদের হাদীসের কিতাবকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, তবে ওযু ছাড়া হাদীসের কিতাব স্পর্শ করা যাবে।

রাসূল (ﷺ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের আনুগত্য হতে হবে পূর্ণ এবং প্রশ্নাতীত। বাছবিচারের কোনো সুযোগ এখানে নেই। আমি মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করব আর বাইরে করব না—কেউ এমন বললে, সেটা আনুগত্য হবে না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মানব, কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে মানব না। এটা হবে না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে মানব, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানব না। এমন

আপনি সালাত এবং সাওম পালন করেন, হিজাব করেন। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে শরীয়াহর আদেশ মানলেন না। জাহিলিয়াতের অনুসরণ করলেন। এটাও পূর্ণ আনুগত্য হলো না। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য ভিন্ন কিছু করার অবকাশ থাকে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।' [সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৬]

কোনো বিষয়ে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ফয়সালা হয়ে যায় তখন কোনো মুমিনের–নারী কিংবা পুরুষ–সেখানে নিজস্ব কোনো মত থাকার সুযোগ নেই। ভিন্ন কোনো মত অনুসরণ করার সুযোগ নেই। সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করতেই হবে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য হয়, সে গোমরাহ হয়েছে এবং ভুলে নিমজ্জিত হয়েছে।

দেখুন আল্লাহ (ﷻ) এখানে বলেছেন,

'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য ভিন্ন কিছু করার অবকাশ থাকে না।'

এখানে শুধু মুমিন বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু আল্লাহ এখানে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী বলেছেন। আল্লাহ এভাবে বলেছেন বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে ফয়সালা চলে এলে তা মেনে চলা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।' [সূরা আন-নূর, ২৪: ৬৩]

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ অমান্য করবে তাদেরকে আল্লাহ ভয়ানক আযাবের

সংবাদ দিয়েছেন। ফিতনাহ তাদের গ্রাস করবে। এখানে ফিতনাহর একটি অর্থ হতে পারে কুফর। আবার ফিতনাহর অর্থের মধ্যে ভূমিকম্প, বিভিন্ন দুর্যোগ, অত্যাচারী শাসকদের শাসন এবং শত্রুর চড়াও হওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

এগুলো কখন ঘটবে? কাদের সাথে ঘটবে?

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবাধ্য হবে, তারা এসবের সম্মুখীন হবে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
>
> 'রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন–এই উদ্দেশ্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়–তখন মুমিনদের কথা হয় এটাই যে, তারা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।' [সূরা আন-নূর, ২৪: ৫১]

অনেক মানুষ নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করে কিন্তু সত্যিকারের ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা শুনে বলে, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম'। যখন তাদেরকে শরীয়াহ অনুযায়ী ফয়সালা করার ব্যাপারে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যে ব্যাপারে ফয়সালা করে দিয়েছেন সে ব্যাপারে অন্য কোনো কিছু তারা গ্রহণ করতে রাজি না। অন্য কোনো বক্তব্য তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না।

জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর কাহিনি

আবি বারযাত আল-আসলামী (رضي الله عنه)-এর বর্ণিত একটি হাদীস শুনুন। হাদীসটির সারাংশ সহীহ মুসলিমে এসেছে। এই হাদীসের ওপর ইমাম মুসলিম একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন। সহীহ মুসলিমের এই অধ্যায়ের নাম,

> بَابُ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
>
> অর্থাৎ জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর ফযিলত বিষয়ক অধ্যায়।

সাহাবী জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর নামানুসারে ইমাম মুসলিম এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও। একই সনদে মুসনাদু আহমাদে একটি বর্ণনা এসেছে যা আরও বিস্তারিত। এই বর্ণনার সনদ এবং সহীহ মুসলিমের আসা বর্ণনার সনদ এক। কাজেই মুসনাদু আহমাদের এই বর্ণনাও সহীহ।[৪৩]

সাহাবী জুলাইবিব (رضي الله عنه) দেখতে খুব একটা সুদর্শন ছিলেন না। তার চেহারার বর্ণনা

---

[৪৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৪৭১; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৯৭৮৪

থেকে জানা যায়, তিনি সম্ভবত খাটো আকৃতির ছিলেন এবং গরিব ছিলেন। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, সম্ভবত তিনি সমাজের একজন উপেক্ষিত মানুষ ছিলেন। এমন মানুষ, যার কাছে সাধারণত কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না। এমনকি তাঁর নাম–অর্থাৎ জুলাইবিব–ছিল জিলবাব বা বড় চাদর শব্দের তাসগীর বা ক্ষুদ্র রূপ।[৪৪]

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই মানুষটিকে ভালোবাসতেন। তাঁর দিকে মনোযোগ দিতেন। তাঁর কথা শুনতেন, তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হতেন–যেভাবে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষেত্রে হতেন। সবাই মনে করতেন, জুলাইবিব (رضي الله عنه) হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের একজন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মজলিসে একদিন এক আনসারী সাহাবী (رضي الله عنه) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তোমার মেয়ের জন্য আমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আছে।'

আনসারী ব্যক্তিটি খুশি হয়ে বললেন,

> نَعَمْ وكَرامةٌ يا رسولَ اللهِ، ونُعْمَ عَيني،
>
> 'নিশ্চয়, হে রাসূলুল্লাহ, আমি এতে সম্মানিত; এতে তো আমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।'
>
> কিন্তু তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,
>
> إنِّي لستُ أُريدُها لنَفْسي
>
> 'বিয়ের প্রস্তাব আমার জন্য না।'
>
> সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন,
>
> فلمَن يا رسولَ اللهِ؟
>
> 'তাহলে কার জন্য হে রাসূলুল্লাহ?'
>
> রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, لِجُلَيبيبٍ
>
> 'জুলাইবিবের জন্য।'

জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর চেহারা এবং সামাজিক স্ট্যাটাসের ব্যাপারে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা বললাম তার যেকোনো একটির কারণে প্রস্তাব বাতিল করে দেয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। আর এ সবগুলো একসাথে জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখে এই কথা শুনে সেই আনসারী সাহাবী একটু ইতস্তত করলেন। তারপর

---

[৪৪] অর্থাৎ জুলাইবিব মানে হলো ছোট চাদরের মতো স্বল্প বর্ধিত বা খাটো লোক। উনি অতিমাত্রায় খাটো হওয়ায় এই নামে ডাকা হতো।

বললেন,

يا رسولَ اللهِ، أُشاوِرُ أُمَّها

'হে রাসূলুল্লাহ, আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করব।'

স্ত্রীর কাছে যাবার পর এই সাহাবী ঠিক একইভাবে কথাটা বললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, 'এটা কে চাইবে না? এই প্রস্তাবে কে না করবে?'

তারপর সেই সাহাবী বললেন, তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি; জুলাইবিবের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া বদলে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি জামাতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাবার কথা ভাবছিলেন, এখন শুনছেন জুলাইবিব!

তাঁর স্ত্রী তখন বললেন,

أَجُلَيبِيبٌ إِنِيهِ؟ أَجُلَيبِيبٌ إِنِيهِ؟ أَجُلَيبِيبٌ إِنِيهِ؟

'জুলাইবিব! ছি!'

তিনবার এ কথা বললেন। ইনইয়াহ (إِنِيه) মানে ছি! ইয়াক!

তারপর তাঁর স্ত্রী বললেন,

لا، لعَمرُ اللهِ لا نُزَوِّجُه،

'ওয়াল্লাহি, আমরা জুলাইবিবের কাছে আমাদের মেয়েকে বিয়ে দেবো না।'

আমাদের মেয়ের জন্য আরও অনেক ভালো পাত্র আছে। আর তুমি আমাদের মেয়েকে জুলাইবিবের কাছে দিতে চাও? সেই সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তাঁর স্ত্রীর সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য উঠলেন। এই সময় তাঁর মেয়ে প্রশ্ন করল, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কার সাথে আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছেন?'

আনসারী সাহাবীর স্ত্রী সবকিছু খুলে বললেন। মেয়েটি তখন বলল,

أتَرُدُّونَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمْرَه؟ ادفَعوني؛ فإنَّه لم يُضَيِّعْني

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে চাও? আমার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করো। কেননা, তিনি তো আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।'

কী দৃঢ় ঈমান ছিল এই নারীর! আমরা এই পুরো দারসে যা শিখতে চাচ্ছি এই নারীর সিদ্ধান্ত হলো তার দৃষ্টান্ত। এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর ইচ্ছার কাছে সেই মেয়েটি যেভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছেন সেটাই হলো

তাওহিদ, সেটাই হচ্ছে ঈমান এবং ইহসান। এটাই হলো সেই আনুগত্য যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের থাকতে হবে।

এইটুকু যদি আমরা মানতে পারি, তাহলেই যথেষ্ট। আজকের পুরো আলোচনা থেকে যদি শুধু এটুকু আপনি মনে রাখেন, তাহলে সেটা যথেষ্ট। যদি আপনি এই শিক্ষার ওপর আমল করতে পারেন, শক্ত থাকতে পারেন, তাহলে আপনি সফল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এই নারী আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করার মাঝেই জীবনের আনন্দ দেখতে পেয়েছিলেন। কারণ, আনন্দ হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করা। আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করলে, রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করলে আপনাকে সুখের পেছনে ছুটতে হবে না। সুখ তখন আপনার পেছনে ছুটবে। এই নারী তা ভালোমতোই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এই নারী কি জানতে চেয়েছিল, এটা ওয়াজিব কি না? তিনি কি প্রশ্ন করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি ওয়াজিব বুঝিয়েছেন? ফরয বুঝিয়েছেন? নাকি শুধু মুস্তাহাব বুঝিয়েছেন? এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কি বাধ্যতামূলক? তিনি কি বলেছিলেন, আমি তো কুরআনে এমন কিছু খুঁজে পাইনি যে তিনি আমাকে বিয়ের জন্য বাধ্য করতে পারেন।

আনসারদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন সুন্দরী নারী জুলাইবিবকে বিয়ে করবে, এ প্রস্তাব শুনে তিনি কি ঠোঁট বাঁকা করে হেসেছিলেন? তিনি কি বলেছিলেন, এটা আমার জন্য প্রযোজ্য না?

না; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তিনি সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর সুন্নাহ আমাদের মাঝে আছে। সুন্নাহ মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই মহীয়সী নারীর মতোই হওয়া উচিত। এভাবেই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাহ মেনে চলা উচিত।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

> 'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।' [সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৬]

মুমিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও নবী (ﷺ) বেশি প্রিয়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের মোহর কত হবে? বিয়ের পর কোন বাসায় তারা উঠবে? মদিনার কোন এলাকায় তারা থাকবে? ছেলের আয়ের উৎস কী? এ ধরনের কোনো প্রশ্নই সেই মেয়েটির মাথায় আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই পাত্রকে তাঁর জন্য পছন্দ করেছেন—এটাই তাঁর জন্য

যথেষ্ট ছিল। আর কোনো প্রশ্ন তিনি করেননি। তিনি যেন তাঁর পিতা-মাতাকে বলছেন, আমি আপনাদের ভালোবাসি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা অন্য সবার কথার ওপর অগ্রাধিকার পাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা প্রাধান্য পাবার হকদার।

এই হাদীসটি বর্ণনা করার সময় অনেকে একটি বিষয় এড়িয়ে যায়—মেয়েটির জন্য জুলাইবিবকে বিয়ে করা কি বাধ্যতামূলক ছিল?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানে সরাসরি আদেশ করেননি; বরং প্রস্তাব দিয়েছেন। মতামত জানতে চেয়েছেন। এটি তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল না। এটি ছিল খিতবাহ (خطبة) বা প্রস্তাবনা মাত্র, অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছেন।

কিন্তু এই নারী বুঝতে পেরেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রস্তাব কিংবা রেকোমেন্ডেশানও প্রত্যাখ্যান করার মতো না। এই নারীর ঈমান ও তাঁর অবস্থান এমন ছিল, যা কিছু হোক না কেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার অনুসরণ করতে হবে। সেটা যদি নিছক প্রস্তাব কিংবা রেকোমেন্ডেশান হয় তবুও।

অথচ আমাদেরকে আজ সহজ কোনো সুন্নাহর ব্যাপারে বললেও আমরা নানা রকম অজুহাত দেয়া শুরু করি। অনেকে তো এ কথাও বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন এটি ওয়াজিব, কিন্তু কুরআনে তো এটা নেই। তারা আপনার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে তর্ক করে যাবে। আফসোস! অথচ এই নারী এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেটা তাঁর সারা জীবনকে প্রভাবিত করবে। এটাই হলো তাওহিদের সারকথা—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।

আজ এমন অনেক মানুষ দেখা যায়, যারা বহু বছর অথবা সারা জীবন ধরে মদ কিংবা অন্য কোনো আসক্তি কাটাতে পারে না। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মদ্যপান করা যে একধরনের আসক্তি। গবেষকরা এটাও বলেছেন, এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। মদে আসক্ত ব্যক্তিরা যতই মদ থেকে দূরে থাকুক না কেন, যেকোনো সময় আবার মদ্যপান করা শুরু করতে পারে। এই আসক্তি থেকে বের হয়ে আসা খুবই কঠিন।

এবার সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের দৃষ্টান্তের দিকে তাকানো যাক। ইসলামের শুরুর দিকে যখন মদকে নিষিদ্ধ করা হয়নি তখন অনেক সাহাবী মদ পান করতেন। মদ্যপান করা ছিল আরবের সংস্কৃতির অংশ। দৈনন্দিন জীবনের অংশ। মদ পান করত না, এমন মানুষ ছিল বিরল। যেসব সাহাবী (رضي الله عنهم) ইসলামের আগে মদ্যপান করতেন না তাদের নাম আলাদাভাবে সংরক্ষিত আছে। কারণ, মদ্যপান না করাটা সে যুগে ছিল অস্বাভাবিক। তখনকার মানুষ সপ্তাহে এক দিন মদ্যপান করত না। মদ্যপান চলত প্রতিদিন। এমনও না যে, শুধু রাতে মদ খাওয়া চলত। দিন বা রাত, মদ চলত যেকোনো সময়।

সামাজিকভাবে মদ্যপান ছিল প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষ মদে আসক্ত ছিল।

যখন মদ হারাম হবার বিধান এল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে বার্তবাহক মদিনার রাস্তায় এসে চিৎকার করে এ কথা জানিয়ে দিলেন, তখন কী হলো?

কী মনে হয়, সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর অনুভূতি তখন কেমন ছিল? মনে রাখবেন, আজ মদের প্রতি আসক্তিকে একটা অসুখ মনে করা হয়। যখন মদ হারাম হবার বিধান তারা জানতে পারলেন তখন তাঁদের কারও কারও মুখে মদ ছিল। কেউ কেউ চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর আয়াত তাঁরা শুনতে পেলেন:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
>
> 'হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো–যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৯০]

এবং পরের আয়াতে আল্লাহ (عز وجل) বলেছেন,

> فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
>
> 'অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৯১]

তাঁরা (رضي الله عنهم) নিবৃত্ত হলেন। পুরো সমাজ সাথে সাথে মদ ত্যাগ করল। কিছুদিন গ্যাপ দেয়ার পর কেউ আবার মদ্যপান শুরু করলেন না। কেউ এই হুকুম নিয়ে প্রশ্ন তুলল না। কেউ এটুকুও জানতে চাইলো না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে যে বার্তাবাহক এই বিধান ঘোষণা করেছে সে কি আদৌ ঠিক বলছে না ভুল। সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন।

কেন কেউ কোনো প্রশ্ন করলেন না? আসলেই কি এই হুকুম এসেছে? মদ্যপান কি হারাম করা হয়েছে, নাকি মাকরূহ? এটুকুও কেন জানতে চাইলেন না কেউ?

এই হলো তাওহিদ। এই হলো তাওহিদের নির্যাস। তাঁরা (رضي الله عنهم) শুনলেন ও মেনে নিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের অন্তরে প্রোথিত করেছিলেন এই তাওহিদকে, এই ঈমানকে। বছরের পর বছর ধরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের হৃদয় ঈমানে পূর্ণ থাকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মানতে তাঁদের অন্তরে কোনো দ্বিধা না থাকে। আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়ে তাঁরা তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ছেড়ে দিলেন। কোনো ধরনের নজরদারি, জোর-জবরদস্তি, জেল-জরিমানা ছাড়াই তাঁরা আল্লাহর এই হুকুম মেনে নিলেন আনন্দের সাথে। তাঁরা

এই ভেবে সম্মানিত বোধ করতেন যে, তাঁরা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মত।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমাদের মালিকের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে শর্তহীনভাবে বিচারক মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না; বরং তোমার সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ৬৫]

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না নেয়। শুধু আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নিলেই হবে না; বরং তা মানতে হবে কোনো রকম তর্ক ছাড়া। কোনো রকম অসন্তুষ্টি ছাড়া। সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

সেই মেয়েটির বাবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ফিরে আসলেন। এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সিদ্ধান্তে আমরা রাজি।' তারপর, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে মেয়েটির সাথে জুলাইবিব (ﷺ)-এর বিয়ে দিলেন। তাদের বিয়ের কয়েকদিন পর জিহাদের ডাক চলে এল। মাত্র বিয়ে হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, জুলাইবিব (ﷺ) এই সময় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য ইতস্তত করছিলেন? আপনার কি মনে হয়, এমন শক্ত ঈমানের অধিকারিণী নারীর স্বামী হানিমুনে যাওয়া নিয়ে হা-হুতাশ করবে? এই নারীর মতো এত উঁচু ঈমানের অধিকারী একজনের স্বামীর কি সে পরিস্থিতিতে ইতস্তত করার কথা?

না, জুলাইবিব ছিলেন তাঁর স্ত্রীর মতোই–ইস্পাতকঠিন ঈমানের অধিকারী।

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

'সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে।' [সূরা আন-নূর, ২৪: ২৬]

আমাদের এ মজলিসে অনেক ভাই আছেন যারা এখনো বিয়ে করেননি। অনেকে উন্নত ঈমানের অধিকারী পাত্রী পাচ্ছেন না। আসলে আমাদের প্রথমে নিজেদের নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা যদি আমাদের ঈমানের লেভেল উঁচু করতে পারি, তাহলে ইন শা আল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য সে রকম নারী মিলিয়ে দেবেন–যেভাবে তিনি জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর জন্য মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

জুলাইবিব (رضي الله عنه) জিহাদের ডাকে সাড়া দিলেন। রাসূল (ﷺ) সাধারণত যুদ্ধ শেষে প্রশ্ন করতেন,

هل تَفقِدونَ مِن أَحَدٍ؟

'তোমাদের মধ্যে কেউ কি হারানো গিয়েছে?'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন। সাহাবীরা জবাব দিলেন, অমুক অমুককে পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূল (ﷺ) বললেন, 'তোমরা যাঁদের নাম বলেছ তাঁরা ছাড়া আর কি কেউ আছে যাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না?' তাঁরা বললেন, 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)।'

জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর নামটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। জুলাইবিব (رضي الله عنه) সমাজে কিছুটা উপেক্ষিত ছিলেন, একাকী ছিলেন। কিন্তু জুলাইবিব (رضي الله عنه) পেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বন্ধুত্বের সম্মান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে উপেক্ষা করেননি। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন,

لكنِّي أفقِدُ جُلَيبِيبًا

'কিন্তু আমি জুলাইবিবকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

সাথে সাথে সাহাবীরা জুলাইবিব (رضي الله عنه)-কে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁরা জুলাইবিব (رضي الله عنه)-কে খুঁজে পেলেন। তিনি যুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন। সাতজন কাফিরের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি তাদের হত্যা করেছিলেন। আর তাদের আঘাতে নিজেও শহীদ হয়েছিলেন। সাহাবীরা রাসূল (ﷺ)-কে জানালেন, জুলাইবিব (رضي الله عنه) মারা গিয়েছেন। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন,

قتَلَ سَبعةً وقتَلوه، هذا منِّي وأنا منه، هذا منِّي وأنا منه، مرَّتَينِ أو ثلاثًا،

'জুলাইবিব সাতজনকে হত্যা করেছে এবং তারা জুলাইবিবকে হত্যা করেছ। সে আমার আমি তাঁর, সে আমার আমি তাঁর, সে আমার আমি তাঁর–এভাবে তিনবার বললেন।'

সাহাবীরা যখন কবর খুঁড়ছিলেন তখন জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর দেহ ছিল রাসূল (ﷺ) এর হাতে। কল্পনা করা যায়? এই বিরল সম্মানের কথা একটু চিন্তা করুন। তারপর রাসূল (ﷺ) তাঁর নিজের বরকতময় দুহাত দিয়ে জুলাইবিবকে কবরে শুইয়ে দিলেন। জুলাইবিব, সেই মানুষটিকে যিনি ছিল সমাজে উপেক্ষিত এবং যাঁর নাম ছিল অসম্পূর্ণ।

আর সেই নারীর, জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর স্ত্রীর কী হলো?

সাবিত (رضي الله عنه) বলেছেন,

فما كان في الأنصارِ أيِّمٌ أنفقَ منها

‘আনসারদের মধ্যে আর কোনো বিধবা তাঁর মতো অধিক দানশীল ছিল না।’

তিনি দুহাত ভরে দান করতেন। তিনি দারিদ্র্যের পরোয়া করতেন না। বিয়ের প্রস্তাব কবুল করে তিনি যা বলেছিলেন সেটা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু’আ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ صُبَّ عليها الخيرَ صَبًّا، ولا تَجعَلْ عَيشَها كَدًّا كَدًّا

‘ইয়া আল্লাহ, আপনি মেয়েটির ওপর আপনার রহমত ঢেলে দিন এবং তাঁর জীবনকে কঠিন করবেন না।’

অন্য বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, জুলাইবিব (রাঃ)-কে কবরে নামানোর সময় কবরের পাশে এমন কোনো সাহাবী ছিলেন না যিনি জুলাইবিবের জায়গায় নিজেকে দেখতে চাচ্ছিলেন না।[৪৫]

[৪৫] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৯৭৮৪, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (রহঃ)-এর মতে ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর শর্তে সহীহ।

দারস ৪

তাওহিদের তিনটি মূলনীতির প্রথমটিকে আমরা ছয় ভাগে ভাগ করেছিলাম।

এই ছয়টি ভাগের মধ্যে প্রথম দুটি হলো, আল্লাহ একমাত্র মালিক এবং তিনি সবকিছুর জোগানদাতা। আল্লাহই আমাদের রব এবং তিনিই আমাদের রিযকদাতা। তৃতীয় ভাগের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, আল্লাহ (ﷻ) কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং কীভাবে আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি। চতুর্থ ভাগ ছিল, নবী-রাসূল (ﷺ) পাঠিয়ে আল্লাহ (ﷻ) আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে ইবাদাত করলে আমরা লক্ষ্য পূরণ করতে পারব। এটি হলো আলোচনার মধ্যভাগ।

আর আলোচনার উপসংহারে থাকবে নিচের দুটি বিষয়ের আলোচনা :

> فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ
>
> যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কুরআন ও সুন্নাহয় আসা আদেশের প্রকারভেদ

কুরআন ও সুন্নাহয় তিন প্রকারের আদেশ এসেছে।

প্রথম প্রকার : এমন আদেশ যা দলিল দ্বারা ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণিত। অর্থাৎ আদেশটি এমন প্রমাণসহ এসেছে, যা ওই আদেশের বাধ্যতামূলক হওয়া নির্দেশ করে। ইসলামের কিছু কিছু নিয়মকানুন আছে যেগুলোর আদিষ্ট হবার ধরন থেকেই বোঝা যায় যে, বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে এই নিয়মকানুনগুলো মেনে চলতে হবে। যেমন আল্লাহ (ﷻ) সূরা বাক্বারাহতে বলেছেন,

> وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ
>
> 'আর সালাত আদায় করো।' [সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ৪৩]

এটি একটি আদেশ। এই আদেশ পালন করা যে আবশ্যিক তার প্রমাণও কুরআনে এসেছে। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার প্রমাণ দ্বারা এটি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা বাধ্যতামূলক। এখানে কোনো ছাড় নেই। এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্যও নেই।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন আদেশ, যেটি বাধ্যতামূলক না হবার দিকে দলিল ইঙ্গিত করে। এটি প্রথম প্রকারের বিপরীত। অর্থাৎ এমন আদেশ যা কুরআন-সুন্নাহয় এসেছে। আবার ওই আদেশ বাধ্যতামূলক না, এটা কুরআন-সুন্নাহর দলিল দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে,

صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ' . . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ

'মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করো, এটা (নবী ﷺ) তিনবার বলেছেন।'

হাদীসটি এখানেই শেষ হলে এটি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য এখানে শেষ না। কথাটি তিনবার বলার পর তিনি বলেছেন,

لِمَنْ شَاءَ

'যার ইচ্ছে হয় (সে পড়বে)।'[৪৬]

মানে তিনি (ﷺ) বলছেন, 'যাদের ইচ্ছা হয় তারা মাগরিবের পূর্বে সালাত (নফল সালাত) আদায় করো।'

হাদীসের শেষে 'যার ইচ্ছে হয়' অংশটি আসার কারণে মাগরিবের আগে সালাত আদায়ের বিষয়টি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হলো না। কাজেই এটা এমন আদেশ, যে আদেশের সাথেই এমন কিছু এসেছে যার দ্বারা ওই আদেশটি বাধ্যতামূলক না হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ।

এই প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় ওই আদেশটি ওয়াজিবের বদলে সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হবে। ওয়াজিবের বদলে সুন্নাহ গণ্য করার বিষয়টিও প্রমাণের ভিত্তিতে হবে। তবে অনেক সময় সেই প্রমাণ একই হাদীসে না এসে অন্য কোনো হাদীসে আসতে পারে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের চেয়ে ভিন্ন রকম হও। জুতা পরে সালাত আদায় করো। ইহুদীরা ইবাদাত করার সময় জুতা বা খুফ পরে না। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

---

[৪৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১১৮৩

‘তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো, কেননা তারা স্যান্ডেল ও খুফ[৪৭] পরে সালাত আদায় করে না (কাজেই তোমরা এগুলো পরে সালাত আদায় করো)।’[৪৮]

এই হাদীস থেকে আমরা একটি আদেশ পাচ্ছি। এ বিষয়ে বক্তব্য শুধু এটুকুতে সীমাবদ্ধ হলে জুতা পরে সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক হতো। ওয়াজিব হতো। কুরআনে এই ব্যাপারে কোনো আদেশ এলে সেটা যেমন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হতো, এই হাদীসের ক্ষেত্রেও একই কথা। কিন্তু আমরা জানি, সুনানু আবি দাউদে আবু সাঈদ খুদরী (﵁) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। সেখানে বলা হচ্ছে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা অপবিত্র থাকার কারণে জুতা খুলে সালাত আদায় করেছিলেন।’[৪৯] ইবনু মাজাহতেও এ নিয়ে সহীহ একটি হাদীস এসেছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (﵁) বলছেন,

ورأيتُهُ يصلّي حافيًا ومُنتعلًا

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জুতা পরা অবস্থায় এবং জুতা না পরা অবস্থায় দুই অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।’[৫০]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে জুতা পরে সালাত আদায় করতে বলেছেন ইহুদীদের চেয়ে আলাদা হওয়ার জন্য। অন্য হাদীস থেকে আমরা জানছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা পরে সালাত আদায় করেছেন, জুতা খুলেও সালাত আদায় করেছেন। আবার আরেক হাদীস থেকে আমরা জানছি, জুতায় নাপাকি লেগে থাকার কারণে তিনি জুতা খুলে সালাত আদায় করেছেন।[৫১] ফলে জুতা পরে সালাত আদায়ের বিষয়টি আর ওয়াজিব থাকছে না; সুন্নাহ হয়ে যাচ্ছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে, জুতা পরে সালাত আদায়ের বিষয়টি দাড়ির বিধানের মতো না। দাড়ির ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

[৪৭] ‘খুফ’ বলতে এমন ধরনের জুতা বা স্লিপারকে বোঝায় যা পাতলা চামড়ায় তৈরি এবং এর কোনো হিল থাকে না।-Hans Wehr, Dictionary of Modern Wittern Arabic, p: 289, মাদ্দাহ خف

[৪৮] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৬৫২, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (﵀)-এর মতে সনদ হাসান।

[৪৯] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৬৫০, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (﵀)-এর মতে সনদ সহীহ।

[৫০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৯২৮, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (﵀)-এর মতে সনদ সহীহ লি-গাইরিহ।

[৫১] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৬২০, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (﵀)-এর মতে সনদ সহীহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেন স্যান্ডেল খুলে সালাত আদায় করেছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি সাহাবীদের বলেন, ‘জিব্রিল (﵇) আমার কাছে এসে আমাকে জানিয়েছে যে এগুলোতে (স্যান্ডেলে) ময়লা ছিল।’ এ কারণে তিনি সেগুলো খুলে দেখেছিলেন।

خالِفُوا المُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوارِبَ، وأَوْفُوا اللِّحَى.

'মুশরিকদের বিরোধিতা করো, গোঁফ ছাঁটো আর দাড়ি বৃদ্ধি করো।'[৫২]

বিভিন্ন হাদীসে দাড়ি রাখার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। হাদীসগুলো থেকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এমন কোনো হাদীস নেই যেখানে দাড়ি কামানোর কথা বলা হয়েছে। এমন কিছু পাওয়া গেলে বলা যেত, দাড়ি রাখা ওয়াজিব না; সুন্নাহ। কিন্তু এমন কোনো বর্ণনা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পুরো সীরাহ তন্নতন্ন করে খুঁজলেও এমন কোনো ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাড়ি কামিয়েছিলেন। পুরো সীরাহ ঘেঁটে এমন কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে দাড়ি ছাড়া দেখেছেন আর কিছু বলেননি। এমনকি দাড়ি কামানো কাফির-মুশরিকদের দেখলেও তিনি (ﷺ) তাদেরকে দাড়ি রাখার জন্য এবং দাড়ি কামানোর বিরুদ্ধে বলতেন।

কাজেই জুতা পরে সালাত আদায়ের হুকুমটি ওয়াজিবের বদলে সুন্নাহ গণ্য করা হয়, কারণ অন্য হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা খুলে সালাত আদায় করেছেন। অন্যদিকে দাড়ি রাখার হুকুম ওয়াজিব, কারণ এর বিপরীত কোনো অবস্থান কোনো হাদীসে আসেনি।

তাহলে আমরা দেখলাম, দ্বিতীয় প্রকারের আদেশ হলো এমন আদেশ যেগুলো বাধ্যতামূলক না হবার বিষয়টি অন্য কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত। অনেক সময় আদেশ বাধ্যতামূলক না হবার বিষয়টি ওই হাদীসেই আসতে পারে। যেমন মাগরিবের আগে সালাতের হাদীসের ক্ষেত্রে এসেছে। অনেক সময় তা অন্য কোনো হাদীসে আসতে পারে। যেমন জুতা পরে সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমরা দেখলাম।

তৃতীয় প্রকার : সাধারণ আদেশ। তৃতীয় প্রকারকে বলা হয় আমর আল-মুতলাক (الأمر المطلق)। এ ক্ষেত্রে শুধু আদেশ এসেছে; কিন্তু সেগুলো বাধ্যতামূলক কি না, তা নিয়ে অতিরিক্ত কোনো ইঙ্গিত আসেনি।

আগের দুই প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে তাদের বাধ্যতামূলক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দলিল আছে। প্রথম প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে দলিল দিয়ে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, এগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কোনো মাফ নেই। দ্বিতীয় প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে দলিল দিয়েই বলা দেয়া হয়েছে, এগুলোর ওপর আমল করা বাধ্যতামূলক নয়।

কিন্তু তৃতীয় প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই। কুরআন-সুন্নাহয় শুধু

[৫২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৯

এগুলোর আদেশ এসেছে। আর কিছু আসেনি। শুধু আল্লাহ অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আদেশ। বাড়তি কিছু আমরা পাই না। এমন আদেশের ক্ষেত্রে করণীয় কী? এগুলোকে কি ওয়াজিব ধরা হবে নাকি সুন্নাহ ধরা হবে?

এ ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য আছে, তবে সঠিক অবস্থান হলো এ ধরনের আদেশকে ওয়াজিব ধরা হবে। যদি কুরআন বা হাদীস থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোনো আদেশ পাওয়া যায়, আর এর সাথে যদি অন্য কোনো ইঙ্গিত বা নির্দেশনা না থাকে, তাহলে উক্ত আদেশকে ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক গণ্য করতে হবে। এটাই চার মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের মত। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা পাবেন শারহু কাওকাবিল মুনীর গ্রন্থে।[৫৩] এ নিয়ে আরও আলোচনা পাবেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর[৫৪] মাজমু আল ফাতাওয়াতে এবং ইমাম আন-নাওয়ায়ীর সহীহ মুসলিম নিয়ে ব্যাখ্যা গ্রন্থে।

কাজেই আমাদের অবস্থান হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি আমাদের কোনো কাজের

---

[৫৩] হাম্বলী ফিকহ অনুযায়ী উসূলে ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর মূল নাম মুখতাসারুত তাহরির। লেখক প্রখ্যাত হাম্বলী আলিম ইমাম ইবনুন নাজ্জার (রাহিমাহুল্লাহ), জন্ম ৮৯৮ হিজরি, মৃত্যু ৯৭২ হিজরি। তাঁর মূল নাম আবুল বাকা তাকিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল হাম্বলী। শারহু কাওকাবিল মুনীর গ্রন্থটি সৌদির ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শাইখ মুহাম্মাদ আয যুহাইলী ও নাযিহ হাম্মাদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

[৫৪] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) : শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন আহমাদ বিন আব্দিল হালিম ইবনু তাইমিয়্যার জন্ম ১২৬৩ সালের ২২ জানুয়ারি। তিনি ছিলেন একাধারে হাফিযুল হাদীস, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আকীদাহ বিশারদ, ভাষাবিদ, কাযি, মুফাসসির এবং মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও উসুলবিদ এবং মুজাদ্দিদ। ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মুখপাত্র। তিনি তাঁর সময়কার প্রসিদ্ধ দুই শ আলিম হতে ইলম অর্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে রয়েছেন : ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ, ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী, ইমাম মুহাম্মাদ আব্দিল হাদী, ইমাম জামালুদ্দীন মিযযি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুফলিহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ মংগলদের সাথে সরাসরি জিহাদে অংশ নেন। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, শিরক, কুফর ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মুখপাত্রে পরিণত হন। ইসলামের বিশুদ্ধ ও সরল আকীদাহকে যুক্তির ঘোড়েল বেড়াজালে আবদ্ধ করা বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেন এবং সালাফুস সালিহ-এর ধারায় ও পদ্ধতিতে আকীদাহর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ঠুনকো অভিযোগে তাঁকে একের পর এক কারাগারে আটক করায়। জীবনের এক বিশাল অংশ তিনি কারাগারেই কাটিয়ে দেন। এবং তিনি কারাগারেই মারা যান। শাইখুল ইসলামের কারাবন্দী জীবনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নবী ইউসুফের (আলাইহিস সালাম) পাঠশালা, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলির মাঝে রয়েছে : ১) কিতাবুল ঈমান, ২) তালবিসুল জাহমিয়্যাহ, ৩) দারউ তা'আরিদ্বিল আক্বল ওয়ান নাক্বল, ৪) মিনহাজুস সুন্নাতিন নাওয়ায়িয়্যাহ, ৫) আর রিসালাতুত তাদমুরিয়্যাহ, ৬) আল জাওয়াবুস সাহিহ লিমান বাদ্দালা দ্বীনাল মাসিহ, ৭) আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল, ৮) আল কাওয়াইদুন নুরানিয়্যাহ, ৯) মাজমুউল ফাতাওয়া প্রভৃতি।

আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা কুরআনে থাকার মতোই। কুরআনে আসা আদেশ আর হাদীসে আসা আদেশের মধ্যে পার্থক্য নেই। দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে কোনো কথা বলতেন না। তাই কখনো বলবেন না, 'ইসলামের এই বিধিনিষেধগুলো তো কুরআনে নেই, আমি কেন এগুলো মানব? আমাকে আগে কুরআনের দলিল দাও, নাহলে আমি ওয়াজিব বলে মানব না'।

কুরআন ও সুন্নাহতে আসা আদেশের তিনটি প্রকার নিয়ে সংক্ষেপে আরেকবার বলি। প্রথম প্রকার হলো এমন কোনো আদেশ বা নিষেধ যা কুরআন অথবা সুন্নাহতে এসেছে। এবং কুরআন-সুন্নাহর অন্য কোনো বক্তব্য দ্বারা সেই আদেশ বা নিষেধ বাধ্যতামূলক হবার বিষয়টি প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন কোনো আদেশ বা নিষেধ যা কুরআন অথবা সুন্নাহতে স্বতন্ত্রভাবে এসেছে। সেই সাথে এই ইঙ্গিত আছে যে, এই বিধানটি বাধ্যতামূলক না। এই ইঙ্গিত ওই একই হাদীসেই আসতে পারে বা অন্য কোনো হাদীসের মাধ্যমে আসতে পারে।

তৃতীয় প্রকার হলো কুরআন বা সুন্নাহতে আসা এমন কোনো আদেশ বা নিষেধ যেগুলো মেনে চলার কথা এসেছে, কিন্তু এগুলো ওয়াজিব না সুন্নাহ তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। এই ধরনের আদেশ-নিষেধকে ওয়াজিব গণ্য করা হবে।

কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হলে, তাঁর পূর্ণ আনুগত্যে করতে হলে কুরআন এবং সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। এই সম্পর্ককে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য

কুরআন এবং সুন্নাহর বক্তব্য অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। একই বক্তব্য, একই অর্থ ভিন্ন শব্দে কুরআন ও হাদীসে আসে। যেমন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا

> 'আশা করা যায় আল্লাহ প্রত্যেক গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, তবে যে মুশরিক হয়ে মারা যাবে তাকে ক্ষমা করবেন না।'[৫৫]

---

[৫৫] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪২৭০, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহ.) বলেন এর সনদ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের সনদ।

এই হাদীসের বক্তব্য কুরআনের এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ :

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ

'আল্লাহর সাথে শিরক করাকে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন না।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

আবার কুরআনে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

'(হে নবী), আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি।' [সূরা আম্বিয়া, ২১: ১০৭]

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يا أيها الناسُ إنما أنا رحمةٌ مُهداةٌ

'হে মানবজাতি, আমি তো মানবজাতির জন্য নিবেদিত রহমত।'[৫৬]

হাদীস এবং কুরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য লক্ষ করুন। মূল বক্তব্য প্রায় হুবহু এক; যদিও শব্দ আলাদা। কাজেই কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

সুন্নাহর মাধ্যমে বিশদ বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা সুনির্দিষ্টকরণ

অনেক সময় দেখা যায়, কুরআনে কোনো বিষয়ের মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে আর তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে হাদীসে। হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, কিংবা কুরআনের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন কুরআনে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

'সালাত আদায় করো।' [সূরা আল-বাকারাহ, ২: ৪৩]

এই আয়াত পড়ার পর অবধারিতভাবেই কিছু প্রশ্ন আসে, কীভাবে সালাত আদায় করব? কখন কখন সালাত আদায় করব?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এসেছে হাদীসে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي

'আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, ঠিক সেভাবেই তোমরা সালাত

---

[৫৬] ইমাম বাইহাক্বী (رحمه الله), শু'আবুল ঈমান : ২/৫৯৬; দালাইলুন নবুওয়্যাহ :১/১৫৭; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সহীহ।-তাখরিজু শারহিস সুন্নাহ : ১৩/২১৩

আদায় করো।'[৫৭]

আল্লাহ (ﷻ) হজ্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

'ওই ঘর (কা'বা) পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে এমন মানুষের জন্য আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে সেখানে (হজ্ব করতে) যাওয়া অবশ্যকর্তব্য।' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৯৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলছেন,

خذوا عني مناسككم

'হজ্বের সময় পালনীয় কর্তব্যসমূহ আমার কাছ থেকে জেনে নাও।'[৫৮]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে—তোমরা তোমাদের পুরো মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতঃপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো গোড়ালি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৬]

কীভাবে ওযু করতে হবে তা কুরআনে বলা হয়েছে। সুন্নাহ এসে এই তথ্যকে আরও সুনির্দিষ্ট করেছে। যারা অসুস্থ তাদের জন্য ওযুর বিশেষ ব্যবস্থা জানানো হয়েছে সুন্নাহতে। যারা তায়াম্মুম করতে পারবে না তারা কী করবে, বা একজন ব্যক্তি কখন কখন তায়াম্মুম করার উপযোগী হবে, তা-ও জানানো হয়েছে সুন্নাহর মাধ্যমে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

'মানুষ যা করে (ভালো বা মন্দ) তা ছাড়া আর কিছুই তার জন্য নয়।' [সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৩৯]

মানুষের নিজের আমল ছাড়া আর কিছু থাকবে না—এই হলো মূলনীতি। তবে সুন্নাহতে

---

[৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬০০৮, ৭২৪৬

[৫৮] ইমাম ইবনুল মুলাক্কীন (রহ.), আল বাদারুল মুনীর : ৬/১৮৩, সনদ সহীহ; ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.), ফাতহুল বারী : ৩/৬৭৫; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), সহিহুল জামি, হাদীস নং : ৭৮৮২, সনদ সহীহ।

এই মূলনীতির তিনটি ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদমসন্তান যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ব্যতিক্রম থাকে—সাদাকায়ে জারিয়াহ, নেককার সন্তান অথবা উপকারী জ্ঞান যা সে মানুষকে শিখিয়েছিল।[৫৯] এটি আমরা জানছি সুন্নাহ থেকে।

আবার কুরআনে এসেছে,

> يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ
>
> 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকারের) ব্যাপারে আদেশ দিচ্ছেন।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ১১]

উত্তরাধিকারের সম্পদ আপনি কার কার মধ্যে কতটুকু বণ্টন করবেন সেটি আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারের হক্বদাররা সবাই একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে। সুন্নাহর মাধ্যমে মাধ্যমে আরও কিছু তথ্য যোগ করা হয়েছে। যেমন: রাসূলগণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন না এবং উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদ রেখে যান না।[৬০]

কাফির-মুশরিকদের কাছ থেকে কোনো মুসলিম উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পায় না। একইভাবে একজন মুসলিমের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে কাফিরের কাছে যাবে না।[৬১] হত্যাকারীরাও উত্তরাধিকারের সম্পদে কোনো ভাগ পায় না।[৬২] এই তথ্যগুলো কুরআনে আসেনি। আমরা এগুলো জানছি সুন্নাহ থেকে।

তাহলে আমরা দেখলাম, কুরআন এবং সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি

---

[৫৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৬৩১; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ২৮৮০; হাদীসটি হচ্ছে, 'মানুষ মারা গেলে তার সকল আমলই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল ব্যতিক্রম—চলমান সাদকাহ, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।'

[৬০] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেনে

.إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

'আমরা (নবীরা) ওয়ারিশ দেখে যাই না, আমরা যা (দুনিয়ায়) ছেড়ে যাই তা সাদকাহ।'-সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৬৬০৭, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে সহীহ। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৩৩৬, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৬১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
'মুসলিম কখনো কাফিরের ওয়ারিশ হয় না আর কাফিরও কখনো মুসলিমের ওয়ারিশ হয় না।'-সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ২২২৩, সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৭৬৪

[৬২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
'ঘাতক ওয়ারিশ হয় না।'- সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ২৭৪৭, শাইখ যুবাইর আলী ঝাই (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে হাসান; আস সুনানুল কুবরা : ৬/২২০

দিক হলো, সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ের বিশদ বর্ণনা, ব্যাখ্যা, কিংবা নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে।

হাদীস শরীয়াহর স্বতন্ত্র উৎস

কুরআন এবং সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দিক হলো, হাদীস স্বতন্ত্রভাবে শরীয়াহর বিধানের উৎস হতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞদের অনেক আপত্তি থাকে। কিছু লোক আছে যারা সুন্নাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। এদেরকে বলা হয় কুরানিয়্যুন বা কুরানিস্ট। এরা সরাসরি বলবে, তারা হাদীস স্বীকার করে না। আবার কিছু লোক আছে যারা হাদীস সরাসরি অস্বীকার করে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে করে। এরা আরও বেশি বিষাক্ত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আসলেই অজ্ঞ। এরা বলে, হাদীস তো অনেক ধরনের আছে। কিছু হাদীস দুর্বল, কিছু হাদীস জাল, কিছু হাদীস মুনকার। আমরা সাধারণ মানুষরা কীভাবে বুঝব কোনটা কোন ধরনের হাদীস? তার চেয়ে আমরা সব হাদীসকে অস্বীকার করব।

তাদের এই কথার জবাব দেয়ার আগে, হাদীস কীভাবে স্বতন্ত্রভাবে শরীয়াহর বিধানের উৎস হতে পারে তার কিছু উদাহরণ দিই।

একজন ব্যক্তি একই সাথে ভাগনি-খালা কিংবা ভাতিজি-ফুপুকে বিয়ে করতে পারবে পারবে না। এটি শরীয়াহতে জায়েজ না। এই বিধান আমরা কোথা থেকে জানছি? হাদীস থেকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

'কোনো নারীকে তার ফুপুর সাথে এবং কোনো ফুপুকে তার ভাতিজির সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। একইভাবে কোনো নারী ও তার খালা এবং কোনো খালা ও তার ভাগনিকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।'[৬৩]

রমাদ্বান মাসে স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার কারণে যদি কারও সিয়াম ভেঙে যায়, তাহলে কাফফারা হিসেবে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? সুন্নাহ থেকে।[৬৪] এটা আমরা স্বতন্ত্রভাবে কেবল সুন্নাহ থেকেই পাচ্ছি, কুরআন থেকে

---

[৬৩] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ২০৬৫, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

[৬৪] আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, 'একজন লোক নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন জিনিস তোমায় ধ্বংস করল?' সে উত্তর দিলো, 'আমি রমাদ্বানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি।' তখন নবী (ﷺ) বললেন, 'তাহলে (এর কাফফারা হিসেবে) একজন দাস মুক্ত করো।' সে বলল, 'আমি এটা পারব না।' নবী (ﷺ) বললেন, 'তাহলে লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালন করো।' সে বলল, 'আমি এতে সমর্থ নই।' তিনি বললেন, 'তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াও।' সে বলল, 'আমি পারব না।' তখন তিনি (ﷺ) তাকে বললেন,

না। ওযু করার সময় চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার বিধান আমরা সুন্নাহ থেকে পাচ্ছি।[৬৫] এ ব্যাপারে কুরআনে কিছু নেই। রমাদ্বান মাসে আমরা যে যাকাতুল ফিতর দিই–যেটা অনেক দেশে ফিতরাহর টাকা নামে পরিচিত–সেটা আমরা কেবল সুন্নাহ থেকেই পাচ্ছি।[৬৬]

ইমাম আশ শাফে'ঈ (رحمه الله) বলেন,

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد

'মুসলিমরা এই বিষয়ে একমত (ইজমা রয়েছে) যে, কোনো কিছুকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ স্পষ্ট করলে তা অপর কারও কথায় বাদ দেয়া যাবে না।'[৬৭]

সুন্নাহতে এমন অনেক কিছু এসেছে যা স্বতন্ত্রভাবে শরীয়াহর বিধানের উৎস। এ ক্ষেত্রে হাদীসের অবস্থান কুরআনের অনুরূপ।

একবার এক মহিলা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর কাছে গিয়ে বলল, 'আপনিই তো সেই ব্যক্তি, যিনি বলে বেড়াচ্ছেন, 'নামিসাহদের (نامصة) ওপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হোক?'

নামিসাহ হলো ঐসব নারী যারা নিজেদের ভ্রু কামায় বা ভ্রুপ্লাক করে। ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বলতেন, 'নামিসাহদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক।' তাঁর এই কথা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহিলা তাই প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি মানুষদের মাঝে বলে বেড়াচ্ছেন, যারা ভ্রুপ্লাক করে তাদের ওপর যেন

'বসো।' তখন সে বসল। এর মধ্যে এক ঝুড়ি খেজুর আনানো হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যাও, এটা দান করে দাও।' সে তখন বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! এই দুই লাভা প্রান্তরের মাঝে (অর্থাৎ মদীনায়) এমন কোনো পরিবার নেই, যে এই দানের জন্য আমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী।' তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'যাও, এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।'-ইমাম ইবনু মাজাহ (رحمه الله), আস সুনান, হাদীস নং : ১৩৬৪, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله)-এর মতে সনদ সহীহ। সামান্য শব্দ-পার্থক্যসহ আছে সহীহ মুসলিমে, হাদীস নং : ১১১১

[৬৫] সাফওয়ান বিন আসসাল (رضي الله عنه) বলেন, 'নবী (ﷺ) আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন সফরে থাকাবস্থায় বা মুসাফির থাকাবস্থায় তিন দিন তিন রাত জানাবাত (ফরয গোসলের কারণ) ব্যতীত চামড়ার মোজা না খুলি, এমনকি প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘুমের জন্যও নয়।'-সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩৫৩৫। ইমাম তিরমিযি (رحمه الله)-এর মতে হাসান সহীহ।

[৬৬] আব্দুল্লাহ বিন উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন, যেন লোকেরা ঈদের সালাতে যাবার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে।' সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৮৬; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৫০৯

[৬৭] ইমাম আশ শাফে'ঈ (رحمه الله), আর রিসালাহ, পৃষ্ঠা : ১০৪

আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়?

তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।'

মহিলাটি বলল, 'আমি আগাগোড়া কুরআন পড়ে দেখেছি। কোথাও এমন কিছু পাইনি। আমি গোটা কুরআন তন্নতন্ন করে খুঁজেও এ রকম কোনো আয়াত পেলাম না।'

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) বললেন, 'তুমি যদি খোঁজার মতো করে খুঁজতে, তাহলে ঠিকই পেতে।'

'আপনি কিসের ভিত্তিতে এটা বললেন?' মহিলা প্রশ্ন করল।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) বললেন,

> وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ
>
> 'রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকো।' [সূরা হাশর, ৫৯: ৭][৬৮]

নামিসাহদের ওপর অভিশাপের কথা এসেছে সুন্নাহতে। আর কুরআনে বলা হচ্ছে সুন্নাহতে যা গ্রহণ করতে বলা হবে তা গ্রহণ করতে, যা বর্জন করতে বলা হবে তা বর্জন করতে।

মহিলা বলল, 'হ্যাঁ, আমি কুরআনে এই আয়াত পড়েছি।'

তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

> لعن اللهُ...والنامِصَاتِ
>
> 'যেসব নারীরা তাদের ভ্রু প্লাক করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।'

এটি সহীহ হাদীস। বুখারী এবং মুসলিম এই দুই হাদীস গ্রন্থেই এই বর্ণনা এসেছে।[৬৯]

দেখুন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) বলছেন, ওই মহিলা যদি ঠিকমতো খুঁজত, তাহলে কুরআনে এটি পেত। কিন্তু আমরা জানি, কুরআনে এই ব্যাপারে বক্তব্য আসেনি; সুন্নাহয় এসেছে। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) কেন এমন বললেন? কারণ আল্লাহ (ﷻ) কুরআনেই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, রাসূল যা গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করো। যা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

---

[৬৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২১২৫

[৬৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২১২৫; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৯৪৮

আপনারা সবাই জানেন বোধহয়, হজ্ব করার সময় হাজীদের এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়। এই কাপড়ের নিচে অন্য কোনো কাপড় মানে আন্ডারগার্মেন্টস বা অন্তর্বাস পরা নিষেধ। স্বাভাবিকভাবে যে কাপড় পরে আমরা অভ্যস্ত সেই কাপড় পরে হজ্ব করা যায় না। হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট কাপড় আছে। আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ (ﷺ) একবার দেখলেন এক লোক সাধারণ পোশাক পরেই হজ্ব করছে। তিনি ওই লোকটিকে বললেন, এই পোশাক পরে হজ্ব করলে চলবে না। ওই লোকটি আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদকে চ্যালেঞ্জ করে বসল, 'কুরআনের কোথায় লেখা আছে যে, আমি ইহরামে এই পোশাক পরতে পারব না?'

আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ (ﷺ) তখন সেই আয়াতটিই তিলাওয়াত করলেন যা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (ﷺ) তিলাওয়াত করেছিলেন,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

'রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকো।' [সূরা হাশর, ৫৯: ৭]

সুন্নাহ অস্বীকারকারীরা

একটু আগে আমরা বলেছি, এমন কিছু লোক আছে যারা হাদীস অস্বীকার করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হাদীস তো অনেক ধরনের আছে। কিছু হাদীস দুর্বল, কিছু হাদীস জাল, কিছু হাদীস মুনকার। আমরা সাধারণ মানুষরা কীভাবে বুঝব কোনটা কোন ধরনের হাদীস? তাই হাদীস আসলে মানা সম্ভব না।

এই ধরনের লোকেরা সরাসরি হাদীস অস্বীকার করে না। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে করে। সায়্যিদিনা আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (ﷺ)-এর উচ্চারিত একটি বাক্য দিয়েই এসব আপত্তির জবাব দেয়া যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (ﷺ)-এর কাছে এসে বলা হলো,

قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة

'এই যে এই জাল হাদীস (এখন করণীয় কী)?'

তিনি উত্তরে বললেন,

تعيش لها الجهابذة' !

'পণ্ডিত ব্যক্তিরা তো এ জন্যই বেঁচে আছেন।'[৭০]

---

[৭০] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (ﷺ), উমদাতুল কারী : ২/২২৬

অর্থাৎ এইসব ফিতনাহ মোকাবেলার জন্যই তো উম্মাহর মহান আলিমগণ আছেন, হাদীস বিশারদগণ আছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

'আমিই এই যিকর নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।' [সূরা আল-হিজর, ১৫: ৯]

এই আয়াতে 'যিকর' শব্দের দ্বারা কুরআন এবং সুন্নাহ, দুটিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহর সংরক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহ নিয়েছেন। অর্থাৎ কিছু মানুষ হয়তো হাদীসের সাথে মনগড়া কথা জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত মানুষও উম্মাহর মধ্যে থাকবে। জাল, বানোয়াট, ভিত্তিহীন হাদীস বানিয়ে, মূল হাদীসের কোনো অংশ বাদ দিয়ে বা কোনো মনগড়া কথা জুড়ে দিয়ে ফিতনাহ করার লোক যেমন থাকবে, তেমনি এই ফিতনাহর মোকাবেলার জন্য মহিরুহরাও থাকবেন। কোন হাদীস সঠিক আর কোন হাদীস সঠিক না, হাদীসের মান যাচাই সংক্রান্ত এই শাস্ত্র এতই চমৎকার যে, অনেক ওরিয়েন্টালিস্ট এতে মুগ্ধ হয়ে যায়। এই শাস্ত্র আয়ত্ত করার পেছনে কাটিয়ে দেয় সারা জীবন। হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শেখে, প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

তাই 'দুর্বল ও জাল হাদীস আছে, তাই হাদীস মানা যাবে না' এ ধরনের কথা কেবল মূর্খদের পক্ষেই বলা সম্ভব। হাদীসের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণের ওপর ইতিহাস জুড়ে এত এত কাজ হয়েছে যে, শুধু অজ্ঞ জাহেল লোকেরাই এমন বলতে পারে। আলিমদের কাছে যান, তাঁরা আপনাকে পথ দেখাবেন। তাঁরা জানিয়ে দেবেন কোন হাদীস সহীহ আর কোনটা দুর্বল। এগুলো নিয়ে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই।

হাদীস অস্বীকার করার এই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর মাঝে আজ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আমি এখানে সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর কথা বলছি না যেখানে খোলাখুলি ঘোষণা দিয়ে কুফর দিয়ে শাসন করা হয়। বরং আমি ওইসব ভূখণ্ডের কথা বলছি, যারা বড় গলায় নিজেদেরকে তাওহিদের রক্ষক বলে দাবি করে। আমি ওইসব ভূখণ্ডের কথা বলছি, যারা নিজেদেরকে সালাফিয়্যাহর রক্ষক দাবি করে থাকে।

হাসান আল মালিকি নামে এক লোক আছে। সে নিজেকে দা'ঈ, শাইখ এবং মুজাদ্দিদ হিসেবে উপস্থাপন করে। লোকেরা তাকে বলে 'মুফাক্কির'। এগুলো নতুন আমদানি হওয়া শব্দ। টেলিভিশন, ইউটিউব, টুইটার সবখানেই এই হাসান আল মালিকির দাপট। লাখ লাখ ফলোয়ার। এই লোক ওই ভূখণ্ডে থাকে, যে ভূখণ্ডের শাসকরা

নিজেদেরকে 'তাওহিদের রক্ষক' বলে দাবি করে। সেই ভূখণ্ডে বসেই এই লোক প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে এবং চরম ঔদ্ধত্যের সাথে হাদীস অস্বীকার করে। সে টিভিতে গিয়ে বলে, 'ইরানের খোমেনি মুনাফিক মুয়াবিয়ার চেয়ে উত্তম!'

আউযুবিল্লাহ। আমি এখানে তার কথা উদ্ধৃত করলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবী, ওয়াহি লেখক সায়্যিদিনা মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)-এর ব্যাপারে সে এমন কথা বলেছে। এটা কিছুদিন আগের ঘটনা। সৌদি আরবের উইসাল নামের এক টিভি চ্যানেলে এসে হাসান আল মালিকি বলেছে, সাহাবী মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) নাকি একজন মুনাফিক এবং জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে আছেন! আর ইরানের অভিশপ্ত খোমেনি নাকি মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)-এর চাইতে শতগুণে ভালো!'

রাদ্বিয়াল্লাহু আন' মুয়াবিয়া। সাহাবীদের মর্যাদা এবং প্রশংসা করে নাযিল হওয়া কুরআনের সব আয়াত এবং হাদীসকে সে এই এক দাবির মাধ্যমে অস্বীকার করে বসল। সে একবার টুইটারে লিখেছিল, 'সুন্নাহ মানার কোনো দরকার নেই, কুরআনের অনুসরণ করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

এই লোকটি সরাসরি হাদীস অস্বীকার করল। চিন্তা করা যায়! কত বড় স্পর্ধা! এসব কথা সে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়। জানেন এই লোকের বিরুদ্ধে কে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন? কে এই কুফরি কথাবার্তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন?

শাইখ নাসির আল ফাহাদ[৭১]।

আজ থেকে ১৪-১৫ বছর আগে[৭২] শাইখ নাসির আল ফাহাদ (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুক) হাসান আল মালিকির ফিতনাহর মোকাবেলায় একটি বই লেখেন। কাশফুশ শুবুহাত। তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম হাসান আল মালিকির ফিতনাহ মোকাবেলায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় ১২ বছর আগে আমি চেষ্টা করেছিলাম শাইখ নাসির আল ফাহাদ আর হাসান আল মালিকির মধ্যে আকীদাহ নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করতে। আসলে শাইখ নাসির আল ফাহাদ (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুক) আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এই বিতর্ক আয়োজন করার জন্য। আমি হাসান আল মালিকিকে আমন্ত্রণ জানালাম। বলাবাহুল্য যে, সে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করে এড়িয়ে গেল।

হাসান আল মালিকির মতো অনেক লোক আজ ওই ভূখণ্ড থেকে নিজেদের গোমরাহি

---

[৭১] শাইখ নাসির আল ফাহাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নবী ইউসুফের (عليه السلام) পাঠশালা, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

[৭২] শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এই বক্তব্য দিয়েছেন ২০১৩-১৪ সালে।

ছড়াচ্ছে, যে ভূখণ্ড তাওহিদের রক্ষকদের ভূমি হবার কথা। অথচ তাওহিদের ভূখণ্ড থেকে এই লোক প্রকাশ্যে বলছে আমাদের সুন্নাহ মানার দরকার নেই। কুরআন মানলেই হবে। সে সাহাবী (ﷺ)-দের আক্রমণ করছে, ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে তাচ্ছিল্য করছে। অন্যান্য দেশগুলোতেও এই ধরনের এবং এরচেয়ে আরও নিকৃষ্ট লোক দেখা যায়।[৭৩]

সৌদি আরবেই থাকে এমন আরেকজন হলো তুর্কি আল হামাদ। এই লোক লিখেছিল, 'আল্লাহ আর শয়তান হলো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।'

সে আরও লিখেছিল, 'আল্লাহ বড় অসহায়। আমাদের পাপ আর ভুলভ্রান্তির বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা বেচারাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি।'

আরেক জায়গায় এই লোক লিখেছিল, 'কোথায় আল্লাহ? কেউ দেখেছ? তাকে পেলে আমার ড্রয়ারে লক করে রাখতাম।'

নিঃসন্দেহে এগুলো কুফর। এগুলো সোজাসাপ্টা কুফরি। নাউযুবিল্লাহ। নাস'আলুল্লাহা সালা মাহ।

এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কুফরি কথাবার্তার জন্য তুর্কি আল হামাদকে কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি। কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। সে ওই ভূমিতে বসে এসব কথা বলেছে, যার শাসকরা তাওহিদের রক্ষক দাবি করে। আজ থেকে পনেরো বছর আগে তুর্কি আল হামাদের এই তিনটি বক্তব্য সম্পর্কে শাইখ হামুদ আল উক্বলাহ[৭৪] (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, যে এ রকম কথা বলে হয় সে হয় পাগল অথবা সে যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে থাকে, তাহলে সে নিশ্চিত মুরতাদ।

পাঁচ-ছয় মাস আগে সে আবারও চরম সীমালঙ্ঘন করল। টুইটারে লিখল,

---

[৭৩] হাসান ফারহান আল মালিকির জন্ম ১৯৬৯ বা ৭০ সালে সৌদি আরবের জাযানে। ১৯৯১ সালে সে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সম্পন্ন করে। আহলে কুরআনী চিন্তাধারা দীর্ঘদিন প্রচার করলেও ইয়েমেনের হুথিদের সমর্থন করার কারণে ২০১৭ সাল থেকে কারাবন্দী আছে।

[৭৪] উস্তাযুল আসাতিযা শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আশ শু'আইবীর আল খালিদীর জন্ম ১৩৪৬ হিজরি মোতাবেক ১৯২৭ বা ২৮ সালে সৌদি আরবের আল কাসিমে। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত খালিদ গোত্রের লোক। তাঁকে বলা হয় مدفع التوحيد বা তাওহিদের কামান। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আব্দুল লতিফ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ ও মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখের ছাত্র। আরবের প্রখ্যাত অনেক আলিমই তাঁর ছাত্র ছিলেন। যেমন : শাইখ আলী বিন খুদাইর আল খুদাইর, শাইখ আব্দুল্লাহ আল গুনাইমান, শাইখ সালমান বিন ফাহাদ আল আউদাহ, শাইখ আব্দুল আযিয আলুশ শাইখ প্রমুখ। তিনি ২০০১ সালে ইন্তিকাল করেন।

وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله

'আমরা এমন এক যুগে এসে পৌঁছেছি, এখন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর আকীদাহ সংশোধন করা প্রয়োজন।'

নাউযুবিল্লাহ। সৌদি আরবে বসেই সে এটা লিখল। এ কথার পর হাতেগোনা কয়েকজন মুসলিম এই নরাধামের কথায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ক্রোধান্বিত মুসলিমদের শান্ত করার জন্য সৌদি সরকার তুর্কি আল হামাদকে বন্দী করে। এগুলো পাঁচ-ছয় মাস আগের ঘটনা।

সৌদি সরকার যখন তুর্কি আল হামাদকে গ্রেফতার করল, তখন আমি টুইট করলাম, 'তুর্কি আল হামাদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে সত্য, তবে খুব শীঘ্রই তাকে মুক্তি দেয়া হবে।' আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। গত সপ্তাহে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মনে হয় ছয় মাসও জেল খাটতে হয়নি। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। কোনো বিচার হয়নি। ছয় মাস যেতে না যেতেই সে জেলের বাইরে এসে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

এইসব কুফরের বিরুদ্ধে কারা গর্জে উঠেছিলেন? সেইসব সিংহপুরুষ, যারা তাঁদের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন তাওহিদের শিক্ষা ও দাওয়াহর পেছনে। যারা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং উলামায়ে নাজদের ইলমের ধারক ও বাহক। তারাই সত্যিকার অর্থে তাওহিদের প্রহরী। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের ইলমের প্রকৃত উত্তরসূরি। তাওহিদের সাথে আপস না করার কারণে, হক্বের প্রশ্নে ছাড় না দেয়ার কারণে আজ তাঁরা বন্দী। বছরের পর বছর তাঁরা কারাগারের অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন। ১০ বছর... ১৫ বছর... ২০ বছর... কেউ কেউ তার চেয়েও বেশি।

আমি খুব স্পষ্টভাবেই জানতাম, সৌদি সরকার তুর্কি আল হামাদকে ছেড়ে দেবে। আমি গ্বাইব জানি না আর জ্যোতিষীর কাছেও যাই না। জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ায় আমরা বিশ্বাস করি না, মাআযআল্লাহ। কিন্তু আমরা অজ্ঞতার ওপর ভর করেও কথা বলি না। আমরা ওখানকার শাসকদের বাস্তবতা জানি। তাদের প্রকৃত চেহারা আমাদের কাছে পরিষ্কার। তারা কী দিয়ে শাসন করে, কীভাবে শাসন করে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার। আমরা বিশ্বাস করি, অন্ধ অনুসরণ শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য। আর এটা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এরই দাবি। যে সপ্তাহে তুর্কি আল হামাদকে ওরা মুক্তি দিলো সেই সপ্তাহেই তাওহিদের পক্ষে কথা বলার কারণে বন্দী করা উম্মাহর সিংহ পুরুষদের কোর্টে হাজির করা হয়। ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে, হাত বেঁধে।

শাইখ আলী আল-খুদাইরের ছেলে তাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'আব্বু তুমি মোজা

পরে আছো কেন?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'আমাদের পায়ের শেকলগুলো খুব শক্ত করে বাঁধা।'[৭৫]

দশ বছরের বেশি সময় ধরে আজ তাঁরা ওখানকার জেলে বন্দী। আর ইলহাদ প্রচার করা, কুফর ও নাস্তিকতা প্রচার করা তুর্কি আল হামাদরা ছয় মাসের মধ্যে জেল থেকে বের হয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।[৭৬]

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবাধ্যতাকারী নিশ্চিত জাহান্নামে প্রবেশ করবে'

উসূলুস সালাসাহর লেখক বলছেন,

وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর) অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এখানে প্রশ্ন হলো, রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য প্রত্যেক ব্যক্তিই কি জাহান্নামের আগুনে পুড়বে? তারা সবাই চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে?

আসলে এ বিষয়গুলো নির্ভর করে তাদের গুনাহর প্রকৃতি ও মাত্রার ওপর। এ ক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে।

অবাধ্যতার প্রকারভেদ

রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্যতা তিন ধরনের হতে পারে।

শিরক আকবর বা কুফর আকবর

যদি কেউ শিরক আকবর কিংবা কুফর আকবর করে–এবং এর ওপরই মৃত্যুবরণ করে–তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সে ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

---

[৭৫] শাইখ আলী বিন খুদাইর আল খুদাইরের জন্ম ১৯৫৪ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে। ১৯৮৩ সালে আল কাসিমের জামিয়াতুল ইমাম থেকে উসুলুদ্দীন বিভাগে অনার্স সম্পন্ন করেন। তিনি শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আশ শু'আইবি, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মানসুর, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল হুসাইন প্রমুখের ছাত্র ছিলেন।

[৭৬] তুর্কি আল হামাদের জন্ম ১৯৫২ সালে জর্দানের কারাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অভ সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পিএইচডি করে। পেশায় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা নাস্তিকতা, যৌন উত্তেজনাপূর্ণ। আল কারাদিব উপন্যাস প্রকাশ পেলে শাইখ আলী আল খুদাইর তাকে মুরতাদ ঘোষণা দেন। ধর্ম সম্পর্কে কটাক্ষ করার অভিযোগে তাকে ২০১২ সালের ২৪ ডিসেম্বর আটক করা হয়, এরপর ২০১৩ সালেই ছেড়ে দেয়া হয়। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এখানে ২০১২-১৩ সালের ঘটনার কথাই বলছেন। শাইখের লেকচার সে সময়ে দেয়া। বর্তমানে তুর্কি আল হামাদ বেশ সক্রিয় এবং সৌদির সাথে ইসরাইলের লিয়াজো করার অন্যতম অনুঘটক।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

'নিঃসন্দেহে আলাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করবেন না, এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করে, নিঃসন্দেহে সে এক বিরাট পাপ করে।' [সূরা নিসা, ৪: ৪৮]

সূরা নিসারই আরেকটি আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

'আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করল, সে মূলত চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেল।' [সূরা নিসা, ৪: ১১৬]

যদি কেউ মৃত্যুর আগে কুফর বা শিরক ত্যাগ না করে, তাওবা না করে এবং ওই অবস্থাতেই মারা যায়, তাহলে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ

'...মূলত যে কেউই আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম...'। [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৭২]

আল্লাহ ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ তাঁর নবী এবং সবচেয়ে প্রিয় আদমসন্তান রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সতর্ক করে বলেছেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

'অথচ (হে নবী) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও–যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে–এ মর্মে ওয়াহি পাঠানো হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে (অন্যদের) শরীক করো, তাহলে অবশ্যই তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হবে।' [সূরা

যুমার, ৩৯: ৬৫]

আল্লাহ এখানে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিচ্ছেন, হে মুহাম্মাদ, যদি তুমিও শিরক করো, তবে তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দেখুন বিষয়টি কত স্পষ্ট, কত পরিষ্কার। তবু অনেক মূর্খ একে বিভ্রান্তির উপলক্ষ্য বানায়। অনেকে এই বিষয়ে আপস করে, ছাড় দেয়। আবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞতায় ভোগে অনেকে। মনে রাখবেন, যদি কোনো অ-মুসলিম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' গ্রহণ করা ছাড়া, বিশ্বাস করা ছাড়া, ঘোষণা করা ছাড়া মারা যায়, তাহলে সে কাফির। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

ইবনু মাসউদ (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

'যে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে; আর যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে।'[৭৭]

এটিই তাওহিদ। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এটি সুস্পষ্ট। আনাস (ﷺ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يقولُ اللَّهُ تَعالَى لأَهْوَنِ أهْلِ النَّارِ عَذابًا يَومَ القِيامَةِ: لو أنَّ لكَ ما في الأرْضِ مِن شيءٍ أكُنْتَ تَفْتَدِي بهِ؟ فيَقولُ: نَعَمْ، فيَقولُ: أرَدْتُ مِنْكَ أهْوَنَ مِن هذا، وأَنْتَ في صُلْبِ آدَمَ: أنْ لا تُشْرِكَ بي شيئًا، فأبَيْتَ إلَّا أنْ تُشْرِكَ بي.

'জাহান্নামে সর্বনিম্ন আযাব পাওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন, 'দুনিয়ায় যা কিছু আছে যদি তোমার সে পরিমাণ সম্পদ থাকত, তাহলে কি তুমি তা (আজ) মুক্তিপণ হিসেবে দিতে?' সে বলবে, 'হ্যাঁ।'

আল্লাহ (ﷻ) তখন বলবেন, 'তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে তখন এর চাইতেও অনেক কম জিনিস আমি তোমার কাছ থেকে চেয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছ এবং আমার সাথে শিরক করেছ।"

এই হাদীসটি আছে সহীহ আল-বুখারীতে।[৭৮]

---

[৭৭] মুসনাদু আহমাদ : ১/২৩০, এই সনদটি মুদরাজ। অন্যদিকে জাবির (ﷺ) থেকে হুবহু একই কথা সহীহ সনদে পাওয়া যায়।-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৩; ইমাম ইবনু খুযাইমাহ (رحمه الله), আত তাওহিদ : ২/৮৫৫; ইমাম ইবনু মান্দাহ (رحمه الله), আল ঈমান, হাদীস নং : ৪৬

[৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৫৫৭

ইন্টারফেইথ[৭৯] বা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ড এই স্পষ্ট বিষয়টিকে মুছে দিতে চায়। কিংবা ঘোলাটে করতে চায়। এটা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং কর্মকাণ্ডের বিপজ্জনক দিকগুলোর অন্যতম। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মানে শুধু গির্জা কিংবা সিনাগগে যাওয়া, গল্পগুজব করা, আর হাসিমুখে ছবি তোলা না। এর আসল বাস্তবতা অনেক ভয়ংকর। আদতে ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ স্বতন্ত্র একটা ধর্মের মতো। এটা হলো কুফরের ওপর কুফর। অথচ একে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, মুসলিম যুবকরা বুঝতেই পারে না কখন ইন্টারফেইথের মাধ্যমে তারা তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিমদেরকে একেবারে ইসলাম থেকে বের করে আনা কষ্টসাধ্য, তাই আল্লাহর দুশমনরা উম্মাহর মাঝে ইন্টারফেইথের এই বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মুসলিমরা নিজেদের মুসলিম বলুক সমস্যা নেই, কিন্তু তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের বদলে ইন্টারফেইথ ইসলাম দাও। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ইসলাম দাও। তাহলে ওরা নিজেদের মুসলিম দাবি করবে ঠিকই, কিন্তু ওদের ভেতরে ইসলামের কিছুই থাকবে না।

কোনো খ্রিষ্টানকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে আপনাকে নির্দ্বিধায় বলবে, কেউ যদি ঈসা (ﷺ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার না করে, তাহলে সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবেন। খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা সত্যবাদী তারা সরাসরি এ কথা বলবে। বাইবেলে স্পষ্ট বলা আছে, ঈসা (ﷺ) ছিলেন ত্রাণকর্তা এবং কেবল তাঁর মাধ্যমেই আখিরাতের মুক্তি সম্ভব—এ কথা কেউ অবিশ্বাস করলে সে জাহান্নামী।[৮০] বাইবেলে যা লেখা আছে সেটা স্পষ্টভাবে বলতে খ্রিষ্টানরা লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু কুরআনে যা বলা আছে সেটা বিশ্বাস করতে আজ কিছু মানুষের লজ্জা লাগে! আবার তারা নিজেদের মুসলিমও দাবি করে!

---

[৭৯] ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এ-জাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও আদতে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো : 'সকল ধর্ম সমান', 'সকল ধর্ম সঠিক', 'সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়', 'সকল ধর্ম এক' এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক। বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত 'এক ধর্ম, এক বিশ্ব' এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। আলিমদের মতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হলো মূলত রিদ্দার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন : https://islamqa.info/en/10213 এবং লাজনাহ আদ দাইমাহর ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০

[৮০] জন ৩:৩৬ বলছে Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them.

'যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে।' [ইংরেজি: New International Version; বঙ্গানুবাদ: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির পবিত্র বাইবেল]

শিয়াদের মৌলিক একটি আকীদাহ হলো, কেউ যদি তাদের বারো ইমামের ওপর ঈমান না আনে, তাহলে সে কাফির। ওই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বই, হাক্কুল ইয়াক্বিন ফি মা'রিফাতি উসুলিদ্দীন[৮১]। এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে,

اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة و جحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر مستحق للخلود في النار

'সকল ইমামিয়া একমত, যে ব্যক্তি (বারো ইমামের) কোনো একজন ইমামের ইমামতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যেসকল আমলকে ফরয করেছেন তা অস্বীকার করবে, সে কাফির—চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।'[৮২]

এটা হলো তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর একটির বক্তব্য।

বারো ইমামের হক্ক আদায় বলতে তারা কী বোঝায়? শিয়াদের আকীদাহর ব্যাপারে যারা ধারণা রাখেন তারা জানেন, তাদের বারো ইমামের ওপর শিয়ারা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এবং হক্ক আরোপ করে, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন: তারা বিশ্বাস করে তাদের ইমামদের গ্বাইবের জ্ঞান আছে। অথচ ইলমুল গ্বাইব বা গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহর। আপনি যদি বিশ্বাস করেন গ্বাইবের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে, তাহলে শিয়াদের মতে আপনি কাফির। তাদের মতে, মুসলিম হতে হলে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, ইমামদের গ্বাইবের জ্ঞান আছে। এ ছাড়া তারা মনে করে বারো ইমাম মাসুম বা নিষ্পাপ।

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর কী অবস্থা? আজ পথভ্রষ্ট, দ্বীন বিক্রি করা বিভ্রান্ত, পরাজিত মানসিকতার এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদের আহলুস সুন্নাহ দাবি করে আর বলে, 'কিছু মানুষ হলো মুমিন। কিছু মানুষ হলো কাফির। আর এর বাইরে তৃতীয় আরেকদল মানুষ আছে।'

অথবা তারা বলে, 'কুরআনে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরাও জান্নাতে যাবে।' আজ দেখবেন অনেক প্রফেসর, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার...সমাজের অভিজাত, শিক্ষিত হবার দাবিদার লোকেরা এ রকম দাবি করে। আফসোসের বিষয় হলো, এ ধরনের কথা অনেক আলিম নামধারীর কাছ থেকেও আজ শোনা যায়।

আমরা স্পষ্টভাবে বলি, তাওহিদ ও রিসালাতকে গ্রহণ না করে যে মারা যাবে,

---

[৮১] বইটির লেখক ইরাকের প্রখ্যাত শিয়া আলিম সায়্যিদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ রিদ্বা আলু শুব্বার, তাঁর জন্ম ১১৮৮ হিজরিতে, মৃত্যু ১২৪২ হিজরিতে। বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। বাইরুতের মুওয়াসসাসাতুল আলামী লিল মাতবু'আহ এটি ১৯৯৭ সালে ছেপেছে। এতে দুখণ্ডই একত্রে ছাপা হয়েছে।

[৮২] হাক্কুল ইয়াক্বিন ফি মা'রিফাতি উসুলিদ্দীন, পৃষ্ঠা : ৫১২

আখিরাতে তার আবাসস্থল হলো জাহান্নাম। মডার্নিস্ট আর আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ফেরিওয়ালাদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হবেন না। তাদের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। নিজেদের গোমরাহিকে জায়েজ করার জন্য তারা কুরআনের আয়াতের অর্থকে বিকৃত করে। তারা বলে, কুরআনের কিছু আয়াতে বলা হয়েছে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং সাবাঈরা সবাই জান্নাতে যাবে।

হ্যাঁ, আমরাও বলি যে কিছু ইহুদী এবং খ্রিষ্টান জান্নাতে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা কুরআনেই বলা হয়েছে। আর আল্লাহর কালাম নিয়ে কে প্রশ্ন তুলবে? কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন ইহুদীরা জান্নাতে যাবে? কোন খ্রিষ্টানরা জান্নাতে যাবে?

যেসব ইহুদী মুসা (عليه السلام)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, পালন করেছিল–তাঁরা জান্নাতে যাবে। যেসব খ্রিষ্টান ঈসা (عليه السلام)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করেছিল, কুফর ও শিরক থেকে বিরত ছিল–তাঁরা জান্নাতে যাবে। আর আমরা তাঁদের সবাইকে মুসলিমই বলি। কারণ, তাঁরা মুসা (عليه السلام) এবং ঈসা (عليه السلام)-এর শিক্ষার অনুসরণ করেছিল। যারা মূসা (عليه السلام) এবং ঈসা (عليه السلام)-এর প্রকৃত অনুসারী ছিলেন, তাঁদের কথায় ঈমান এনেছিলেন–তাঁদের তো আমরা মুসলিমই বলি। আর এই মানুষগুলোই হবেন জান্নাতী।

আজকের কোনো ইহুদী কিংবা খ্রিষ্টান যদি সত্যিকার অর্থে মুসা (عليه السلام) ও ঈসা (عليه السلام)-এর শিক্ষা মেনে চলে, তাঁদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাব মেনে চলে, তাহলে তারা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণ করবে। যদি মুসা কিংবা ঈসা আজ দুনিয়াতে থাকতেন–আলাইহিমুস সালাম–তাহলে তাঁরাও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষা এবং তাঁর আনীত শরীয়াহ অনুসরণ করতেন।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হলে তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করবেন। প্রত্যেক রাসূল মহান আল্লাহর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ জানতেন তিনি মুসা, ঈসা, ইয়াহইয়া, ইসমাঈল, ইসহাকের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠাবেন না। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। তবু তিনি তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্মানিত করার জন্য।

আল্লাহ (عز وجل) বলছেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

> 'মনে করে দেখুন, আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে কিতাব ও তার ব্যবহারিক জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম। অতঃপর তোমাদের কাছে যখন আমার কোনো রাসূল আসবে (মুহাম্মাদ ﷺ), যে তোমাদের কাছে রক্ষিত আগের কিতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ কথার ওপর এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে এ অঙ্গীকারে সাক্ষী হয়ে রইলাম।' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮১]

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর নবী-রাসূলদের স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন, যদি তোমাদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠানো হয়, তাহলে তোমাদের সবাইকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে। তারপর আল্লাহ (ﷻ) নবী-রাসূলদের কাছে জানতে চাইছেন, 'তোমরা কি এ কথার ওপর এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছ?'

তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমরা মেনে নিলাম।'

এভাবে নবী-রাসূলগণ (عليهم السلام) তাঁদের নবুওয়্যাতের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

ঈসা (عليه السلام) যখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনীত শরীয়াহ অনুসরণ করবেন। ঈসা (عليه السلام) যখন ফিরে আসবেন তখন মুসলিম উম্মাহর একজন আমীর থাকবেন। তিনি হবেন একজন সাধারণ মানুষ এবং নেতা–কোনো নবী নন। ঈসা (عليه السلام) যখন এসে পৌঁছাবেন তখন মুসলিমরা থাকবে সালাত আদায় করার অবস্থায়। ঈসা (عليه السلام)-কে দেখার পর মুসলিমদের আমীর তাঁকে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করবেন। কিন্তু ঈসা (عليه السلام) ইমামতি করবেন না; বরং মুসলিমদের আমীরের পেছনে সালাত আদায় করবেন। এই হাদীস সহীহ।[৮৩] এই হাদীস নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনুল জাওযি (رحمه الله) বলেছেন,

'যদি ঈসা (عليه السلام) ইমামতি করতেন, তাহলে জটিলতা সৃষ্টি হতো। লোকে প্রশ্ন করত,

---

[৮৩] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فينزل عيسى ابن مريم – صلى الله عليه وسلم – فيقول أميرهم : تعال صل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة 'আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামাত পর্যন্ত হক্বের পথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ (ক্বিতাল) করতে থাকবে। এরপর ঈসা বিন মারইয়াম (عليه السلام) অবতরণ করবেন। তখন (মুসলিমদের) আমীর তাঁকে বলবেন, এগিয়ে আসুন, আপনি আমাদের সালাত পড়ান। তিনি বলবেন, না, তোমরা একে অন্যের আমীর। আল্লাহ এই উম্মতকে এই সম্মান দিয়েছেন।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৫৬

তিনি কি প্রতিনিধি হিসেবে এগিয়েছেন নাকি নতুন শরীয়াহর প্রবর্তক হিসেবে? তিনি মুক্তাদী হবেন যেন সন্দেহের ধুলায় কলুষিত না হন।'[৮৪]

ইসলাম কোনো পুরোনো আসবাব না যা বছর বছর মেরামত করতে হবে। যার ২০২০ সংস্করণ বের করতে হবে। ইসলামের নানান রূপ নেই। ইসলাম একটিই, যা ১৪০০ বছর আগে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিয়ে এসেছিলেন, শিখিয়েছিলেন, পালন করেছিলেন। এটিই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। একমাত্র ধর্ম। একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এর কোনো সংস্কার, কোনো ঘষামাজার দরকার নেই।

আজ কিছু কিছু মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর চেয়ে বেশি দয়ালু দাবি করতে চায়। দয়ার নামে তারা অদ্ভুত সব যুক্তি আনে। তারা বলতে চায় কাফির-মুশরিকরাও জান্নাতে যেতে পারে।

যেমন তারা বলে, কেউ অনেক হাসপাতাল তৈরি করেছে। লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি অসহায়, এতিম বাচ্চার দেখাশোনা করেছে। যুদ্ধের সময় পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন সরিয়েছে। অসংখ্য দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করেছে। সে সারা জীবন মানুষের ভালো করেছে, কখনো কাউকে আঘাত করেনি। কারও ক্ষতি করেনি। কিন্তু সে আল্লাহ ও তাঁর নবী (ﷺ)-এর ওপর ঈমান আনেনি। সে মারা গেছে কাফির কিংবা মুশরিক হিসেবে। এমন একজন মানুষ কি এতসব ভালো কাজের পরও জাহান্নামে যাবে? শুধু কাফির কিংবা মুশরিক হবার কারণে তার সব ভালো কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে?

এটা হলো তাদের কথা।

আমরা স্পষ্টভাবে বলি, হ্যাঁ, এমন সব লোক জাহান্নামে যাবে। যে তাওহিদ ও রিসালাত গ্রহণ করবে না–সে যা-ই করুক না কেন–আখিরাতে তার স্থান হবে জাহান্নামে।

যারা দয়ার নামে কাফির ও মুশরিকদের জান্নাতী বানাতে চায় তারা আসলে মনে করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে তারা বেশি বোঝে। তারা মনে করে তারা আর-রাহমান, আর-রাহীমের চেয়ে বেশি দয়ালু। আল্লাহ তাঁর দয়ার মাত্র ১ ভাগ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। বাকি ৯৯ ভাগ রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। এই এক ভাগ দয়ার কারণেই মা সন্তানকে ভালোবাসে, স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, ভাই ভালোবাসে ভাইকে। জগতের সকল ভালোবাসা আর দয়া আল্লাহর মোট দয়ার মাত্র একভাগ।[৮৫] আর এই একভাগ দয়ার খুব সামান্য একটু অংশ পেয়ে আল্লাহর এই

[৮৪] উস্তাদ ড. মূসা শাহীন লাশীন, ফাতহুল মুনঈম শরহু সহীহ মুসলিম : ১/৫০৩

[৮৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ দয়াকে এক শ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর ৯৯ ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন আর দুনিয়ায় এক ভাগ নাযিল করেছেন। এই এক ভাগ থেকেই সৃষ্টিকুল পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের ওপর খুর তুলে ধরে, যেন সে আঘাত

নাদান সৃষ্টি মনে করে তাদের দয়া আল্লাহর চেয়ে বেশি! কতবড় ধৃষ্টতা!

কিছু মানুষ এ ধরনের কথা বলে কাফিরদের সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্য। কাফিরদের সামনে নিজেদের মানবিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য। জাতে ওঠার জন্য। এসব কথা বললে আজ খুব সহজে জনপ্রিয় হওয়া যায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। দ্বীন বেচে দিন কাটানো এই লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে আল্লাহর শত্রুদের কাছ থেকে 'মডারেট' হবার সার্টিফিকেট পায়। এরা মডারেট হবার সার্টিফিকেট কেনে দ্বীন বিক্রি করে। ইসলামের শত্রুরা তখন বলে, হ্যাঁ অমুক ব্যক্তি একজন ভালো মুসলিম। সে একজন মডারেট মুসলিম।

এই ধরনের লোকেরা খুব সহজে অনেক অনুসারীও জুটিয়ে ফেলতে পারে। অসংখ্য জাহেল, মূর্খ লোক এদের অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমার ওপর খুশি হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।' [সূরা বাকারাহ, ২: ১২০]

অনেকে এই আয়াতের অর্থ ভুল বোঝে। তারা মনে করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিল্লাতের অনুসরণ করার মানে হলো রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করে বলা, 'আমি একজন ইহুদী, আমি একজন খ্রিষ্টান!'

এই আয়াতের অর্থ, চিৎকার করে নিজেকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু কিংবা নাস্তিক ঘোষণা করা, অথবা এমন কথা বলে প্রবন্ধ লেখার মধ্যে সীমিত না। কাফিররা যে শুধু এসবেই সন্তুষ্ট হয়, তা না। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অংশ হয়ে যেসব কুফর উচ্চারণ করতে হয়, যেসব কুফরের স্বীকৃতি দিতে হয়–সেগুলোও তাদেরকে সন্তুষ্ট করে। কারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান্নামী হবে সেটা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর ফয়সালাকে বাদ দিয়ে সেখানে নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর বক্তব্যের বদলে নিজের মতকে প্রচার করার কাজও এই আয়াতের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কাজও কাফিরদের সন্তুষ্ট করে।

সুতরাং সাধারণ মূলনীতি হলো, যদি কেউ কুফর এবং শিরকের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম। কেউ কেউ এখানে সূরা ইসরার ১৫ নং আয়াত উল্লেখ করে জল ঘোলা করার চেষ্টা করে। এ আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

---

না পায়।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৫২

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

'আর রাসূল পাঠানোর আগে আমি কোনো জাতিকে আযাব দিই না।' [সূরা আল ইসরা, ১৭: ১৫]

সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ (ﷻ) কোনো জাতিকে আযাবের মুখোমুখি দাঁড় করান না। এটি সত্য, তবে এটি আমাদের এখানকার আলোচনার মূল বিষয় নয়। ইবনু কাসির (رحمه الله) তাঁর তাফসীর ইবনু কাসিরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন।

তবে সতর্কবার্তা তাদের কাছে পৌঁছেনি এই দাবি কারা করতে পারে, কাদের কাছ থেকে এই দাবি এলে তা গ্রহণযোগ্য হবে—সেটা আমাদের ভাবা দরকার। অ্যামাযন জঙ্গলের গভীরে, অন্ধকার কোনো এক প্রান্তে থাকা গোত্রের লোকেরা হয়তো এ কথা বলতে পারে। কোনো দুর্গম পাহাড়ের ভেতরে গুহায় বসবাস করা, বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো গোত্র হয়তো এমন দাবি করতে পারে। কিন্তু আজকে গুগলের যুগে, স্যাটেলাইট টিভি আর ইন্টারনেটের যুগে, সব তথ্য যার হাতের নাগালে আছে, সে যদি দাবি করে ইসলামের দাওয়াহ তার কাছে পৌঁছেনি—তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য না।

ইমাম আহমাদ (رحمه الله) বলেছিলেন,

لا أعرف اليوم أحدًا يدعى

'আজকের দুনিয়ায় এমন কোনো ব্যক্তির কথা আমার জানা নেই যাকে দাওয়াহ দিতে হবে।'[৮৬]

ইমাম আহমাদ কত শত বছর আগে এ কথা বলেছিলেন চিন্তা করুন! তাহলে আজকের 'গ্লোবাল ভিলেজের' যুগে কেউ এমন অজুহাত দিলে তার যৌক্তিকতা কতটুকু?

কিছু লোক আছে যারা এখানে আপত্তি করতে চাইবে। তারা বলবে, আপনারা যেটা বলছেন সেটা ভুল। আজকের দুনিয়ায় সবাই হয়তো ইসলামের কথা শুনেছে, কিন্তু তাদের কাছে প্রকৃত ইসলাম পৌঁছায়নি। তাদের কাছে ইসলামের একটা বিকৃত ছবি পৌঁছেছে। ইসলামের মাহাত্ম্য, ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার সুযোগ তারা পায়নি। বরং মিডিয়ার অপপ্রচার আর বিকৃতির কারণে অধিকাংশ লোকই ইসলাম সম্পর্কে মারাত্মক ভুল ধারণা পেয়েছে। অপপ্রচারের কারণে তারা ইসলামকে বর্বরদের ধর্ম মনে করে। মুসলিম মানেই যেন সন্ত্রাসী।

তাদের এ দাবির যৌক্তিকতা যাচাই করা যাক। আসুন ১৪০০ বছর পেছনে ফিরে যাই।

---

[৮৬] মাসাইলুল কাওসাজ, মাস'আলা : ২৭৫২; আল জামি লি-উলুমিল ইমাম আহমাদ : ৮/৪০৭

মক্কা। ইসলাম দাওয়াহ মাত্র ছড়াতে শুরু করেছে। তাওহিদের দাওয়াহকে অঙ্কুরে নষ্ট করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে মক্কার কুরাইশ মুশরিকরা। সমগ্র আরবের সামনে ইসলামকে বিকৃত করে তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। শুধু তাই না, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারেও কুৎসা রটাচ্ছে।

এতকিছুর পরও, আপনি কি এমন কোনো হাদীস শুনেছেন যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অমুক ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে কারণ সে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি কখনো বলেছেন, কুরাইশ ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা রটাচ্ছিল, আর অমুক ব্যক্তি সেই বিকৃত রটনাই শুনেছিল। প্রকৃত ইসলামের খোঁজ সে পায়নি। তাই ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে সে জাহান্নাম থেকে মাফ পাবে। এটি তার জন্য গ্রহণযোগ্য ওজর।

এমন কোনো হাদীস শুনেছেন?

না শুনেননি। যারা কুরাইশের প্রোপাগ্যান্ডা শুনে প্রভাবিত হয়েছিল তাদের জন্য এ অজুহাত কাজে লাগেনি। তাহলে আজকে মিডিয়ার প্রোপাগ্যান্ডা শুনে যারা ইসলাম থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য কেন এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে? কীভাবে ইসলাম বিকৃতির খোঁড়া অজুহাত দিয়ে তাহলে আপনি কাফির-মুশরিকদের পক্ষে সাফাই গাচ্ছেন?

মুমিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াহ পৌঁছে দেয়া। আর কাফিরদের দায়িত্ব হলো সত্য দ্বীনের সন্ধান করা। সত্যের খোঁজ করা। তাদের এই দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বের চেয়েও অনেক বড়। শরীরে শক্তি বা পুষ্টি জোগান দেবার জন্য তারা যেমন খাদ্যের সন্ধান করে, তেমনি আত্মার পুষ্টির জন্য, আত্মার খোরাকির জন্য তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সন্ধান করতে হবে। খাবার পানি ছাড়া জনশূন্য, পরিত্যক্ত কোনো বাড়িতে কাউকে একা ফেলে রেখে এলে সে কী করবে? বাড়ির মধ্যে পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশ করবে? কখন তার মুখে কেউ খাবার তুলে দেবে, তার জন্য অপেক্ষা করবে? নাকি সে খাবার আর পানির জন্য আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজবে?

যেভাবে দেহের খোরাকি খুঁজতে হয়, সেভাবে আত্মার খোরাকিও খুঁজতে হয়। যেভাবে দুনিয়ার জন্য জীবিকা সন্ধান করা হয়, তেমনিভাবে আখিরাতের রাস্তাও বেছে নিতে হয়। ইসলামের খোঁজ করা প্রত্যেকের ওপর আবশ্যিক।

গুনাহগার মুসলিম

যারা জাহান্নামে যাবে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণি হলো গুনাহগার মুসলিম।

মুসলিম কাদের বলা হবে, মুসলিমের সংজ্ঞা কী, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ কাদের কাদের মুসলিম বলেছে তা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। সে আলোচনাটি দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।[৮৭]

গুনাহগার কোনো মুসলিম যদি সত্যিকার অর্থে গুনাহ থেকে তাওবাহ করে এবং এমন অবস্থায় আল্লাহর মুখোমুখি হয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি আর রাহমানুর রাহীম, গাফুরুর রাহীম। তিনি শুধু ক্ষমাই করেন না, বরং যারা তাওবাহ করে তিনি তাঁদের ভালোও বাসেন। তিনি তাওবাহকারীদের ভালোবাসেন এবং তাদের আমলনামার সব পাপ মুছে তা নেকী দিয়ে পূর্ণ করে দেন।

যদি কোনো গুনাহগার মুসলিম মৃত্যুর আগে তাওবাহ না করে, তাহলে কী হবে? সে মুসলিম। সে তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। সে কুফর ও শিরক আকবর করেনি। কিন্তু সে গুনাহ করেছে। তার কিছু গুনাহ হয়তো কবীরা গুনাহ ছিল, আর কিছু হয়তো অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর গুনাহ।

এমন ব্যক্তির আমলের হিসাব হবে। মিযানে তার নেক আমল ও গুনাহর ওজন করা হবে। যদি তার নেক আমলের ওজন গুনাহর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু তাঁর গুনাহ যদি নেক আমলের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে কী হবে?

আমাদের এই আলোচনা এমন মুসলিমদের নিয়েই।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٢ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣
>
> 'সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।' [সূরা আল-মুমিনুন, ২৩: ১০২-১০৩]

তিনি আরও বলেছেন,

> وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ
>
> 'আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেইসব লোক, যারা নিজেদের ধ্বংস

---

[৮৭] দারস ১ দ্রষ্টব্য

ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াত) প্রত্যাখ্যান করত।' [সূরা আল-আরাফ, ৭: ৯]

এবং তিনি বলেছেন,

﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾

'অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে এক চিরসুখের জীবন। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়াহ (জাহান্নাম)।' [সূরা আল ক্বরিয়াহ, ১০১: ৬-৯]

কুরআনে এমন বহু আয়াত আছে, যেখানে মুসলিম বান্দার পাপ-পুণ্যের পরিমাণ কমবেশি হলে তার শেষ গন্তব্য কী হবে, আল্লাহ (ﷻ) তা পরিষ্কার জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله)-এর ফতোয়াসমগ্রের দশম খণ্ডে। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন ইনশা আল্লাহ।

যদি আপনার পুণ্যের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে আপনি জান্নাতী হবার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আর যদি কবীরা ও সগীরা গুনাহর পরিমাণ পুণ্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে শরীয়াহর পরিভাষায় আপনি হবেন এমন একজন, যাদের বলা হয় 'মাশীআহ' (مشيئة)। তাদের পরিণতি নির্ভর করবে মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। অবশ্য সবকিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তবে এখানে আলাদা করে বলার অর্থ হলো, এমন মানুষদের আল্লাহ চাইলে মাফও করে দিতে পারেন আবার মাফ না করে জাহান্নামেও পাঠাতে পারেন। এটাই হলো 'মাশীআহ' এর অর্থ।

এমন লোকেরা আল্লাহর ক্ষমা পেতে পারে, কিংবা শাস্তি পেতে পারে। আল্লাহর শাফা'আত পেতে পারেন, অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলদের শাফা'আত পেতে পারেন। রাসূলগণকে শাফা'আত দেয়া হয়েছে।[৮৮] এমনকি কুরআনুল কারীমও কারও পক্ষে শাফা'আত করতে পারে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সূরা বাক্বারাহ এবং সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করত, শেষ বিচারের দিন এই দুইটি সূরা তার পক্ষে শাফা'আত করার জন্য বিশাল মেঘের মতো হাজির হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে এই দুটি সূরা পাখির মতো কলরব করতে করতে তাদের পাঠকারীদের পক্ষে

[৮৮] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'নিশ্চয় কিয়ামাতের দিন আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য আমার শাফা'আত থাকবে।'-সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ৩৪৯৮, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله)-এর মতে সহীহ।

হাজির হবে।[৮৯]

তাহলে কার কার তরফ থেকে শাফা'আত পাওয়া যাবে বিচারের দিনে? অবশ্যই আল্লাহ (ﷻ) শাফা'আত দেবেন। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং কিছু পুণ্যবান মুমিন বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় শাফা'আত করবেন। ফেরেশতাগণ, শহীদগণ এবং কিছু সাধারণ নেককার মুসলিম শাফা'আত করবেন। এ ছাড়া শিশুরা তাদের পিতামাতার জন্যে শাফা'আত করবে। সাওম, হাজারে আসওয়াদ পাথর শাফা'আত করবে। শাফা'আত করবেন আরাফার ময়দানে হাজির হওয়া ব্যক্তিরা। এর সবগুলোই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।[৯০]

---

[৮৯] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা আয যাহরাওয়াইন অর্থাৎ সূরা বাকারাহ ও আলে ইমরান পড়ো। কেননা, এ দুটি সূরা কিয়ামাতের দিন দুটি মেঘ বা দুটি ছায়ার মতো হয়ে আসবে; কিংবা পাখির ঝাঁকের দুটি সারি হয়ে আসবে এবং এদের তিলাওয়াতকারীর পক্ষে বাদানুবাদ করবে।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮০৪

[৯০] ক) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, শহীদের ছয়টি বিশেষত্ব রয়েছে। এর মাঝে একটি হচ্ছে, 'সে তার নিকটজনের মাঝে সত্তরজনের জন্য শাফা'আত করবে।'-সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ১৬৬৩, তাঁর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ গরিব।

খ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দীর্ঘ হাদিসে একপর্যায়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'ফেরেশতারা শাফা'আত করেছে, নবীগণ শাফা'আত করেছে, মুমিনরা শাফা'আত করেছেন, এখন কেবল আরহামুর রাহিমীনের ক্ষমা বাকি আছে।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৮৩

গ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'অবশ্যই নবী নয় এমন এক ব্যক্তির শাফা'আতে রাবিয়া ও মুদ্বার গোত্রের সমপরিমাণ বা কোনো একটির সমপরিমাণ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।'-মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২২২১৫; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে সহীহ।

ঘ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যেসকল মুসলিমের তিনটি সন্তান বালিগ হবার পূর্বেই মারা যায়, যখন আল্লাহ সেসব সন্তানকে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন তাদের বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের বাবা-মা না আসা পর্যন্ত প্রবেশ করব না। তাদেরকে তিনবার একই কথা বলা হবে, তারাও তিনবার একই উত্তর দেবে। এরপর তাদের বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের পিতা-মাতা একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করো।'-মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১০৬২২, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

ঙ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,'কিয়ামাতের দিন বান্দার জন্য সিয়াম ও কুরআন শাফা'আতকারী হবে। সিয়াম বলবে, হে আমার রব, আমি তাকে খাদ্য ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছিলাম, কাজেই তার জন্য আমার শাফা'আত কবুল করুন। আর কুরআন বলবে আমি তাকে রাতে ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছিলাম, কাজেই তার জন্য আমার শাফা'আত কবুল করুন। ফলে তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে।'-মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৬২৬; ইমাম আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে সনদ সহীহ, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুল্লাহ) এই সনদকে দ্বইফ বললেও অপর এক সনদকে শক্তিশালী বলেছেন যা রয়েছে ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৪/৪৩৪-৪৩৫

চ) হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন একে উত্থিত করবেন। এর দুটি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে, এর জবান থাকবে যা দ্বারা কথা বলবে। সে সেই লোকের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, যে সঠিকভাবে একে স্পর্শ করেছিল।'-সুনানুত তিরমিযি,

এতসব শাফা'আত পাবার পরও যদি কোনো ব্যক্তি রক্ষা না পায় (আমরা দু'আ করি আমাদের কারোরই যেন এমন পরিণতি না হয় এবং আমরা আশা রাখি, ইন শা আল্লাহ আমরা সবাই এই করুণ পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাব) তাহলে আল্লাহ (ﷻ) তাকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের আগুনে পুড়ে পুড়ে সে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে, তার গুনাহ মাফ হবে। তারপর একসময় আল্লাহ (ﷻ) তাঁকে জাহান্নাম থেকে তুলে চিরসুখের জান্নাতে স্থান দেবেন। নাসআলুল্লাহ সালামাহ।

যে ব্যক্তি ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর মুখোমুখি হবে

এটি একটি বিপজ্জনক শ্রেণি। ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের পরিণতি কী হবে? বড় শিরকের মতো ছোট শিরক ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। একজন মুসলিম যদি ছোট শিরক করে বসেন, তারপরেও তিনি মুসলিম থাকবেন। তার ঈমান চলে যাবে না।

ছোট শিরক বা (الشرك الأصغر) হলো এমন সবকিছু যা মানুষকে বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়। যা বড় শিরকের রাস্তা খুলে দেয়। কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছুকে শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু যেগুলো বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, সেগুলোকে ছোট শিরক গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন বিষয়কে ছোট শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। খুব স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই কাজগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেসব শিরকের আলোচনায় হাদীসে নির্দিষ্টতা বোঝাতে 'আল' যুক্ত হয়নি, সাধারণত সেগুলো ছোট শিরকের মধ্যে পড়ে। আর যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে আল যুক্ত হয়ে 'আশ-শিরক' বলা হয়েছে, সাধারণত সেখানে শিরক আকবর বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব হাদীসে শুধু শিরক বলা হয়েছে, সাধারণত সেখানে ছোট শিরকের কথা বোঝানো হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব কাজকে ছোট শিরক গণ্য করেছেন, আমরাও সেগুলোকে ছোট শিরক গণ্য করি। এ ব্যাপারে আমরা তাদের ব্যাখ্যা ও বুঝ গ্রহণ করি।

ছোট শিরকের একটি উদাহরণ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা। এর আগে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।[৯১] এ ছাড়া 'মা শা আল্লাহ ওয়া শি'তা' এর মতো বক্তব্যগুলোও ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

ما شاء الله وشئت

হাদীস নং : ৯৬১, তাঁর মতে হাসান।

[৯১] দ্রষ্টব্য : তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

অর্থাৎ এমন বলা যে, যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা..., অথবা

لولا الله وأنت

আপনি এবং আল্লাহ না থাকলে...

توكلت على الله وعليك

আমি ভরসা করছি আল্লাহর ওপর এবং আপনার ওপরও

এই ধরনের বক্তব্যগুলো ছোট শিরক। যদি কেউ বলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করছি এবং আপনার ওপর। এবং এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায়, তাহলে সেটা ছোট শিরক। অন্যদিকে কেউ যদি বলে, আমি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করি এবং আপনার ওপর। তাহলে সেটা বড় শিরক, অর্থাৎ শিরক আকবর।

এটি একটি বিপজ্জনক বিষয়। তাই এ বিষয়ে আরও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকেই তাদের ঘরের ভেতরে এমন পোস্টার, ছবি, ক্যালিগ্রাফি বা ফ্রেইম রাখেন যেখানে আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি রাখা হয়। এটা এক ধরনের ছোট শিরক।

কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম কিংবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম দেয়ালে বা অন্য কোথাও ঝোলানোর বৈধতা নিয়ে সমসাময়িক ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এমন করা জায়েজ না। এটি হারাম। এর দ্বারা কুরআনের আয়াতের বা আল্লাহর নামের অসম্মান করা হচ্ছে। কারণ, ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হলে এমন ফ্রেম বা ছবিকে অবহেলা করার আশঙ্কা থাকে। অনেকে বলেছেন, এগুলো পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে—এটিও বিবেচনা করা দরকার।

আবার কেউ কেউ বলেছেন এমন কিছু ঝোলানো মুবাহ। অর্থাৎ বৈধ। আবার কেউ বলেছেন এমন করা উত্তম।

এ ধরনের কিছু ঝোলানো যাবে কি না, এটা একটা ফিকহি প্রশ্ন। এ প্রশ্নে কে কোন মত গ্রহণ করছে সেটা তার অবস্থানকে প্রভাবিত করবে। আমার মতে, যারা হারাম মনে করেন তাদের দলিল অতটা শক্ত না। কেউ হয়তো বলতে পারেন, আপনি বলছেন দলিল শক্ত নয়, কিন্তু অমুক অমুক আলিমরা তো একে হারাম বলেছেন। উত্তরে আমি তাঁদের সমতুল্য এমন আলিমদের কথা দেখাতে পারব, যারা এটার অনুমতি দিয়েছেন; কোনো আপত্তি করেননি।

আমি বলি, কুরআনের আয়াত বা হাদীস দেয়ালে টাঙিয়ে কেউ যদি রিমাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে ইন শা আল্লাহ তা উত্তম। হারাম না।

তাহলে এমন করা উত্তম হলে কেন এখানে আমি এ নিয়ে আলোচনা করছি? আমরা

আসলে আল্লাহ (ﷻ)-এর নাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি, একই সাথে উল্লেখ করার ব্যাপারে ফোকাস করতে চাই।

আজকাল আপনি এমন অনেক ছবি, ফ্রেমের ডিজাইন, কফির মগ, ঘড়ি ইত্যাদি দেখবেন যেখানে আল্লাহ (ﷻ) এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি লেখা। এটি এক ধরনের ছোট শিরক। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় মানুষের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ (ﷻ) এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) একই ধরনের মর্যাদার অধিকারী!

আল্লাহ এবং আপনার ওপর ভরসা করি,

আপনি এবং আল্লাহ না থাকলে,

আল্লাহর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা হলে...

এ ধরনের কথাগুলো বলা যেমন ছোট শিরক তেমনিভাবে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি লেখাও ছোট শিরক। তবে এক দিকে আল্লাহর নাম ও অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম লেখা যাবে। অথবা আল্লাহর নামের নিচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম লেখা যাবে। কিন্তু পাশাপাশি না, একই সাথে না, একই পর্যায়ে না।

একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলল,

ما شاء اللهُ و شئتَ

যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা...

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিবাদ করে বললেন,

أجعَلتَني لله نِدًّا ؟ قلْ ما شاءَ اللهُ وحدَهُ

'তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাচ্ছ? বলো, কেবল যা এক আল্লাহ চেয়েছেন...।'[৯২]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لا تقولوا: ما شاءَ اللهُ وشاء فلانٌ، ولكن قولوا: ما شاءَ اللهُ، ثمَّ شاءَ فلانٌ

'তোমরা কখনো বলবে না যে, যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং অমুক চেয়েছে; বরং তোমরা বলবে, যা আল্লাহ চেয়েছেন, অতঃপর অমুক চেয়েছে।'[৯৩]

এখানে ওয়াও (و) হলো মুসাওয়াহ (مساواة)। মুসাওয়াহ অর্থ সমতুল্য। অর্থাৎ এখানে

---

[৯২] ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.), যাদুল মা'আদ : ২/৪২৯, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহ.)-এর মতে সনদ সহীহ।

[৯৩] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৯৮০; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহ.)-এর মতে সহীহ।

'ওয়াও' এর দ্বারা সমান বোঝানো হচ্ছে এবং ভাষাগতভাবে এর মাধ্যমে সমতুল্যতা বোঝানো হচ্ছে। যদি আপনি এখানে 'সুম্মা' ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা একটি তারতীব বা ক্রমধারা প্রকাশ করে। সমতুল্যতা প্রকাশ করে না। সুম্মা অর্থ : 'আর তারপর'। এর ফলে ক্রমধারা প্রকাশ করা হয়। কাজেই 'সুম্মা' ব্যবহার করে বলার অর্থ, যা আল্লাহর ইচ্ছা আর তারপর আপনার ইচ্ছা (যদি তা উক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়)।

ইমাম বুখারী (ﷺ) বুখারী শরীফের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب لا يقال: ما شاء الله و شئت

অর্থাৎ 'আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং তুমি যা চাও এটা বলা যাবে না' বিষয়ক অধ্যায়।

ইমাম বুখারী (ﷺ) কত প্রজ্ঞার সাথে অধ্যায়গুলোর শিরোনাম ঠিক করতেন তা নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, মনে আছে?[৯৪] ইমাম বুখারী শিরোনামের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রকাশ করতেন। তাঁর বাছাই করা শিরোনামগুলোর মধ্যে অনেক ইলম লুকিয়ে আছে। 'মা শা আল্লাহ ওয়া শি'তা–যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা' এই ধরনের কথা কেন বলা যাবে না তা নিয়ে ইমাম বুখারী একটি আলাদা অধ্যায় করেছেন।

ছোট শিরকের আরেকটি উদাহরণ হলো রিয়া। যেমন: মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদাত করা। অন্যকে দেখানোর জন্য সুন্দর করে দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত আদায় করা। অন্যকে শোনানোর জন্য সালাতে নিজের তিলাওয়াতকে সুন্দর করা। এগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

যারা ছোট শিরক করে তারা কী মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে?

ছোট শিরক করা ব্যক্তি কি মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে?

আসলে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। উত্তর যেন সহজে বোঝা যায় সেজন্য এতক্ষণ আমরা বেসিক আলোচনাটা দেখলাম। এখন প্রশ্ন হলো, গুনাহগার মুসলিমরা যেভাবে মাশীআহ হিসেবে বিবেচিত হবে সেভাবে ছোট শিরককারীরাও কি মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে? যেসব লোকেরা ছোট শিরকের গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তাদের পরিণতি কী হবে?

ধাপে ধাপে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিষয়টি একটু জটিল তাই ভালোভাবে লক্ষ করুন।

---

[৯৪] তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, দারস ১৪ দ্রষ্টব্য।

আমরা কাদের মাশীআহ বলেছিলাম আরও একবার মনে করিয়ে দিই। হাশরের ময়দানে কোনো মুসলিমের আমল হিসেব-নিকেশ করার পর যদি দেখা যায় তার গুনাহর চেয়ে নেক আমল অনেক বেশি, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু যদি গুনাহর পরিমাণ নেক আমলের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে 'মাশীআহ' গণ্য করা হবে। হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের আগুনে পুড়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে তারপর জান্নাতে যাবে; অথবা আল্লাহ (ﷻ) তাকে ক্ষমা করে দেবেন, অথবা কোনো শাফা'আতকারীর শাফা'আতের মাধ্যমে সে মুক্তি লাভ করবে, ইনশা আল্লাহ।

এখন আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। যেসব মুসলিম ছোট শিরক করে তারা কি মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত?

ইজমা হলো, যেসব মুসলিম ছোট শিরক করে তারা কাফির না; মুসলিম। একই ভাবে এটাও ইজমা যে, ছোট শিরকের কারণে যে মুসলিম জাহান্নামে যাবে, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না–গুনাহ মাফ হয়ে গেলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যাহ (ﷺ)-এর বইগুলো পড়লে আপনি দেখতে পাবেন, তিনি কিছু জায়গায় বলেছেন, ছোট শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। ছোট শিরককারী মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাকে শাস্তি পেতেই হবে।[৯৫] অবশ্যই, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ চাইলেই যে কাউকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের তাঁর কিছু ফয়সালার ব্যাপারে ইতিমধ্যে সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন: তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যারা শিরক করবে তাদের শাস্তি হলো জাহান্নামের আগুন। সুতরাং ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) এবং অন্যান্য আরও আলিমদের মত হলো, ছোট শিরককারীদের অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সগীরা এবং কবীরা গুনাহকারীরা মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হলেও ছোট শিরককারীরা মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত না।

তাঁদের এই দাবির প্রধান দলিল হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। তবে এর চেয়ে ছোট গুনাহকারী যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

---

[৯৫] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে তাঁর সাথে শিরক করা। তিনি তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এর চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর এই শিরকের মাঝে বিরাট, সূক্ষ্ম, গোপন ও প্রকাশ্য সকল শিরকই অন্তর্ভুক্ত।'-জামিউর রাসাইল : ২/২৫৪

এই আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, তিনি তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না; শিরকের চেয়ে ছোট অন্যান্য যেকোনো গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) সহ অন্যান্য আলেমগণ মনে করেন, এই আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) শিরক বলতে বড় শিরক এবং ছোট শিরক দুটিকেই বুঝিয়েছেন। পার্থক্য হলো ছোট শিরককারীদের আল্লাহ (ﷻ) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামের আযাব ভোগ করাবেন তারপর জান্নাতে ঠাঁই দেবেন। কিন্তু বড় শিরককারীদের কোনো ক্ষমা নেই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন, 'তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।' সিদ্দিক খান, আবদুর রহমান ইবনু ক্বাসিম, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাবের কিছু ছাত্র ও অনুসারী উলামাও এই মত পোষণ করতেন।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফতোয়া গ্রন্থেরই আরেক জায়গায় ছোট শিরককে কবীরা গুনাহর সমতুল্য হিসেবে গণ্য করেছেন। এবং বলেছেন, ছোট শিরককারী মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (ﷻ) এদেরকে ক্ষমা করতেও পারেন আবার ক্ষমা নাও করতে পারেন। বড় শিরককারীদের ব্যাপারে আল্লাহ যেমন ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, তাদেরকে তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না, তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে, ছোট শিরককারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তেমন নয়। আল্লাহ (ﷻ) চাইলেই তাদের শাস্তি দিতে পারেন আবার চাইলেই তাদের মাফ করে দিতে পারেন।[৯৬] মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু গারীব[৯৭] (রহিমাহুল্লাহ) এ মত গ্রহণ করেছেন। তাফসির আস সা'দি অধ্যয়ন করলে মনে হবে আস-সা'দি[৯৮] (রহিমাহুল্লাহ)-ও এ মত পোষণ করতেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) যে মুসলিম ছোট শিরককারীদের যে মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন তার দলিল হিসেবেও উপস্থাপন করা হয় এই আয়াতটি,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

---

[৯৬] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আর ছোট শিরকের ব্যাপার হচ্ছে, যদি মুসলিম অবস্থায় ছোট শিরক করে মারা যায়, তাহলে তাকে এজন্য শাস্তি দেয়া হবে। আর হয়তো এরপর জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে।'-আল ইস্তিগাসা, পৃষ্ঠা : ১৪৬

[৯৭] তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আলি বিন গারীব আন নাজদী আল হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ), তিনি ইবনু গারীব নামেই প্রসিদ্ধ। জন্ম ১৭৩৭ ঈসাঈ সনে, মৃত্যু ১৭৯৪ সালে। তিনি দিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সৌদি ইমারতের (বর্তমানে ৩য় ইমারত প্রতিষ্ঠিত আছে) অন্যতম প্রধান আলিম এবং ইমামুদ দাওয়াহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাবের মেয়ের জামাই ছিলেন।

[৯৮] শাইখ আব্দুর রাহমান বিন নাসির আস-সা'দির জন্ম ১৮৮৯ সালে, মৃত্যু ১৯৫৬ সালে। তিনি উয়াইনার জামে মসজিদের খতিব ছিলেন এবং কিছুকাল সেখানকার কাযিও ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে সৌদির ১৪০ জন প্রখ্যাত আলিম রয়েছেন। এর মাঝে রয়েছেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ) ও শাইখ আব্দুল্লাহ আক্বীল। তাঁর প্রখ্যাত তাফসির হচ্ছে তাইসিরুল কারিমির রাহমান যা তাফসিরুস সা'দি নামে প্রসিদ্ধ।

তাঁরা বলেন, এই আয়াতে শিরক আকবরের কথা বলে হচ্ছে। কারণ এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ (ﷻ) মুশরিক, মুনাফিক এবং আহলে কিতাবদের কথা বলেছেন। এ ছাড়া এ আয়াতে শেষাংশ থেকে মনে হয়, সেখানে বড় শিরকের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। কাজেই এ আয়াতের বক্তব্য মূলত শিরক আকবর বা বড় শিরকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'ছোট শিরককারী মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না' এই বিষয়ের ওপর গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনাসমৃদ্ধ একটি মাস্টার্স থিসিস হয়েছিল বলে শুনেছিলাম বেশ কিছু সময় আগে। যদিও সেটা পড়ার সুযোগ হয়নি, আর সম্ভবত ওটা এখনো প্রকাশিতও হয়নি। তবে আমাদের বোঝা দরকার, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে ইবনু তাইমিয়্যাহর মতো মহান ইমামের দুটি আপাতভাবে সাংঘর্ষিক মত আছে বলে দেখা যাচ্ছে। একইভাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের ছাত্র ও অনুসারী আলিমগণের–অর্থাৎ নাজদী দাওয়াহর ইমামগণের–মধ্যেও এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। আমি দুটি মত এখানে আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। আপাতত আমরা কোনো একটি মত বাছাই করব না।

আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনারা ছোট শিরকের ভয়াবহতা বুঝতে পারছেন। আলিমদের একাংশের মতে, কেউ ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হলে, সে মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ মাফ পেয়ে যেতে পারে, অথবা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে তারপর মাফ পেতে পারে। আবার আলিমদের আরেক অংশের মতে ছোট শিরক নিয়ে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হলে কিছু সময় জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কাজেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

কিছুদিন আগে আমরা ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর একটি উক্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি (رضي الله عنه) বলেছেন,

> لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ بغيرِهِ وأنا صادِقٌ
>
> আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে সত্য কসম করার চেয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।[৯৯]

কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা ছোট শিরক। আর মিথ্যা কথা বলা হলো গুনাহ। কাজেই ছোট শিরকের চেয়ে গুনাহ অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর। কাজেই ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর এই উক্তি থেকেও মনে হয়, ছোট শিরককারী মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

---

[৯৯] ইমাম হাইসামী (رحمه الله), মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/১৪০, তাঁর মতে এর রিজাল সহীহ।

ছোট শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার দু'আ

উসুলুস সালাসাহর লেখক বলেছেন,

وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আশা করি তাঁর এ কথার তাৎপর্য আপনারা এখন বুঝতে পেরেছেন। ছোট শিরক অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়ংকর। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে শ্রোতারা খুব ভয় পেয়ে যান। ভয়ে তাদের চেহারার রং বদলে যায়, মুখে নেমে আসে অন্ধকার। ছোট শিরক কতটা ভয়ংকর এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করে আমি শেষ করব। আবু বাকর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ

'হে আবু বকর, তোমাদের মাঝে (এই উম্মতে) শিরক পিঁপড়ার হামাগুড়ি দিয়ে চলার চাইতেও গোপনীয়।'[১০০]

ঘোর অন্ধকার রাতে একটা কালো পাথরের ওপর দিয়ে যদি ছোট্ট একটা পিঁপড়ে হেঁটে যায়, তাহলে তা যেমন দেখা যাবে না, অদৃশ্য থাকবে, ঠিক তেমনিভাবে খুব গোপনে, চুপিসারে উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রবেশ করবে। এভাবে গোপনে, ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এই উম্মাহর ভেতরে শিরক প্রবেশ করবে। আর অল্প কিছু মানুষই এটা থেকে রক্ষা পাবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে এ কথা শোনার পর আবু বাকর (رضي الله عنه) ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তখন ঠিক সেই প্রশ্নটিই করেছিলেন, যে প্রশ্নটি এখন আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আবু বাকর (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,

'কীভাবে আমি এই শিরক থেকে বাঁচব, ইয়া রাসূলাল্লাহ?'

তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছোট শিরকের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার একটি দু'আ শিখিয়ে দেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ

'হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট

[১০০] ইমাম বুখারী (رحمه الله), আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং : ৭১৬, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে শিরক হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।'[১০১]

কারণ ছোট শিরক একদম চুপিসারে, খুব গোপনে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। তার আমলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ হাদীসের দুটি বর্ণনা আবু বাকর (ﷺ) থেকে আছে।

এই দু'আটি মুখস্থ করে নিন। লিখে রাখুন। এই দু'আ আপনার প্রাত্যহিক আমলের অংশ বানিয়ে নিন। আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। নিয়মিত এ দু'আ পড়ুন।

আল্লাহ কেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মুসা (ﷺ)-এর তুলনা করলেন?

উসুলুস সালাসাহর লেখক এখানে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

'আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট।' [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৫]

আল্লাহ (ﷻ) বলছেন, আমি তোমাদের নিকট সাক্ষী হিসেবে রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি হয় তোমাদের হয়ে হাশরের ময়দানে সুপারিশ করবেন অথবা তোমাদের বিপরীতে সাক্ষ্য দেবেন। ফিরআউনের নিকট আমরা যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি তোমাদের কাছেও একজন রাসূল পাঠিয়েছি।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

'কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।' [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৬]

আমরা জানি ফিরআউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল মুসা (ﷺ)-কে। কিন্তু ফিরআউন তার কাছে প্রেরিত রাসূলকে মানেনি, তাঁর কথা শোনেনি। এ কারণে আল্লাহ (ﷻ) তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ এখানে মক্কার কুরাইশদের বলছেন, যেভাবে আমি ফিরআউনের কাছে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম সেভাবে তোমাদের কাছেও একজন নবীকে পাঠিয়েছি।

আল্লাহ (ﷻ) কেন মুসা (ﷺ)-এর উদাহরণ দিলেন? আরও তো অনেক নবী-রাসূল ছিলেন। কেন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে তুলনা দেয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে মুসা (ﷺ)-কেই বেছে নিলেন?

---

[১০১] পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে দু'আর বাংলা উচ্চারণ দেয়া হলো :
আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।

এ ব্যাপারে মুকাতিল (رحمه الله)-এর মত হলো, মুসা (عليه السلام) ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে একটি সাদৃশ্য হলো তাঁদের দুজনের সম্প্রদায় তাঁদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেছিল। কারণ, তাঁরা দুজনেই ওইসব লোকের হাতে লালিতপালিত হয়েছিলেন যাদেরকে তাঁরা পরে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন। ফিরআউন নিজে মুসা (عليه السلام)-কে সৎবাবা হিসেবে লালনপালন করে বড় করেছিল। আল্লাহ (عز وجل) কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন,

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

'ফিরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালনপালন করিনি? এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।' [সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ১৮]

একইভাবে শৈশবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কেও লালনপালন করেছিল তাঁর কুরাইশী পরিবার। পরে তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এবং তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর দাওয়াহ অস্বীকার করে।

আজকেও এমনটা দেখা যায়। অনেক বাবা-মা আমাকে ফোন করে বলেন, 'আপনি কি আমার ছেলের সাথে একটু কথা বলবেন? ও আপনার কথা শুনবে।'

অথবা অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে বলে, 'আপনি কি আমার বাবার সাথে কথা বলবেন, যাতে তিনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন?'

কেন এমন হয়?

এটা হতে পারে যে, একজন মানুষ বাইরের মানুষের সাথে যতটা ফরমাল থাকে, নিজ পরিবারের সাথে তেমন থাকেন না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে পারস্পরিক আলোচনা, পরামর্শ কিংবা তর্কের ক্ষেত্রে ওই সংযম, গাম্ভীর্য কিংবা পরিমিতিবোধ কাজ করে না যেটা বাইরের মানুষের ক্ষেত্রে কাজ করে। অনেক সময় অশ্রদ্ধা এবং অসম্মানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসা (عليه السلام)-এর ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল। তাঁদের পরিবার তাঁদের এমনভাবে তাচ্ছিল্য ও অসম্মান করেছিল, যেটা হয়তো বাইরের লোকেরা ওইভাবে করত না।

এ দিক দিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এ কারণেই আল্লাহ এখানে মুসা (عليه السلام)-এর উদাহরণ দিয়েছেন। আবার ফিরআউনের ব্যাপারে আল্লাহ (عز وجل) বলেছেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا

'ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।' [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ১২]

মুসা (عليه السلام)-কে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ফিরআউনকে তীব্র শাস্তি

দিয়েছিলেন। ফিরআউন আর তার সঙ্গীসাথিদের আল্লাহ শাস্তি দিয়েছিলেন প্রচণ্ড বৃষ্টির মাধ্যমে। এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (ﷺ) এবং মুজাহিদ (ﷺ)[১০২] বলেন, 'আল্লাহ (ﷻ) বৃষ্টির মাধ্যমে ফিরআউনকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং ধ্বংস করেছিলেন। এবং আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরাইশকে সতর্ক করে দিচ্ছেন— তোমরা যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো, প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে এর চাইতেও কঠোরভাবে আমি তোমাদের পাকড়াও করব।

কারণ, আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আরও বেশি ভালোবাসেন। মুসা (ﷺ)-কে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যদি ফিরআউনের শাস্তি এত কঠোর হয়, তাহলে কুরাইশ যদি বারবার সীমালঙ্ঘন করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দাওয়াহকে অবহেলা করতে থাকে, তাদের শাস্তি কেমন হবে।'

---

[১০২] ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর (ﷺ) ছিলেন তাবিঈ ও সাহাবীদের পর কুরআনের প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যাকার। জন্ম ২১ হিজরিতে মৃত্যু ১০৪ হিজরিতে। তিনি রঈসুল মুফাসসিরিন ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর নিকট তিনবার আগাগোড়া গোটা কুরআন অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া তিনি আইশাহ, আবু হুরাইরাহ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উমার ও আবু সাঈদ খুদরি (ﷺ)-এর ছাত্র ছিলেন।

দারস ৫

গত দারসগুলোতে উসূলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথম বিষয়ের আলোচনা শেষ হয়েছিল। ইনশা আল্লাহ আজ আমরা আলোচনা শুরু করব দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে।

দ্বিতীয় বিষয় : ইবাদাতে শিরক

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ) বলেছেন,

(الثَّانِيَةُ) أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ معه فِي عبادته أحد لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

(দ্বিতীয়ত) ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না–চাই তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন।

অতঃপর লেখক সূরা জ্বিনের নিচের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন,

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تعَالَى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ١٨]

'এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'আর মসজিদসমূহ তো কেবল আল্লাহর জন্য, এতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।'' [সূরা জ্বিন, ৭২: ১৮]

ইনশা আল্লাহ সূরা জ্বিনের এই আয়াত নিয়ে এই দারসের শেষে আমরা আলোচনা করব।

তাওহিদ ও শিরক নিয়ে আলোচনার ভূমিকা

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর

ইবাদাত করো আর তাগুতকে বর্জন করো।' [সূরা নাহল, ১৬: ৩৬]

আল্লাহর প্রেরিত সব নবী ও রাসূলের দাওয়াতে যে বিষয়টি সব ক্ষেত্রে এবং সব সময় উপস্থিত ছিল, তা হলো তাওহিদ। সূরা নাহলের এ আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

'আর আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে পাঠিয়েছি...'

অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূল এই তাওহিদের দাওয়াহ নিয়ে এসেছেন। নবীদের দাওয়াহর ধরন এবং এবং তাঁদের আনা শরীয়াহর মধ্যে পার্থক্য ছিল। যেমন অনেক নবী সিয়ামের অংশ হিসেবে কথা বলাও বন্ধ রাখতেন।[১০৩] কিন্তু আমাদের শরীয়াহতে—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরীয়াহতে—এমন করা বৈধ না। কাজেই এমন খুঁটিনাটি পার্থক্য ছিল। কিন্তু মূল যে দাওয়াহ—তাওহিদের যে দাওয়াহ—তা সব সময় ছিল। এবং অপরিবর্তিত ছিল। তাই এখানে লেখক শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ) বলছেন, মহান আল্লাহ কুফর ও শিরকে সন্তুষ্ট নন। আর যে বিষয় নিয়ে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট নন, মুমিন কখনো তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। মুমিনের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ধারিত হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অনুসারে। একজন প্রকৃত মুমিন তা-ই ভালোবাসে, যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। সে এমন সবকিছু ঘৃণা করে, যা মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন।

যখন কেউ ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, তখন সেটাকে বলা হয় শিরক আল-উলুহিয়্যাহ। যদিও উদ্ধৃত বক্তব্যে তিনি সরাসরি 'শিরক আল-উলুহিয়্যাহ' শব্দগুলো ব্যবহার করেননি, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি এখানে শিরক বলতে শিরক আল-উলুহিয়্যাহকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম।' [সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ৯৭]

মহান আল্লাহ এ আয়াতে জাহান্নামবাসীদের কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। জাহান্নামবাসীরা একপর্যায়ে বলবে,

'আল্লাহর কসম, আমরা সত্যই মহা এবং স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম।'

---

[১০৩] যেমন বনী ইস্রাইলের লোকেরা এভাবে সিয়াম পালন করত। মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর ঘটনা রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا 'আমি আর রাহমানের জন্য সাওম পালনের মানত করেছি, তাই আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না।'-[সূরা মারইয়াম, ১৯: ২৬]

কেন তারা এ কথা বলবে? আল্লাহ (ﷻ) পরের আয়াতে আমাদের জানাচ্ছেন যে, জাহান্নামবাসীরা বলবে,

إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

'...যখন আমরা তোমাদেরকে জগৎসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম।' [সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ৯৮]

অর্থাৎ তারা তাদের উপাসিত মিথ্যা ইলাহদের বলবে, আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। এটা ছিল মহাভ্রান্তি। এই আয়াতে যেসব জাহান্নামীদের কথা উঠে এসেছে তারা কিন্তু তাদের মিথ্যা ইলাহদের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসেবে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বা তাঁর রাজত্বে অংশীদার মনে করত না। অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে তারা শিরক করেনি। এসব প্রশ্নে তারা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করত। তারা শিরক করেছিল উলুহিয়্যাতের প্রশ্নে। ইবাদাতের প্রশ্নে। আর এ বিষয়টি নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

সূরা আশ-শুআরার এই আয়াতে ওইসব লোকের কথা বলে হচ্ছে, যারা আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্যদের অংশীদার করেছিল। তারা আল্লাহর জন্য যে কাজ করত সেই কাজে অন্যদের শরীক করত। তারা শিরক করেছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, সমর্পণ, বিনয়াবনত হওয়া, ভালোবাসা, সিজদাহ এবং শাফা'আতের প্রশ্নে। শিরক হলো দুনিয়াতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। সব জায়গা এবং সব যুগের ক্ষেত্রে এটি সত্য। শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম। সবচেয়ে গুরুতর অজ্ঞতা। শিরকের বিপরীত হলো তাওহিদ, যা ইনসাফ ও আদলের চূড়া। জ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হলো তাওহিদের জ্ঞান। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

এবং তিনি বলেছেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এর চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ১১৬]

আল্লাহ কখনোই তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। সূরা নিসাতে আল্লাহ দুবার এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি (ﷻ) আরও বলেছেন,

وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওয়াহি পাঠানো হয়েছে, যদি শিরক করো তাহলে অবশ্যই তোমার আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৬৫]

এ কথাগুলো কার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে চিন্তা করুন। আমাকে কিংবা আপনাকে না, এ হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে নবী (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে। মুহাম্মাদ (ﷺ) সহ প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যদি তাঁরা শিরক করে তাহলে তাঁদের সব আমল মুছে যাবে এবং তাঁরা হবেন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে আমি আর আপনি শিরক করলে তার পরিণতি কেমন হতে পারে?

তাওহিদ থাকা আবশ্যিক। সুনানুত তিরমিযির একটি সহীহ হাদীসে এবং মুসলিমের একটি হাদীসে কিছু ভিন্ন শব্দে এসেছে, মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قالَ اللهُ تبارَكَ وتعالى يا ابنَ آدمَ إنَّكَ ما دعوتَني ورجوتَني غفَرتُ لَكَ على ما كانَ فيكَ ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ لو بلغت ذنوبُكَ عَنانَ السَّماءِ ثمَّ استغفرتَني غفرتُ لَكَ، ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ إنَّكَ لو أتيتَني بقرابِ الأرضِ خطايا ثمَّ لقيتَني لا تشرِكُ بي شيئًا لأتيتُكَ بقرابِها مغفرةً

'হে আদমসন্তান, যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে–তোমার গুনাহ যত অধিক হোক–তোমাকে আমি ততক্ষণ ক্ষমা করব, এতে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করব না। হে আদমসন্তান, তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায় তারপর তুমি আমার নিকট যদি ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো–এতে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করব না। হে আদমসন্তান, তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে আমিও তোমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব।'[১০৪]

এটি একটি হাদীসে কুদসী।

তাওহিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত ভারী। যদি এক বিন্দু তাওহিদকে গুনাহর পাহাড়ের ওপর রাখা হয়, তাহলে সেই এক বিন্দু তাওহিদ পুরো পাহাড়কে মিটিয়ে দেবে। মুছে দেবে। সুনানুত তিরমিযিতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (رضي الله عنه) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

---

[১০৪] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩৫৭০, তাঁর মতে হাসান গরিব; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে হাসান।-তাখরিজু রিয়াদ্বিস সলিহীন, হাদীস নং : ৪৪২

'আল্লাহ (ﷻ) কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থাপন করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, 'তুমি কি এগুলো হতে কোনো একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পারো? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার ওপর যুলুম করেছে?' সে বলবে, 'হে আমার রব, না, করেনি।'

তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, 'তোমার কোনো অভিযোগ আছে কি?

সে বলবে, হে আমার রব, নেই।'

তিনি বলবেন, 'আমার কাছে তোমার একটা সাওয়াব আছে। আজ তোমার ওপর সামান্য যুলুমও করা হবে না।' তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে, أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

তিনি তাকে বলবেন, 'দাঁড়িপাল্লার সামনে যাও।'

সে বলবে, 'হে রব, এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কী আর ওজন হবে?'

তিনি বলবেন, 'তোমার ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অতঃপর বললেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় আর সেই টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা'আলার নামের বিপরীতে কোনো কিছুই ভারী হতে পারে না।'[১০৫]

তাওহিদের কালেমার ওজন সবকিছুর চেয়ে বেশি। এই তাওহিদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ভারী। আর তাই আমরা তাওহিদ অধ্যয়ন করি। তাওহিদ হলো সবচেয়ে উজ্জ্বলের চেয়েও উজ্জ্বল। আর শিরক হলো সবচেয়ে কালো।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ

'নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে

[১০৫] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৬৩৯, তাঁর মতে এটি হাসান গরিব; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ২২৫, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে সনদ সহীহ।

এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, আর তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?' [সূরা আন নামল, ২৭: ৬২]

আল্লাহ এখানে প্রশ্ন করছেন, আর কেউ কি এ কাজগুলো করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর সবার জানা। এটি একটি রেটোরিকাল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসলে আমাদের উত্তরটি জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো রব নেই, যে বিপর্যস্তকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, অনিষ্ট দূর করতে পারে। সবচেয়ে অন্ধকার রাতে, কালো পাথরের ওপর কালো পিঁপড়ের পদধ্বনি কে শুনতে পারে? কেবল আল্লাহই পারেন।

তাওহিদ হলো শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়া, শুধু আল্লাহর কাছে দু'আ করা। সাহাবী ইবনু আব্বাস (ﷺ) যখন ছোট ছিলেন তখন নবী (ﷺ) তাঁকে শিখিয়েছিলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوك بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوك إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوك بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوك إلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْك

'জেনে রাখো, যদি গোটা জাতি তোমার কোনো উপকার করতে একত্র হয়ে যায়, তাহলেও—আল্লাহ যদি সেটা তোমার জন্য (তাকদিরে) লিখে না থাকেন—তারা তোমার উপকার করতে পারবে না। আর যদি গোটা জাতি তোমার কোনো ক্ষতি করতে একত্র হয়ে যায়, তাহলেও—আল্লাহ যদি সেটা তোমার জন্য লিখে না থাকেন—তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১০৬]

এই বিশ্বাস থাকার নাম তাওহিদ। এটুকু জানা যথেষ্ট যে, প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে শিরকের ভয় আছে। তাওহিদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তি ধ্বংসকারী যে মহান ব্যক্তির পথকে আমরা মিল্লাতু ইব্রাহীম বলি, তিনিও শিরকের ভয় করেছিলেন। আলাইহিস সালাম।

মহান আল্লাহ (ﷻ) আমাদের কুরআনে জানিয়েছেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

'(আর স্মরণ করো) যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।" [সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ৩৫]

ইনি হলেন ইব্রাহীম, হানিফ। আলাইহিস সালাম। তিনিও শিরক থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন।

---

[১০৬] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৫১৬, তাঁর মতে হাসান সহীহ।

ইব্রাহীম আত-তাইমি[১০৭] (رحمه الله) বলেছেন,

مِنْ يأمن البلاء بعد قول إبراهيم وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ إِنَّ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ؟

যখন ইব্রাহীম (عليه السلام)-ই এই দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন', তারপর এই বিপদ থেকে কে আর নিরাপদ থাকে?[১০৮]

আমি আপনাদের আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মধ্যে কয়জন শিরক আল-উলুহিয়্যাহ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন? ইয়াকুব (عليه السلام) মৃত্যুশয্যায় তাঁর বংশধরদের নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন,

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِيۖ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

'তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু এসে পৌঁছেছিল? তখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে?' পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, 'আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব। যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।" [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৩৩]

মৃত্যুশয্যায় ইয়াকুব (عليه السلام) তাঁর সন্তানদের প্রশ্ন করেছিলেন, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? মানুষ তাঁর মৃত্যুশয্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গুরুতর বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে। চিন্তা করুন, ইয়াকুব (عليه السلام) একজন রাসূল এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো, তাঁর সন্তানেরা তাওহিদের ওপর থাকবে কি না। তাঁর সন্তানেরা জবাব দিলো,

قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

'পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, 'আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব। যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।"

এ জবাব শুনে ইয়াকুব (عليه السلام) প্রশান্ত হলেন। মৃত্যুশয্যায় এই ছিল তাঁর শেষ চাওয়া। তাওহিদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১০৭] ইব্রাহীম বিন ইয়াযিদ বিন শারিক আত-তাইমী (رحمه الله), প্রখ্যাত তাবিঈ, হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। মৃত্যুসন নিয়ে বিতর্ক আছে—৯২ বা ৯৫ হিজরিতে কারাপ্রকোষ্ঠে মারা যান।

[১০৮] ইমাম ইবনু আবি হাতিম (رحمه الله), তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, বর্ণনা : ১২২৮৭

শিরক আল-উলুহিয়্যাহ

শিরকের বিভিন্ন ধরন আছে। আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে শিরক হতে পারে। আল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরক হতে পারে। আবার শিরক হতে পারে উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (ﷺ)-এর সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করার বিষয়টি। ইবাদাতে শিরক মানে হলো শিরক আল-উলুহিয়্যাহ। সম্ভবত এ কারণে তিনি উসুলুস সালাসার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে শিরক আল-উলুহিয়্যাহ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইবাদাত হতে পারে অন্তরের মাধ্যমে, মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে এবং আমলের মাধ্যমে। সব ক্ষেত্রেই ইবাদাত হবে এক আল্লাহর জন্য। ইবাদাতের কোনো অংশ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করে, সে শিরক আকবরে পতিত হয়েছে।

এখন আমরা শিরক আল-উলুহিয়্যাহ নিয়ে আলোচনা করব। এ ধরনের শিরককে আমরা তিনভাবে ভাগ করব।

প্রথম প্রকার : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা

ধরুন, কেউ মনে করে আল্লাহ (ﷻ) ইবাদাতের যোগ্য সত্তা। আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে। সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে। যেমন : খ্রিষ্টানরা বলে ঈসা (ﷺ) হলেন আল্লাহর পুত্র। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এটি শিরক। যে এমন কাজ করবে সে শিরক করল। এই ধরনের শিরকের বিষয়টি সহজ সরল, উম্মাহর সবাই এ বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে শিরক হিসেবে জানে। এটি হলো শিরক আল-উলুহিয়্যাহর প্রথম প্রকার।

দ্বিতীয় প্রকার : ইবাদাতের কিছু অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করা

এই ধরনের শিরকের ব্যাপারটা কিছুটা জটিল। এই শিরকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে উম্মাহর অনেকে সমস্যাজনক অবস্থায় পড়েছে। সহজভাবে এ ধরনের শিরক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদাতের কিছু অংশ নির্ধারণ করা। যেমন: কারও অন্তরের কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করে। অথবা কেউ তার কথা, অর্থ অথবা তার ইবাদাতের আমলের কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য করে। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। এখানে আমরা কিছু উদাহরণ দেবো, যাতে বিষয়টি সঠিকভাবে আপনারা বুঝতে পারেন।

দু'আ আত-তালাবের (دعاء الطلب) ক্ষেত্রে শিরক

প্রথম উদাহরণ হলো দু'আর ক্ষেত্রে শিরক। দু'আ হলো আল্লাহর কাছে চাওয়া। যখন বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে চায় তখন সেটাকে বলা হয় দু'আ আত-তালাব। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমার প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেবো...' [সূরা আল গাফির, ৪০: ৬০]

কাজেই দু'আ আত-তালাব হলো বান্দা যখন সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চায় এবং সেটা মুখে উচ্চারণ করে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

'আর, মসজিদগুলো কেবল আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা (সেখানে) আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না।' [সূরা জ্বিন, ৭২: ১৮]

এই আয়াতটি লেখক শুরুতে উল্লেখ করেছিলেন এবং সামনে এ নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব।

কল্যাণকর যা কিছু আমরা চাই তা পাবার এবং অনিষ্ট থেকে নিজেদের রক্ষা করার সবচেয়ে বড় উপায় হলো দু'আ। দু'আর ক্ষেত্রে যে আল্লাহর কাছে চায় না, অবধারিতভাবেই সে সৃষ্টির কাছে চায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الدُّعاءُ هو العبادةُ

'দু'আ হলো ইবাদাত।'[১০৯]

দু'আ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ এখানে দু'আকে 'আল-ইবাদাহ' বলেছেন। যেন দু'আই হলো সব ইবাদাত। দু'আর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি এভাবে বলেছেন।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إذا سألت فاسأل الله

'যখন চাইবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে।'[১১০]

---

[১০৯] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ১৪৭৯; সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩২৪৭, ইমাম তিরমিযি (رحمه الله)-এর মতে হাসান সহীহ।

[১১০] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৫১৬, ইমাম তিরমিযি (رحمه الله)-এর মতে সহীহ।

একজন শিশুকে তাওহিদের ওপর বড় করার জন্য তিনি (ﷺ) এই শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

'তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।' [সূরা আল আনকাবূত, ২৯: ৬৫]

আগেকার যুগে জাহাজে চেপে সমুদ্র পাড়ি দেয়া ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তখনকার জাহাজগুলো আজকের মতো এত শক্তপোক্ত ছিল না। বাতাসে, স্রোতে থরথর করে জাহাজ কাঁপত। উল্টে যাবার কিংবা ডুবে যাবার উপক্রম হতো। এমন অবস্থায় মুশরিকরা একমনে মহান আল্লাহকে ডাকত। তাঁর কাছে দু'আ করত। শুধু তাঁকেই রক্ষাকর্তা মনে করে তাঁরই কাছে চাইত। তারা মুশরিক ছিল, কিন্তু সমুদ্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে তারা শিরক ভুলে একমনে এক আল্লাহকে ডাকত। মহান আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। যদিও তিনি তাঁর পরিপূর্ণ ইলমে জানেন যে বিপদ থেকে বাঁচার পর, তীরে পৌঁছানোর পর এই মুশরিকরা আবারও ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করবে। এ কথা জানা সত্ত্বেও, তাদের শিরকমুক্ত দু'আর জবাব রাব্বুল আলামীন দিতেন। বিপদের মুহূর্তে তারা তাদের ঈমান ও তাওহিদকে শিরক থেকে মুক্ত করেছিল। যদিও এটা ছিল সাময়িক তবু আল্লাহ তাদের দু'আতে সাড়া দিতেন। তাহলে তিনি কি আপনার দু'আতে সাড়া দেবেন না? যখন আপনার নিয়্যাত সঠিক হবে, যখন আপনি সাময়িকভাবে না বরং সারা জীবন তাওহিদ আঁকড়ে থাকবেন, তখন তিনি কি আপনার দু'আতে সাড়া দেবেন না?

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

'আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি করো, তাহলে নিশ্চয় তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা ইউনুস, ১০: ১০৬]

আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দু'আ না করতে। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দু'আ করে আল্লাহ তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট বলেছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ

'তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও উদাসীন।' [সূরা আল আহক্বাফ, ৪৬: ৫]

দু'আর ক্ষেত্রে শিরকের চারটি ধরন বা উদাহরণ আছে।

প্রথমটি হলো সৃষ্টির কাছে এমন কিছু চাওয়া যা দেয়ার ইখতিয়ার কেবল আল্লাহর। এটি শিরক আকবর। এভাবে সৃষ্টির কাছে চাওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। জীবিত কিংবা মৃত কোনো ব্যক্তির কাছে হতে পারে। কোনো রাসূলের কাছে হতে পারে। এমন কোনো ব্যক্তির কাছে হতে পারে, যার ব্যাপারে মানুষ মনে করে সে আল্লাহর ওলী। অথবা কোনো রাজা-বাদশাহ বা জ্বিনের কাছে হতে পারে।

সুস্থতার জন্য মৃত কোনো ব্যক্তির কাছে দু'আ করা স্পষ্ট শিরক আকবর। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়, বিপর্যয় থেকে মুক্তি, বৃষ্টি, ইত্যাদির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে চাওয়া শিরক আকবর। একইভাবে এ রকম অন্য যেকোনো কিছু–যা কেবল মহান আল্লাহ করার ক্ষমতা রাখেন–তা অন্য কারও কাছে চাওয়া শিরক আকবর। যে এমন করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ সে বিশ্বাস করে, যে ক্ষমতাগুলো কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেগুলো সৃষ্টিরও আছে। ইবাদাতের কিছু অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করার কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। দু'আর ক্ষেত্রে শিরকের প্রথম প্রকার হলো এভাবে জীবিত কারও কাছে চাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার হলো মৃত কারও কাছে চাওয়া। এই মৃত ব্যক্তি হতে পারে কোনো ওলী অথবা অন্য যে কেউ।

তৃতীয় প্রকার হলো, এমন কারও কাছে চাওয়া, যে ওই স্থানে অনুপস্থিত। অথচ যে দু'আ করছে সে বিশ্বাস করছে ওই ব্যক্তি কোনোভাবে তার অবস্থান জানে এবং সে তাকে সাহায্য করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত বা যে মৃত, সে শুনবে কীভাবে? জানবে কীভাবে? সে কীভাবে সাহায্য করবে? যে এমন কারও কাছে চায়, সে শিরক আকবর করছে।

চতুর্থ প্রকার হলো, বান্দার দু'আ আর আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বসানো। উসীলা বসানো। এমন মনে করা যে, বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে দু'আ করলে সেই দু'আর উত্তর আল্লাহ দেবেন না। তাই বান্দা আর আল্লাহর মাঝে একজন উসীলা, একজন মধ্যস্থতাকারী লাগবে। এটিও শিরক আকবর। মক্কার কুরাইশদের শিরক ছিল এই ধরনের। কুরাইশরা দাবি করত, তারা যেসব মূর্তির ইবাদাত করত তারা আগে নেক বান্দা ছিল। এরা আল্লাহ আর কুরাইশের মুশরিকদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। মূর্তিগুলোর ইবাদাত করে কুরাইশ আসলে এই নেক বান্দাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাদের দু'আ

পৌঁছাচ্ছে। তারা আসলে আল্লাহর কাছেই চায়, মূর্তির কাছে না।

দুঃখজনকভাবে উম্মাহর মধ্যেও এ বিষয়টি প্রচলিত আছে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। ছোটবেলায় আমরা মদিনাতে থাকতাম। তখন মাসজিদুন নববী পরিষ্কার করার দায়িত্ব দেয়া হতো বিভিন্ন কোম্পানীকে। ত্রিশ-চল্লিশজন লোক হারাম পরিষ্কার করার কাজ করতেন। এদের মধ্যে একজনের কথা আমার আজও মনে আছে। মানুষটি ছিলেন ইয়েমেনের। কিছুটা খোঁড়া ছিলেন। আমি আর বাবা সালাতের আগেপরে মাসজিদুন নববীতে সময় কাটাতাম। আমি বসে কুরআন হিফয করতাম। বাবা থাকতেন পাশে। অনেক সময় লোকটি এসে আমার বাবার সাথে কথা বলত। এই মানুষটির দায়িত্ব ছিল নবী (ﷺ)-এর হুজরাহ পরিষ্কার করা।[১১১] নবী (ﷺ)-এর হুজরাহয় যে পিতলের দরজা আছে, সেটার ভেতরে পরিষ্কার করার দায়িত্বও উনার ছিল।

আমার আজও মনে আছে, এই মানুষটি আমার বাবাকে বলত, হুজরাহ পরিষ্কার করার সময় তাকে সেখান থেকে অসংখ্য চিরকুট আর কাগজ পরিষ্কার করতে হতো। এত কাগজ হতো যে, কয়েকটা ব্যাগ ভরে যেত। এসব কাগজে কী থাকত? মানুষ এসব কাগজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখত। তাঁর কাছে দু'আ করত। চিঠির সাথে নিজেদের এবং নিজের সন্তানদের ছবি লাগিয়ে দিত। অনেকে নিজের মেয়ের ছবি দিয়ে চিঠি লিখত, নবী (ﷺ) যেন মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। এই দু'আগুলো করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে। নিঃসন্দেহে এটি শিরক আকবর।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ
>
> 'জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।" [সূরা আয যুমার, ৩৯: ৩]

ইবাদাত এবং আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য। আল্লাহ চান ইবাদাত ও আনুগত্য বিশুদ্ধ হবে। শিরক থেকে মুক্ত হবে। কুরআনে আল্লাহ ওইসব মানুষের কথা উদ্ধৃত করেছেন, যার বলত, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের আমরা শুধু আউলিয়া (রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহণ করি। যাতে করে তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

আল্লাহ ছাড়া অন্যদের তারা আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহর নৈকট্য

[১১১] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবর যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, যা আমাদের দেশে রওজা নামে প্রসিদ্ধ।

অর্জনের জন্য। কিন্তু তবু আল্লাহ একে বৈধতা দেননি। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই কাজ শিরক এবং শিরকের গুনাহ তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। এটা ছিল কুরাইশের শিরক। কিন্তু আজকের অনেক শিয়া, সুফি এবং সাধারণ অজ্ঞ মানুষ তাদের ইমামদের কাছে, কথিত আউলিয়াদের কাছে, কিংবা কবরবাসীদের কাছে দু'আ করে। দু'আ, ভালোবাসা এবং আশার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। দুঃখজনক বাস্তবতা হল, এদের অনেকের তুলনায় কুরাইশের মুশরিকদের শিরক কম গুরুতর ছিল।

দু'আ আল-ইবাদাহর (الدعاء العبادة) ক্ষেত্রে শিরক

শিরক আল-উলুহিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণি হলো দু'আ আল-ইবাদাহ। এর বিভিন্ন ধরন আছে। দু'আ আত-তালাব হলো সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া এবং মুখে উচ্চারণ করা। যেমন কেউ বলল, হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে সুখী করে দিন। আমাকে অমুক জিনিসটি দিন। আমাকে অমুক কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। ইত্যাদি। এটি হলো দু'আ আত-তালাব।

আল্লাহর প্রতি ইবাদাতের বাকি যত প্রকার আছে তার সবকিছু দু'আ আল-ইবাদাহর অন্তর্ভুক্ত। আলেমদের কিতাবে আপনারা এই পরিভাষাগুলো পাবেন।

দু'আ আত-তালাব হলো মানুষ যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায়। দু'আ আল-ইবাদাহ হলো যখন মানুষ জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে কিংবা জান্নাতের আশায় সালাত আদায় করে। দু'আ আত-তালাব হলো মানুষ যখন দু'আ করার জন্য দুহাত তুলে। দু'আ আল-ইবাদাহ হলো বাকি সব ধরনের ইবাদাত।

অন্তরের ইবাদাত, মুখের উচ্চারণ, ইবাদাতের আমল, আল্লাহর প্রতি ভয়, আশা, ভালোবাসা, সালাত, সিয়াম, কুরবানী, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর প্রশংসা করা– এ সবই দু'আ আল-ইবাদাহর অন্তর্ভুক্ত।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে। এগুলোকে দু'আ বলা কারণ কী? কারণ, এই ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে বান্দা আসলে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু না কিছু চাইছে। দু'আ আত-তালাবের মতো সরাসরি না চাইলেও এই ইবাদাতগুলো করার মাধ্যমে মানুষ হয় আল্লাহর কাছে পুরস্কার চাচ্ছে, বা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি চাচ্ছে।

এখন আমরা দু'আ আল-ইবাদাহর কিছু প্রকার নিয়ে আলোচনা করব।

নিয়্যাতের শিরক

দু'আ আল-ইবাদাহর ক্ষেত্রে শিরকের প্রথম প্রকার হলো নিয়্যাতের বা উদ্দেশ্যের শিরক। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

'যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দিই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।' [সূরা হুদ, ১১: ১৫]

এ ধরনের শিরক পাওয়া যায় মুনাফিকদের মধ্যে। আমরা ওই নিফাকের কথা বলছি না, যা তুলনামূলক ছোট কিছু বিষয়ে অনেক মুমিনের মধ্যে থাকে। এখানে নিফাক বলতে আমরা বড় নিফাক বোঝাচ্ছি, যা কুফর। অর্থাৎ ওইসব মানুষের নিফাক, যাদেরকে জনসম্মুখে বা বাহ্যিকভাবে মুসলিম মনে হয়, কিন্তু তাদের অন্তরে কোনো ইসলাম নেই। এই ধরনের মানুষের যে নিফাক, তা বড় নিফাক। ঈমানের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে তারা মুনাফিক। এই ধরনের মুনাফিকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

'আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।" [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৪]

এই ধরনের লোকেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে নিফাক করে। আবার এদের অনেকের মধ্যে হয়তো ছোট নিফাকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও (মিথ্যা বলা, আমানতের খিয়ানত ইত্যাদি) থাকতে পারে। নিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরকের পাশাপাশি এই ধরনের মুনাফিকদের অনেকে ইবাদাতের খুঁটিনাটির ক্ষেত্রেও শিরক করতে পারে। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

'নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। কিন্তু আসলে তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।' [সূরা আন-নিসা, ৪: ১৪২]

তারা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। এবং তা মানুষ দেখতে পায়, মানুষের চোখে পড়ে। এরা হলো ওই ধরনের মানুষ যাদের মধ্যে শিরক এবং

নিফাকের মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের মধ্যে শিরক আছে, কিন্তু সেই শিরকের মধ্যে বড় নিফাকের বৈশিষ্ট্যও আছে।

এটা হলো নিয়্যাতের শিরকের ব্যাপারে সাধারণ বক্তব্য। তবে এখানে কিছু বিষয় জানা এবং লক্ষ করা প্রয়োজন। এমন অনেক মুসলিম আছে যারা তাওহিদে বিশ্বাসী। তারা আল্লাহর জন্য কিছু আমল করে থাকে, কিন্তু এই আমলের জন্য দুনিয়াবী কিছু প্রতিদান বা পুরস্কারও সে আশা করে। সেটা হতে পারে সম্পদ, নিরাপত্তা, সুখ কিংবা সন্তানের আরোগ্য। সে ইবাদাত করছে আল্লাহর জন্য। প্রতিদানও চাচ্ছে আল্লাহর কাছে। এটা ঠিক আছে। কিন্তু সে এই ইবাদাতের মাধ্যমে শুধু আখিরাতের পুরস্কার চায় না, দুনিয়াবি কিছুও চায়। অর্থাৎ সে শিরক করেনি। তার ইবাদাত সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু আখিরাতের পুরস্কারের বদলে সে দুনিয়ার কিছু চেয়েছে। সে চেয়েছে দুনিয়াতে তার নেক আমলের পুরো ফল পেতে। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হুকুম হলো, সে দুনিয়ার জীবনে পুরস্কার এবং সাওয়াব পাবে। সে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার যা-ই চাক না কেন, আখিরাতের পুরস্কারের তুলনায় তা অতি নগণ্য। এই নগণ্য পুরস্কার তাকে দুনিয়াতে দেয়া হবে। যেহেতু সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করেনি, তাই সে মুসলিম গণ্য হবে।

আরেক ধরনের মানুষ আছে, এদের অবস্থা তুলনামূলক খারাপ। এই ধরনের মানুষ ইবাদাত করে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে রিয়া। তারা ইবাদাত করে লোক দেখানোর জন্য। দুনিয়াবী কোনো কিছু আল্লাহর কাছ থেকে পাবার আশায় তারা ইবাদাত করে না; তারা ইবাদাত করে নিজেদের নেককার, পরহেজগার মানুষ হিসেবে জাহির করার জন্য। এটি শিরক আল-আসগর, অর্থাৎ ছোট শিরক।

তৃতীয় আরেক ধরনের ব্যক্তি আছে যারা ইবাদাত করে সম্পদ আর লাভের জন্য। যেমন তারা কারও জন্য বদলা হজ্ব করে শুধুই টাকা কামানোর জন্য। অথবা কেউ এক অঞ্চল থেকে গিয়ে আরেক অঞ্চলে হিজরত করে বসবাস করে। কিন্তু সেটা করে কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য। এই ধরনের লোক দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদের চেয়ে কিছুটা বুদ্ধিমান। কারণ, তারা কমপক্ষে দুনিয়া কামাচ্ছে। তবে দিনশেষে এটিও শিরক আসগর বা ছোট শিরক। এ ধরনের লোক দুনিয়াতে তাদের আজর বা প্রতিদান পেয়ে যাবে।

চতুর্থ প্রকার হলো এমন কেউ, যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর জন্য আমল করে। তার আমলে ত্রুটি থাকে না। কিন্তু সে অন্য কোনো দিক দিয়ে বড় শিরকের মধ্যে আছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে ইন শা আল্লাহ। ধরুন, কোনো ব্যক্তি মনে করে ঈসা (ﷺ) আল্লাহর পুত্র—নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর

সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা করে, অথবা অন্য কোনো ভালো আমল করে; কিন্তু একই সাথে সে এমন বিশ্বাসও রাখে। এই ব্যক্তি শিরক আকবরের মধ্যে আছে।

আরেকটি উদাহরণ হলো, ওইসব লোক যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছোট কোনো নেক আমল করেছে। এ রকম ক্ষেত্রে তারা হয়তো দুনিয়াতে সম্পদ, সন্তান, খ্যাতি বা সুখী জীবনের মাধ্যমে পুরস্কার পাবে; কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য শাস্তি ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না।

পঞ্চম প্রকার হলো ওই ধরনের মানুষ যারা আখিরাতের জন্য সালাত, যাকাত এবং হজ্ব আদায় করে। কিন্তু পাশাপাশি কিছু আমল করে দুনিয়ার জন্য। যেমন: সে নিজেকে জাহির করার জন্য কিছু নেক আমল করে। এটিও একধরনের ছোট শিরক। এ ব্যক্তির ফয়সালা নির্ভর করবে তার নেক আমল আর গুনাহর হিসেবের ওপর। গত দারসে আমরা ছোট ও বড় শিরকের মধ্যেকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম—দরকার হলে তা আবার দেখে নিতে পারেন। সহজ ভাষায়, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, যার মধ্যে শিরক আকবর বা বড় শিরক আছে সে তার দ্বীনকে ধ্বংস করে ফেলেছে। চিরকালের জন্য সে জাহান্নামে থাকবে। আর একজন মুমিন যখন শিরক আসগর বা ছোট শিরক করে, তখন সেটা নেক আমলকে ধ্বংস করে ফেলে; কিন্তু সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। সে মুমিনই থাকে। অর্থাৎ বড় শিরক মানুষের দ্বীন ধ্বংস করে ফেলে। আর ছোট শিরক আমল নষ্ট করে।

ভালোবাসার শিরক

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ
>
> ‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে অত্যন্ত ভালোবাসে।’ [সূরা আল বাকারাহ, ২: ১৬৫]

ইবনু যাইদ[১১২] (رحمه الله) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন,

«هؤلاء المشركون. أندادُهم: آلهتهم التي عَبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله

---

[১১২] ইনি হচ্ছেন ইমাম আব্দুর রাহমান বিন যাইদ বিন আসলাম (رحمه الله), তিনি প্রসিদ্ধ মুফাসসির তাবে তাবিঈ ছিলেন। তাঁর পিতা হচ্ছেন প্রসিদ্ধ তাবিঈ যাইদ বিন আসলাম (رحمه الله)। ইমাম তাবারি, আব্দুর রাযযাক ও সা'লাবি (رحمهم الله) তাঁদের তাফসিরে ইবনু যাইদের অনেক বর্ণনা যুক্ত করেছেন। তিনি ১৮২ হিজরিতে মারা যান।

'এরা হলো মুশরিকিন, আর তারা যাদেরকে সমকক্ষ স্থির করেছিল এরা হচ্ছে তাদের সেসব উপাস্য যাদেরকে তারা আল্লাহর পাশাপাশি উপাসনা করত। তারা তাদেরকে ততটাই ভালোবাসত যতটা মুমিনরা আল্লাহকে ভালোবাসে।'[১১৩]

ভালোবাসার বিভিন্ন ধরন হতে পারে। এ বিষয়টি খেয়াল করা জরুরি।

ভালোবাসার প্রথম প্রকার : মাহাবা ওয়াজিবা (محبة واجبة), অর্থাৎ আবশ্যিক ভালোবাসা। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য ভালোবাসা। যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ভালোবাসেন সেসব কিছু ভালোবাসা। এটা মাহাব্বা ওয়াজিবা। এটা আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসা, যা মুমিনের মধ্যে থাকা আবশ্যিক। যেমন: উসুলুস সালাসাহর লেখক বলেছেন, আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন। এর তাৎপর্য হলো, যেহেতু আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন তাই একজন মুমিন হিসেবে আমাকেও তা অপছন্দ করতে হবে এবং এ থেকে দূরে থাকতে হবে।

ভালোবাসার দ্বিতীয় প্রকার : মাহাব্বা তাবি'ইয়্যাহ (محبة تبعية), স্বাভাবিক ভালোবাসা। যেমন: ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খেতে ভালোবাসে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি পান করতে ভালোবাসে। এ ধরনের ভালোবাসা বৈধ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ভালোবাসার বস্তুকে মহিমান্বিত করা, বিনয়াবনত হওয়া এবং একে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সমান বা ওপরে স্থান দেয়ার দিকে না যায়। অর্থাৎ এ ধরনের ভালোবাসা বৈধ, কিন্তু সীমার মধ্যে।

ভালোবাসার তৃতীয় প্রকার : মাহাব্বা রাহমাহ ওয়া ইশফাক (محبة رحمة و إشفاق)। এটি হলো দয়া, সহমর্মিতা এবং সহানুভূতিজাত ভালোবাসা। যেমন: সন্তানদের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ইত্যাদি। এই ধরনের ভালোবাসাও বৈধ, তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সমান না হয়, বা এর চেয়ে বেশি না হয়। বৈধ ভালোবাসা যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, তা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সমান হয়ে গেছে বা তার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে কুরআনের এই আয়াত প্রযোজ্য হবে:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বলো, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা

[১১৩] ইমাম তাবারি (رحمه الله), জামিউল বায়ান : ৩/২৮০

পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত।' আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ২৪]

ভালোবাসার চতুর্থ প্রকার : মাহাব্বা উনস ওয়া উলফ (محبة أنس و ألف)। এটি হলো সৌহার্দ্য ও সদ্ভাবের ভালোবাসা। যেমন : দুজন মুসলিম ভাই পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, একই সাথে তাদের মধ্যে কিছু যৌথ স্বার্থ বা আগ্রহের জায়গাও আছে। যেমন তারা দুজনেই হয়তো ইলম অর্জনে আগ্রহী, অথবা তারা একসাথে সফর করে, অথবা তারা একসাথে ব্যবসা করে ইত্যাদি। এই ধরনের ভালোবাসাও বৈধ।

এখন পর্যন্ত আমরা চার ধরনের ভালোবাসার কথা বললাম। প্রথম প্রকারের ভালোবাসা আবশ্যিক, যা প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যে থাকতে হবে। পরের তিন প্রকারের ভালোবাসা বৈধ। এ ধরনের ভালোবাসা থাকাকে শিরক গণ্য করা হয় না। তবে এই ভালোবাসা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে হবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ তা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার সমান না হয়, বা এর চেয়ে বেশি না হয়, ততক্ষণ এ ধরনের ভালোবাসা বৈধ। যেমন: নবী (ﷺ) মিষ্টি ভালোবাসতেন। তিনি মধু ও সুগন্ধী ভালোবাসতেন।[১১৪] তিনি তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের ভালোবাসতেন এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে আবু বাকর আস-সিদ্দিক (رضي الله عنه)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।[১১৫]

ভালোবাসার পঞ্চম প্রকার : মাহাব্বা শিরকিয়্যাহ (محبة شركية)। এমন ভালোবাসা যা শিরক। এমন ভালোবাসা যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। যে ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তা যদি অন্য কোনো কিছুর (কোনো বস্তু, মানুষ ইত্যাদি) জন্য হয়, তাহলে সেটা বড় শিরক হবে। এমন শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। মাহাব্বা শিরকিয়্যাহ-এর মধ্যে আত্মসমর্পণ, বিনয়াবনত হওয়া, মহিমান্বিত করার মতো

---

[১১৪] ক) আইশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন,

كَانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ والعَسَلَ.

'নবী (ﷺ) মিষ্টান্ন ও মধু ভালোবাসতেন।'-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৪৩১, ৫৫৯৯

খ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আমার নিকট তোমাদের দুনিয়া থেকে নারী ও সুগন্ধীকে প্রিয় করা হয়েছে। আর আমার চোখের শান্তি রয়েছে সালাতে।'-ইমাম বাইহাক্বী (رحمه الله), আস সুনানুল কুবরা : ৭/৭৮, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সনদ হাসান।-তাখরিজু যাদিল মা'আদ : ১/১৪৫

[১১৫] আমর ইবনুল আস (رضي الله عنه) (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-কে প্রশ্ন করেন, 'মানুষের মাঝে কে আপনার সর্বাধিক প্রিয়?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আইশাহ।' আমর (رضي الله عنه) পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'পুরুষদের মাঝে কে?' তিনি উত্তর দেন, 'তাঁর পিতা (অর্থাৎ আবু বাকর رضي الله عنه)।'-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৬৬২

বিষয়গুলো থাকে। এ ধরনের ভালোবাসা ইবাদাতের অংশ এবং এ ধরনের ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। যে এ ধরনের ভালোবাসা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়, সে শিরক করল। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

> 'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৬৫]

সংক্ষেপে বলা যায়, মাহাব্বা শিরকিয়্যাহ হলো এমন ভালোবাসা যা পূর্ণ আনুগত্য, সমর্পণ, আন্তরিকতা, কুরবানী দাবি করে। এটি ওই ধরনের ভালোবাসা, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। মক্কার মুশরিকরা তাদের উপাসিত মূর্তিগুলোর প্রতি এই ধরনের ভালোবাসা রাখত।

ভয়ের শিরক

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> 'বস্তুত ওই শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; তবে যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে তাদেরকে ভয় না করে কেবল আমাকে ভয় করবে।' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৫]

মক্কার মুশরিকরা এ কাজটা করত। মুশরিকরা চেষ্টা করত তাদের উপাসিত মূর্তি আর তাদের মৃত ব্যক্তিদের (যাদের তারা আউলিয়া মনে করত) ব্যাপারে মুমিনদের মনে ভয় তৈরি করতে।

ভয়ের চারটি ধরন আছে।

ভয়ের প্রথম ধরন : আল-খাউফ আশ শিরকি (الخوف الشركى)। এমন ভয় যা শিরক। কোনো সৃষ্টিকে এমনভাবে ভয় করা যেভাবে কেবল আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এই ধরণের ভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিনীত হওয়া, মহিমান্বিত করা, প্রশংসা করার মতো বিষয়গুলো মিশ্রিত থাকে। যেমন: কোনো মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বিশ্বাস করা যে, সে কারও উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। সে জীবিতদের অভিশাপ দিতে পারে, সম্পদ দিতে পারে কিংবা ছিনিয়ে নিতে পারে, জীবন থেকে কল্যাণ বা নিয়ামাত ছিনিয়ে নিতে পারে ইত্যাদি। এই বিশ্বাসের কারণে সেই মৃত ব্যক্তিকে ভালোবাসা, সম্মান করা এবং ভয় করা শিরক।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

'আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে–যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।' [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ১৮]

খাশইয়াহ হলো শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়। এই ভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, সমীহ, ভালোবাসা এমনভাবে মিশ্রিত থাকে যা ইবাদাতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে এভাবে ভয় করা শিরক। এটি শিরক আকবর যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

ধরুন, কেউ দাবি করল আল্লাহ কোনো জীবিত কিংবা মৃত নেক বান্দাকে শাফা'আতের ক্ষমতা দিয়েছেন।[১১৬] কিংবা এমন কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, কেউ বিশ্বাস করল ওই ব্যক্তি মানুষকে দারিদ্র্যে ফেলতে পারে। অথবা মানুষকে অসুস্থ করতে পারে। এটি শিরক আকবর, এবং এটিই হলো আল-খাউফ আশ শিরকি বা ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক। কেউ হয়তো বলতে পারে, এই নেক বান্দা নিজে নিজেই এই ক্ষমতা অর্জন করেছে। আবার কেউ বলতে পারে, আল্লাহ এই ব্যক্তিকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই ক্ষেত্রেও ফলাফল একই–দুটোই শিরক।

মক্কার কুরাইশরা, জাহিলিয়্যাহর সময়কার আরবরা তাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এমন বিশ্বাস রাখত। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আজকের মুসলিম সমাজে এমন কাজ হয় যা জাহিলিয়্যাতের সময়কার মুশরিকদের এই শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। চাইলে অগণিত উদাহরণ দেয়া সম্ভব। উম্মাহর মাঝে যে কবরপূজারিরা আছে তারা ঠিক এ কাজটাই করে। কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে তারা এমন বিশ্বাস ও ভয় রাখে যা কুরাইশের মুশরিকিনরা

---

[১১৬] অর্থাৎ শাফা'আত তো আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিয়ামাতে করা হবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহ কিছু বান্দাকে শাফা'আতের এমন ক্ষমতা আগেই দিয়ে রেখেছেন যে তারা চাইলেই কাউকে শাফা'আত করতে পারে–নিজের মর্জিমতো–এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনার প্রয়োজন নেই, তাহলে এটা শিরক হবে। এই শিরকে পড়েই বহু লোক কথিত পীরদের অনুসারী হয়ে বিভিন্ন গুনাহ করে আর পীরের দরগায় দান করে এই আশায় যে, তিনি তো আমাকে পার করিয়েই দেবেন। অথচ এটা কখনোই হবার নয়। আল্লাহ বলেছেন,

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

'তাঁর নিকটে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে এমন আছে, যে শাফা'আত করতে পারবে?'–সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ২৫৫

তাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে রাখত। এই মানুষগুলো জীবদ্দশায় হয়তো নেককার বান্দা ছিলেন, কিন্তু এখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। অথচ মানুষ বিশ্বাস করছে, তারা তাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে। এই বিশ্বাসের কারণে তারা তাদের ভয় করছে, ইবাদাত করছে। অনেক ক্ষেত্রে তো এমন কোনো কবরবাসীর ইবাদাত করা হয়, যে জীবদ্দশায় খারাপ লোক ছিল। অনেক সময় এমন কোনো কবরের কাছে ইবাদাত করা হয়, যেই কবরে আদৌ কারও মৃতদেহই নেই। কবরপূজারিরা এসব মৃত ব্যক্তিদের আল্লাহর মতো করে ভয় করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভয় করে।

আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর নাম নিয়ে অহরহ মিথ্যা কসম করে। কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে বলেন সিতনা যায়নাবের নামে কসম করো, তাহলে দেখবেন সে কসম করছে না। সিতনা যায়নাবকে তারা আল্লাহর ওলী মনে করে, এবং এই ওলীকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভয় করে। তাই আল্লাহর নাম মিথ্যা কসম করলেও সিতনা যায়নাবের ব্যাপারে তারা মিথ্যা কসম করবে না। তার অন্তরে আল্লাহর চেয়ে এই ওলীর জন্য ভালোবাসা বেশি। আল্লাহর চেয়ে এই ওলীকে এবং ওলীর শাস্তিকে সে বেশি ভয় করে। তাই সে আল্লাহর নামে এক শ বার মিথ্যা কসম করবে; কিন্তু ওলীর নামে কখনো মিথ্যা কসম করবে না। ইরাকের শিয়ারা সিতনা যায়নাবের ব্যাপারে এমন আকীদাহ রাখে। সিতনা যায়নাবের মাজার অর্থাৎ কবরকে রক্ষা করার জন্য ইরাকের অসংখ্য শিয়া জড়ো হয়েছিল। কেন? কারণ তাদের নেতারা এবং লেবাননের হিযবুল্লাহর নেতারা তাদের বলেছিল, তাদেরকে যেকোনো মূল্যে এই মাজার রক্ষা করতে হবে।[১১৭]

ভয়ের দ্বিতীয় ধরন : আল খাউফুল্লাযি ইয়াহমিল 'আলা তারক ওয়াজিব আও ফিল **মুহাররাম।** এটি হলো এমন ভয় যার কারণে মানুষ কোনো দায়িত্ব ত্যাগ করে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে। অনেকে এ ধরনের ভয়কে শিরক মনে করলেও আসলে এটি শিরক না। তবে এটি হারাম। যেমন: মানুষের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে কেউ সৎকাজের

---

[১১৭] সিত যাইনাব দ্বারা যাইনাব বিনতু আলী (ﷺ)-কে বোঝানো হয়। তিনি ছিলেন আলী (ﷺ) ও ফাতিমা (ﷺ)-এর কন্যা এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফর (ﷺ)-এর স্ত্রী। কারবালার প্রান্তরে তিনি তাঁর ভাই হুসাইন (ﷺ)-এর সাথে ছিলেন, যুদ্ধোত্তরকালে হুসাইন (ﷺ)-এর পুত্র আলী (ﷺ)-কে রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ৬৮২ সালে দামেস্কে মারা যান। তাঁর কবর পরবর্তীকালে মাজারে পরিণত হয় এবং সেই মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর সিত যাইনাব নামেই প্রসিদ্ধি পায়–যা দামেস্ক থেকে ১০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। সিত (ست) আরবী সায়্যিদাহ (سيدة) শব্দের বিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ।

আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকল।

সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা আমাদের দায়িত্ব। বৈধ ওজর কিংবা কারণ ছাড়া কেবল লোকের ভয়ে যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সেটা হারাম। তবে শিরক না। সাধারণত এই ধরনের ভয় তৈরি হয় মানুষের মনে, আর শয়তান একে আরও উসকে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় কাল্পনিক কোনো ভয়ের কারণে মানুষ তার দায়িত্ব ত্যাগ করছে। অথবা দেখা যায় সামান্য আশঙ্কা আছে, কিন্তু তা এত গুরুতর নয় যে এর কারণে দায়িত্ব ত্যাগ করতে হবে।

যেমন: প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কারণে সত্য বলার দায়িত্ব ত্যাগ করা হারাম, বিশেষ করে আহলুল ইলম বা ইলমসম্পন্ন মানুষদের জন্য। কারণ, তাদের ওপর সত্য বলার বিশেষ দায়িত্ব আছে। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

> ‘বস্তুত ওই শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; তবে যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে তাদেরকে ভয় না করে কেবল আমাকে ভয় করবে।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৫]

আবু সাইদ আল-খুদরি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكم هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يقولَ في حقٍّ إذا رَآه، أو شهِده أو سمِعه

> ‘যদি সত্য দেখে থাকো, প্রত্যক্ষ করে থাকো বা শুনে থাকো–তাহলে লোকের ভয় যেন তোমাদের কাউকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে।’[১১৮]

এই হাদীসে সত্য বলা থেকে বিরত থাকতে মানা করা হয়েছে এবং এমন করা হারাম হবার বিষয়টি আমরা হাদীস থেকে জানতে পারছি। এ কারণেই আমরা কিছু লোককে ‘উম্মাহর কাপুরুষ’ বলি। কারণ তারা সত্য জানা সত্ত্বেও বেতন হারানোর ভয়ে, কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হবার ভয়ে, কিংবা মানুষের সমর্থন হারানোর ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকে। অথচ এসব ক্ষেত্রেও সত্য বলা থেকে বিরত থাকার সুযোগ নেই। লক্ষ করুন, এই হাদীসে শুধু ওই মানুষদের কথা বলা হচ্ছে যারা সত্য বলা থেকে বিরত থাকে। তাহলে সরাসরি বাতিলের পক্ষ যারা গ্রহণ করে তাদের অবস্থান কেমন, চিন্তা করুন।

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ ধরনের ভয় হারাম হলেও তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছায় না। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে অনেকের পা পিছলে যায়। অনেকে ইমাম ইবনু

---

[১১৮] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১১০১৭; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে ইমাম মুসলিম (رحمه الله)-এর শর্তে সহীহ।

তাইমিয়্যাহ (ﷺ) কিংবা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ)-এর দু-এক লাইনের কোনো উদ্ধৃতি পড়ে, তারপর উম্মাহর অর্ধেক মানুষকে মুশরিকিন কিংবা কুফফার বলে বসে! যেমনটা বললাম, এই ধরনের ভয় হারাম; কিন্তু এটি শিরক না—যদি না তা পূর্বে উল্লেখিত আল-খাউফ আশ-শিরকির পর্যায়ে না যায়।

ভয়ের তৃতীয় ধরন : আল-খাউফ মিনাল্লাহি তা'আলা(الخوف من الله تعالى)। এটি ভয়ের তৃতীয় প্রকার। আর তা হলো আল্লাহ (ﷻ)-এর ভয়। আল্লাহর প্রতি ভয়—যার মধ্যে শ্রদ্ধা, সমীহ, ভালোবাসা, বিনীতভাব মিশ্রিত থাকে। এই ধরনের ভয় থাকা ওয়াজিব। আর এই ধরনের ভয় শুধু আল্লাহর জন্য থাকাই ওয়াজিব। আল্লাহর শাস্তির ভয় করা এই ভয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

'এটা তাদের জন্য, যারা (কিয়ামাতের দিন) আমার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে; আর ভয় করে আমার (শাস্তির) হুমকিকে।' [সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ১৪]

এবং তিনি বলেছেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ

'আর যে তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য আছে দুটো বাগান।' [সূরা আর রাহমান, ৫৫: ৪৬]

মনের মধ্যে এই ভয় থাকা এবং তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া হলো ঈমানের চূড়া। তবে এই ভয় থেকে কেউ যদি হতাশা এবং নিরাশায় পর্যবসিত হয়, তবে সেটা ভুল।

ভয়ের চতুর্থ ধরন : আল-খাউফ আল জিবিল্লি (الخوف الجبلي)। ভয়ের চতুর্থ প্রকার হলো আল-খাউফ আল জিবিল্লি (স্বভাবজাত ভয়)। এটি হলো স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ভয়। কোনো পরিস্থিতিতে যদি ভয়ের সত্যিকার কারণ থাকে, তাহলে এই ধরনের ভয় থাকা মুবাহ। যেমন: শত্রু আপনার সামনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সামনে একটি সিংহ এসে দাঁড়িয়েছে, আপনি যে নৌকায় চড়েছেন তা ডুবতে বসেছে, অথবা আপনার ঘর হঠাৎ করে কাঁপতে শুরু করেছে, ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে—এসব ক্ষেত্রে ভয় পেলে তাতে কোনো দোষ নেই। নিন্দনীয় কিছু নেই।

সূরা আল-ক্বাসাসে মুসা (ﷺ)-এর আলোচনায় মহান আল্লাহ এ ধরনের ভয়ের কথা বলেছেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

'তখন সে ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে চারপাশের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ

করতে থাকে।' [সূরা আল-ক্বাসাস, ২৮: ২১]

এই ধরনের ভয় হারাম না, শিরকও না। তবে এর আরেকটি দিক আছে। একজন মুমিনের ঈমান যত শক্ত হবে তার অন্তর থেকে এ ধরনের ভয় তত কমতে থাকবে। যেমন: সালাফদের অনেকের ব্যাপারে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তাঁরা সালাতে ছিলেন। সুজুদে গেছেন, এমন অবস্থায় তাদের পাশে সিংহ এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা সিজদাহ দিচ্ছেন আর মাথার ঠিক ওপরে সিংহ নিশ্বাস ফেলছে। তবু তাঁরা বিন্দুমাত্র ভয় পাননি।[১১৯]

আল্লাহ যেমন মুসা (ﷺ)-এর ভীত হবার কথা বলেছেন, তেমনিভাবে আরেকটি ঘটনার কথাও জানিয়েছেন, যখন বনী ইস্রাইল ভয়ের কারণে ইতস্তত করছিল। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

الَ كَلَّآ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

মুসা বলল, 'কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন।' [সূরা আশ শুআরা, ২৬: ৬২]

বনী ইস্রাইল ভয় পেলেও মুসা (ﷺ) ভয় পাননি, কারণ এই সময়ে তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিলেন।

আশার ক্ষেত্রে শিরক

শিরকের আরেকটি ধরন হলো শিরক আর-রাজা (شرك الرجاء), অর্থাৎ আশার ক্ষেত্রে শিরক। এটি হলো সৃষ্টির কাছ থেকে এমন কিছু আশা করা যা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকে–আশা করা যায়। এই ধরনের শিরক ওই মানুষদের মধ্যে দেখা যায়, যারা সৃষ্টির কাছ থেকে এমন কিছু পাবার আশা করে যা দেয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। যেমন: সৃষ্টির কাছে সন্তান কামনা করা অথবা আরোগ্য কামনা করা; অথচ এ বিষয়গুলো শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন। এটি শিরক আকবর, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

লক্ষ করুন, ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো আসবাব, উপায়। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার

---

[১১৯] প্রখ্যাত তাবিঈ সিলাহ বিন আইশাম আবু সাহবা আল'আদাউই (রহ.)-এর এমন ঘটনা আছে। তিনি ইবনু আব্বাস (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাবুল আক্রমণকালে তিনি সেনাদলের সদস্য ছিলেন। রাতে সবাই ঘুমালে তিনি বের হয়ে পাশের জঙ্গলে সালাত আদায় করতে থাকেন। এমন সময় একটা সিংহ আসে। কিন্তু তিনি একনিষ্ঠভাবে সালাতে রত থাকেন। সালাত শেষ করার পর তিনি সিংহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يَا سَبُعُ! اطْلُبِ الرِّزْقَ بِمَكَانٍ آخَرَ. 'হে সিংহ, তুমি অন্যত্র তোমার রিযক অন্বেষণ করো'। সিংহও চুপচাপ চলে যায়। ঘটনাটি ইমাম যাহাবি (রহ.) উল্লেখ করেছেন।-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৩/৪৯৯

জন্য যাওয়া শিরক না। এর মাধ্যমে ডাক্তারকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবা হচ্ছে না। আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যান তখন এই বিশ্বাস নিয়ে যান না যে, ডাক্তার নিজে আপনাকে আরোগ্য দিতে পারে, বা তার কোনো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে। অথবা ডাক্তার তার ইচ্ছামতো যেকোনো অবস্থান থেকে যে কাউকে সুস্থ করার সক্ষমতা রাখে। যদি এমন বিশ্বাস কেউ রাখে, তাহলে সেটা শিরক হবে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার কথামতো কোনো ওষুধ খেলে সেটা শিরক না।

রুকু এবং সিজদাহয় শিরক

শিরকের আরেকটি ধরন হলো রুকু এবং সিজদাহতে শিরক করা। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সমর্পণ, আনুগত্য, দাসত্ব, ইবাদাত ও ভালোবাসা নিয়ে রুকু বা সিজদাহ করে, সে শিরক আকবর করল।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
>
> 'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সিজদাহ করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদাহ করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো।' [সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩৭][১২০]

তিনি আরও বলেছেন,

> قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ
>
> 'বলো, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য–যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোনো শরীক নেই।" [সূরা আল আন'আম, ৬: ১৬৩-১৬২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁকে সিজদাহ করা যাবে কি না? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ
>
> 'এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সিজদাহ করবে এটা কাম্য নয়।'[১২১]

---

[১২০] এটি সিজদাহর আয়াত।

[১২১] সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৪১৬২, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, হাদীস সহীহ সনদ হাসান।

লক্ষ করুন, আমরা শুরুতে বলেছি কেউ যদি ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কোনো কিছু করে, তাহলে সে শিরক আকবর করল। শিরকের সংজ্ঞার আলোচনাতে আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলাম। কাজেই কেউ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি সিজদাহ করে, তাহলে সেটি সুস্পষ্ট শিরক।[১২২]

সুজুদ, রুকু এবং কিয়ামের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশে সিজদাহ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য রুকু, কিয়াম বা এ ধরনের অন্য কিছু করার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাওহিদের ওপর সুগভীর জ্ঞান অর্জন করা উলামায়ে কেরাম তাঁদের আলোচনায় এ পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সিজদাহ করে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় সিজদাহর মাধ্যমে ইবাদাত করা, তাহলে সে শিরক আকবর করেছে। সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। আবারও শুনুন। খেয়াল করে শুনুন। কেউ যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি এভাবে সিজদাহ করে তখন সে অটোম্যাটিকালি শিরক আকবর করেছে।

কিন্তু রুকুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা আলাদা। সুজুদ বা সিজদাহ একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। সালাতের বাইরেও আমরা সিজদাহ করি। যেমন: সুজুদ আত-তিলাওয়াহ–কুরআনের কিছু আয়াত আছে যেগুলো তিলাওয়াত করার পর আমরা সিজদাহ দিই। একই ভাবে সুজুদ আশ-শোকর–আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য আমরা সিজদাহ দিই। এই ধরনের সিজদাহ আমরা সালাতের বাইরেও করে থাকি। তাই সিজদাহ সালাতের ভেতরে হতে পারে, সালাতের বাইরেও হতে পারে। কিন্তু রুকু শুধু সালাতের ভেতরে হয়ে থাকে। সালাতের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে রুকু করার কোনো ইবাদাত ইসলামে নেই।

আপনি যদি দেখেন কেউ সালাত আদায় করছে না কিন্তু সিজদাহ দিচ্ছে, তাহলে আপনি কী ভাববেন? হয়তো সে সুজুদ আত-তিলাওয়াত করছে। সে কুরআন পড়ার

---

[১২২] শাইখ নাসির বিন হামাদ আল ফাহাদ (ফা. আ) এক প্রশ্নের জবাবে জানান, গাইরুল্লাহকে সিজদাহ করার বিধান নিয়ে দুটি মত রয়েছে :

১) সব ধরনেরই সিজদাহই শিরক,

২) সম্মান ও ইবাদাতের সিজদাহর বিধানে পার্থক্য আছে। সম্মানের সিজদাহ হারাম, শিরক নয়; ইবাদাতের সিজদাহ শিরক। শাইখ বলেন,

'আগে আমি প্রথম মত প্রকাশ করতাম যে, গাইরুল্লাহর সব সিজদাহই শিরক। তবে যখন সকল দলিল জানলাম, তখন দ্বিতীয় মতের দিকেই ঝুঁকলাম। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাত।'-আল ফাতাওয়াউল হাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৩৫

সময় সিজদাহর কোনো আয়াত পড়েছে, তাই সে সিজদাহ দিচ্ছে। অথবা সে সুজুদ আশ-শোকর করছে। হয়তো সে কোনো সুসংবাদ শুনেছে, তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদাহ করছে।

অন্যদিকে যদি দেখেন, কেউ সালাত আদায় করছে না, কিন্তু রুকু করছে, তাহলে কী ভাববেন? হয় এই লোক পাগল অথবা সে বিদআতি। কারণ, ইসলামে সালাতের বাইরে রুকুর কোনো নিয়ম নেই। রুকু স্বতন্ত্রভাবে কোনো ইবাদাত নয়।

ধরুন, কেউ সালাত আদায় করছে না, কিন্তু রুকু করছে। মানুষ তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কী করছ? সে বলবে, আমি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য রুকু করছি।

কিন্তু এটা কি আসলে ইবাদাত হচ্ছে? না, কারণ ইসলামে এমন কোনো ইবাদাত নেই। সালাতের বাইরে রুকুর কোনো নিয়ম ইসলামে নেই। সে নিজে বানিয়ে বানিয়ে এটা করছে। সে একজন বিদআতি।

রুকু আর কিয়াম (দাঁড়ানো)-এর ব্যাপারটা অনেকটা একই রকম। সালাতের ভেতরে দাঁড়ানো একটি ইবাদাত। কিন্তু সালাতের বাইরে দাঁড়ানো হলে সেটাকে ইবাদাত গণ্য করা হয় না। আমি বা আপনি যদি এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াই এবং দশ মিনিট আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে কি সেটাকে ইবাদাত বলা যাবে? না। ইসলামে এমন কোনো ইবাদাত নেই। যদি কেউ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেটাকে ইবাদাত দাবি করে, তাহলে সেটা একটা বিদআত। দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিষয়।

কেউ এল, আর আপনি তার জন্য দাঁড়ালেন—এটা শিরক হিসেবে গণ্য হবে না। চাইনিয এবং জাপানিযরা মাথা নিচু করে ঝুঁকে একে অপরকে সম্ভাষণ জানায়। এটাকে দেখতে অনেকটা রুকুর মতো মনে হয়। কেউ যদি এমন করে, তাহলে সেটাকে শিরক বলা যাবে না। হ্যাঁ, এমন করা যথাযথ না। নিঃসন্দেহে এমন করা সঠিক না। সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ) তো সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য দাঁড়াননি। যদি কারও সম্মানে দাঁড়ানো যৌক্তিক হতো, তাহলে সেটা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্যই হতো। কিন্তু তাঁর জন্য সাহাবারা দাঁড়াননি। তাহলে আজকের পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ কিংবা অন্যান্যদের সম্মানের জন্য দাঁড়ানোর কী আছে?

তবে অনেক সময় মানুষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ায় না। ধরুন, অনেক দিন পর প্রিয় কোনো ভাই বা বন্ধুকে দেখলেন। আপনি তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, জড়িয়ে ধরলেন—এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে মানুষকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য দাঁড়ানো, একে রীতি বা প্রথা বানিয়ে ফেলা উচিত না। সঠিক না।

একইসাথে মনে রাখতে হবে, এটাকে শিরক বলা যাবে না। আমি ক্লাসে ঢুকলাম, আমার ছাত্ররা আমার সম্মানে উঠে দাঁড়াল। এটা কি শিরক? নিঃসন্দেহে এমন করা

সঠিক না, তবে এটাকে শিরকও বলা যাবে না। কারণ, দাঁড়ানো (ক্বিয়াম) কিংবা রুকু কোনো স্বতন্ত্র ইবাদাত না।

তাই কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য এই কাজগুলো করে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে না। তবে এখানে শর্ত হলো, সে ইবাদাতের নিয়্যাতে এই কাজগুলো করতে পারবে না। কেউ যদি কোনো নেতা বা রাজা-বাদশাহর জন্য দাঁড়ায় এবং তার অন্তরে ইবাদাতের নিয়্যাত থাকে, তাহলে সেটা শিরক। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে ইবাদাতের নিয়্যাতে এ কাজগুলি করে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে গেছে।

অন্যদিকে সুজুদের ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে, কারণ সুজুদ একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। সালাতের বাইরেও সুজুদ হতে পারে। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সিজদাহ করবে, তার আপাত হুকুম হবে, সে মুশরিক। যে ব্যক্তি কোনো মূর্তি, কোনো বাদশাহ কিংবা কোনো প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে সিজদাহ করে, সে মুশরিক। তার ওপর শিরকের হুকুম প্রযোজ্য হবে, যদি না তার কোনো বৈধ ওজর থাকে। যেমন : কেউ সিজদাহ দেয়ার সময় সে তার সামনে একটা ইট বা এ ধরনের কিছু দেখল। সে ভাবল এটা সাধারণ কোনো পাথর, তাই সেটাকে সুতরাহ হিসেবে নিল। কিন্তু দেখা গেল, এই পাথরটা আসলে একটা মূর্তি। এ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির ওপর শিরকের হুকুম আসবে না।

কাজেই এ আলোচনার উপসংহার হলো, কোনো লোক যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে রুকু বা ক্বিয়াম করে, কিন্তু সে রুকু-ক্বিয়ামকে ইবাদাত মনে করে না, তাহলে আমরা তাকে মুশরিক বলতে পারব না। যেহেতু রুকু স্বতন্ত্র কোনো ইবাদাত নয়।

অন্যদিকে সুজুদ স্বতন্ত্র একটি ইবাদাত। সালাতের বাইরে সুজুদ হতে পারে, কিন্তু সালাতের বাইরে কোনো রুকু নেই। তাই কেউ যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সিজদাহ করল, তখন সে এমন কিছু করল যা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। তাই এটি শিরক আকবর বলে গণ্য হবে।

দারস ৬

গত দারসে আমরা শিরকের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। আজকের আলোচনায় আমরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরকের আরও কিছু প্রকারের দিকে তাকাব।

কুরবানীর ক্ষেত্রে শিরক

কুরবানী বলতে আমরা এখানে পশু যবেহ্ করাকে বোঝাচ্ছি। কুরবানী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছুটা বলছি।

প্রথম ধরনের কুরবানী হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু কুরবানী করা। যেমন: হজ্বের পর ঈদুল আজহার সময় পশু যবেহ্ করা। আমরা এটা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করি। এটি একটি ইবাদাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এভাবে পশু কুরবানী দেয়া শ্রেষ্ঠতম ইবাদাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, কোনো অতিথি বা অনুষ্ঠানের জন্য পশু যবেহ্ করা। যেমন: ওয়ালিমা অথবা আকিকাহর জন্য পশু কুরবানী করা। এটিও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, একই সাথে এর সাথে বাড়তি কোনো উত্তম লক্ষ্য যুক্ত থাকে। যেমন: অতিথি বা আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন করা।

তৃতীয় প্রকার হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য পশু যবেহ্ করা। এটা হতে পারে জীবিত কিংবা মৃত কোনো মানুষের জন্য, জ্বিনের জন্য অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য। এ কাজের মাধ্যমে এমন বিনীত ভাব ও আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এ কাজ শিরক আকবর। এভাবে যবেহ্ করা পশুর গোস্ত হালাল না। আজ অনেক কথিত মাজারে এ ধরনের কুরবানী করা হয়। মানুষ, জ্বিন, জীবিত, মৃত, কোনো মূর্তি, কোনো কবর–যা কিছুর উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কুরবানী হোক না কেন, এটি শিরক আকবর। এবং এই গোস্ত খাওয়া হারাম। এটা ইজমা। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

'বলো, 'নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।" [সূরা আল আন'আম, ৬: ১৬২]

এই আয়াতে নুসুকি (نسكي) শব্দটি এসেছে। নুসুকি মানে আল্লাহর জন্য কুরবানী।

মহান (ﷻ) বলেছেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

'অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড়ো এবং নহর করো।' [সূরা আল কাউসার, ১০৮: ২]

এই আয়াতে নহর–ওয়ানহার (وَٱنْحَرْ)–অর্থ কুরবানী।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছে,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

'ওইসব লোকের ওপর আল্লাহর লানত হোক, যারা গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করে।'[১২৩]

তাওয়াফের ক্ষেত্রে শিরক

তাওয়াফ বা কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করা একটি ইবাদাত। এই আমল আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে করা যাবে না। এটা ইজমা। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য তাওয়াফ করল, সে শিরক আকবরে পতিত হয়েছে। আজ এ ধরনের শিরক হয়। এটা দুর্লভ কোনো ঘটনা না। অনেক জায়গায় এমন ঘটে। ভেবে দেখুন, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে কাবার চারপাশেও তাওয়াফ করে, তাহলে সেটাও শিরক আকবর হবে। তাহলে কেউ যদি কোনো ওলীর কবর তাওয়াফ করে, তাহলে সেটা কি শিরক আকবর না? অবশ্যই সেটা বড় শিরক। আজ পৃথিবীর অনেক মুসলিমপ্রধান দেশেও মানুষ এভাবে কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে।

আমার মনে আছে, একবার আমরা মিসরে গিয়েছিলাম। আমার বয়স তখন ১৩-১৪ এর মতো হবে। সালাত আদায়ের জন্য একটা মসজিদে গেলাম। পরে দেখা গেল সেই মসজিদের ভেতরে একটা কবর। এটা দেখে আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলাম। তখন লক্ষ করলাম, কিছু লোক সেই কবরের চারপাশে হাঁটছে, যেভাবে মানুষ কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। আমার বাবা খুব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। অল্পতে রাগেন না, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে গেলেন।

---

[১২৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭৮

মানুষগুলোর হাত ধরে বোঝানোর চেষ্টা শুরু করলেন, তারা যা করছে তা শিরক আকবর। কারণ, তাওয়াফ একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত এবং এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য করা যাবে না।

তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে শিরক

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'আর আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুমিন হও।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ২৩]

আল্লাহর ওপর ভরসা করা, তাওয়াক্কুল করা একটি ইবাদাত এবং এই আয়াত তার দলিল। যেমনটা আমরা বারবার বলেছি, ইবাদাত হতে হবে শুধু আল্লাহর জন্য। তা না হলে এটা শিরক হয়ে যাবে। ইবাদাতের কোনো অংশ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করা হয়, তাহলে সেটা শিরক আকবর হবে।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে ওঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।' [সূরা আল আনফাল, ৮: ২]

তাওয়াক্কুল দুই ধরনের হতে পারে।

প্রথমটি হলো এমন কোনো কিছুর জন্য সৃষ্টির ওপর ভরসা বা নির্ভর করা, যা দেয়ার বা করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। যেমন: অনেকে প্রয়োজন পূরণ, সুস্বাস্থ্য, বিজয়, রিযক এমনকি শাফা'আতের জন্য কবরবাসী মৃত কোনো ব্যক্তির ওপর ভরসা করে। এটা স্পষ্ট শিরক।

তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় প্রকার হলো আপাতভাবে ভরসা। যেমন : আপনি কোনো কিছুর জন্য এমন কারও ওপর ভরসা করলেন, যার সেই কাজটি করার সক্ষমতা আছে। যেমন আপনার বন্ধু অফিসে যাওয়া-আসার সময় আপনাকে সাথে করে নিয়ে যায়। আপনি অফিসে যাওয়া-আসার জন্য তার ওপর নির্ভর করেন। এটা শিরক না। যদি কারও কোনো কাজ করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে তার কাছে সেই ব্যাপারে সাহায্য

চাওয়া বা ভরসা করা শিরক না। আপনি জানেন যে, আপনার বন্ধু সকাল ৮টার সময় গাড়ি নিয়ে আসতে পারবে। আপনাকে অফিসে নামিয়ে দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তার ওপর ভরসা করা শিরক না। তবে একজন মানুষের ঈমান যত শক্ত হবে তত সে সৃষ্টির ওপর ভরসা করা কমিয়ে দেবে। যদিও সেটা জায়েয।

একটা উদাহরণ দিয়ে এ দুই ধরনের তাওয়াক্কুলের পার্থক্য পরিষ্কার করা যাক।

ধরুন, একজন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। এমন সময় পাশ দিয়ে একটা নৌকা যাচ্ছে। সাহায্যের জন্য সে নৌকার যাত্রীদের ডাকল। এই যে সাহায্যের জন্য ডাকা, তা অনেকটা দু'আর মতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এটা শিরক না। কারণ, ওই নৌকার যাত্রীদের তাকে বাঁচানোর সক্ষমতা আছে। তাঁরা ওখানে উপস্থিতও আছে। কিন্তু একই লোক যদি এমন কাউকে ডাকে যাকে সে ওলী মনে করে (জীবিত বা মৃত, মানুষ বা জ্বিন)–যদিও সে ওখানে উপস্থিত নেই–তাহলে এটি শিরক আকবর হবে।

এই হলো সংক্ষেপে শিরক আল-উলুহিয়্যাহর আলোচনা।

তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?

তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ নিয়ে পরবর্তী আলোচনাতে যাবার আগে একটা প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। অনেকেই এ প্রশ্ন করে থাকে। আমাদের ক্লাসেও এ প্রশ্নটা বারবার এসেছে। প্রশ্নটি হলো, তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?

আমি একদম প্রথম দারসে বলেছিলাম 'বাসমালাহ'-এর মাঝে আপনি তাওহিদের ৩টি প্রকার খুঁজে পাবেন।[১২৪] সূরা ফাতিহাতেও আপনি তাওহিদের ৩টি প্রকার পেয়ে যাবেন,

> ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
>
> 'আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রব।' [সূরা আল ফাতিহা, ১: ১]

এটি আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর সাক্ষ্য।

> ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
>
> 'আর রাহমান আর রাহীম।' [সূরা আল ফাতিহা, ১: ২]

এটি তাওহিদ আসমা ওয়াস সিফাতের সাক্ষ্য।

> إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

---

[১২৪] দ্রষ্টব্য : তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

'আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' [সূরা আল ফাতিহা, ১: ৪]

তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর সাক্ষ্য।

কুরআনের অন্য কিছু সূরার দিকে তাকানো যাক। সূরা নাসে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ

'বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের।' [সূরা আন নাস, ১১৪: ১]

এখানে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর কথা চলে এসেছে। রব হিসেবে আল্লাহ্ একক।

مَلِكِ ٱلنَّاسِ

'মানুষের অধিপতির।' [সূরা আন নাস, ১১৪: ২]

মালিক–আল্লাহর একটি সিফাত তথা বৈশিষ্ট্য। এটি তাওহিদ আসমা ওয়াস সিফাত। আল্লাহ্ তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহে একক ও অদ্বিতীয়।

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ

'মানুষের ইলাহের কাছে।' [সূরা আন নাস, ১১৪: ৩]

এটি তাওহিদ আল উলুহিয়্যাহ। ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্য।

সূরা মারইয়ামের এক আয়াতে তাওহিদের তিনটি দিকের কথা আপনি পাবেন। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

'তিনি আকাশ, যমীন আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক। কাজেই তুমি তাঁর ইবাদাত করো, আর তাঁর ইবাদাতে অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জানো?' [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৬৫]

দেখুন এই আয়াতে আছে,

'তিনি আকাশ, যমীন আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক...'

এখানে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর কথা বলা হচ্ছে।

'কাজেই তুমি তাঁর ইবাদাত করো, আর তাঁর ইবাদাতে অবিচল থাকো...'

এক আল্লাহর ইবাদাতের কথা বলা হচ্ছে। তাওহিদ আল উলুহিয়্যাহ।

'তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জানো?'

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এটি তাওহিদ আসমা ওয়াস সিফাত। এই এক আয়াত থেকে আমরা তাওহিদের তিনটি দিক সম্পর্কে জানতে পারছি।

এভাবে কুরআনের অন্যান্য আরও সূরাতে তাওহিদের তিনটি দিক পাবেন। আবার অনেক সূরাতে তাওহিদের কোনো নির্দিষ্ট দিকের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা আল-কাফিরুনে উলুহিয়্যাহর কথা বিশেষভাবে এসেছে। সূরা ইখলাসে আসমা ওয়াস সিফাতের কথা এসেছে। তেমনিভাবে সূরা নাসের মূল নির্যাস হলো রুবুবিয়্যাহ।

এভাবে তাওহিদের প্রকারভেদের উদ্দেশ্য হলো তাওহিদের শিক্ষা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা। বোঝানো। আগেরকার দিনে ছেঁড়াফাটা পোশাক পরা, মেষ চড়ানো বেদুইনও আরবী ভাষার ওপর এমন জ্ঞান রাখত, যাতে কুরআনের আয়াত শুনেই সে তাওহিদের সবগুলো দিক বুঝতে পারত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আরবী ভাষার ওপর আমাদের দখল কমেছে। তা ছাড়া উম্মাহর বিরাট অংশ আরবী বোঝে না। তাই মানুষকে বোঝানোর সুবিধার্থে এভাবে তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

এই শ্রেণিবিভাগ নিয়ে অনেকে খুব বিচিত্র কিছু কথা বলে। যেমন অনেকে বলে, তাওহিদকে এভাবে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা নাকি খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করার মতো! খ্রিষ্টানরা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে–পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ নাকি ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করার মতো। আমি নিজে অনেককে এমন কথা বলতে শুনেছি। কী বিচিত্র কথাবার্তা! আসলে এটা ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ)-এর প্রতি তাদের ঘৃণার ফল, রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তারা এসব কথা বলে ঘৃণার বশবর্তী হয়ে। অথচ এই দুজন স্পষ্টভাবে বলেছেন, এই শ্রেণিবিভাগের উদ্দেশ্য মানুষের সামনে সহজভাবে তাওহিদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করা।

তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব করেননি, ইবনু তাইমিয়্যাহও করেননি। আরও অনেক আগে উলামায়ে কেরাম তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। শ্রেণিবিভাগের বিষয়টি সম্ভবত সর্বপ্রথম এসেছে ইমাম আবু হানিফা (ﷺ)-এর রচনায়। হ্যাঁ, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে এভাবে শ্রেণিবিভাগ করেননি। কিন্তু তিনি আলাদাভাবে রুবুবিয়্যাহ এবং উলুহিয়্যাহর কথা বলেছেন। যেমন তাঁর কিতাব আল ফিকহুল আবসাতে আপনি দেখবেন তিনি বলছেন[১২৫],

وَاللهُ تَعَالَى يدعى من اعلى لَا من أَسْفَل لَيْسَ من وصف الربوبية والألوهية فِي شَيْء

'আর আল্লাহ তা'আলাকে ওপরের দিকে আহ্বান করা হয়, নিচের দিকে নয়।

---

[১২৫] ইমাম আবু হানীফাহ (ﷺ), আল ফিকহুল আবসাত, পৃষ্ঠা : ১৩৫, এই বাক্যাংশটি إِثْبَات الْعُلُوّ বা আল্লাহর সুউচ্চতার প্রতিপাদন শীর্ষক অধ্যায় রয়েছে। আগ্রহী পাঠক যদি এ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পড়তে চান, তাহলে নিম্নোক্ত লিংকে যেতে পারেন : https://nidaaulhaqq.files.wordpress.com/2017/04/al-fiqh-al-absat.pdf

নিম্নগামিতার সাথে রুবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহর কোনো সম্পর্ক নেই।'

তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ[১২৬] (ﷺ)-ও এ ধরনের আলোচনা করেছেন। ইবনু মান্দাহ[১২৭] (ﷺ) তাঁর রচিত কিতাবুত তাওহিদ গ্রন্থে এভাবে আলোচনা করেছেন। এসব ইবনু তাইমিয়্যাহর জন্মের শত শত বছর আগে কথা।

সূরা মুহাম্মাদের ১৯ নম্বর আয়াত :

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ

'কাজেই জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ভুলক্রটির জন্য।' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির আত-তাবারিতে শ্রেণিবিভাগের ইঙ্গিত এসেছে।[১২৮] ইবনু জারীর আত-তাবারি (ﷺ)-এর মৃত্যু হয় ৩১০ হিজরির দিকে। আবু জাফর আত-ত্বহাউয়ি[১২৯] (ﷺ)-এর জন্ম ২৩৮ হিজরির দিকে, তিনি আকীদাহ আত-ত্বহাউইয়্যাহতে তাওহিদের শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩০] ইবনু বাত্তাহ আল-

---

[১২৬] ইমাম আবু ইউসুফ (ﷺ) ছিলেন ইমাম আবু হানীফার প্রধানতম ছাত্র। তাঁর মূল নাম ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম আল আনসারি। জন্ম ১১৩ হিজরি, মৃত্যু ১৮২ হিজরি। ছিলেন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আব্বাসী খিলাফাতের প্রধান বিচারপতি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল খারাজ, আল আসার ও ইখতিলাফু আবি হানীফাহ ওয়ান ইবনু আবি লাইলা।

[১২৭] ইমাম ইবনু মান্দাহ (ﷺ)-এর মূল নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনু মান্দাহ। ছিলেন হাফিযুল হাদীস। জন্ম ৩১০ হিজরি, মৃত্যু ৩৯৫ হিজরি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : আল ঈমান, আত তাওহিদ, আত তারিখ, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, আল কুনা।

[১২৮] ইমাম তাবারি (ﷺ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة، ويجوز لك وللخلق عبادته، إلا الله الذي هو خالق الخلق، ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه

'হে মুহাম্মাদ, জেনে রাখুন, সৃষ্টির স্রষ্টা ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোনো মাবুদ নেই যার জন্য উলুহিয়্যাহ উপযুক্ত বা যার জন্য উলুহিয়্যাহ সঠিক। এমন কোনো মাবুদ নেই যার ইবাদাত করা আপনার ও অন্যান্য সৃষ্টির জন্য জায়েয। রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে বাকি সকলে তাঁর নিকট নতি স্বীকার করে।'-ইমাম ইবনু জারির আত-তাবারি (ﷺ), জামিউল বায়ান : ২২/১৭৩

[১২৯] ইমাম আবু জাফর আত-ত্বহাউই (ﷺ) ছিলেন হানাফী ফিকহের প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস, আকীদাহ বিশারদ ও মুফাসসির। তিনি ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ)-এর ঘনিষ্ঠতম ছাত্র ইমাম মুযানী (ﷺ)-এর ভাগিনা ছিলেন। জন্ম মিসরে ২৩৮ হিজরিতে মৃত্যু ৩২১ হিজরিতে। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে বিপুল পরিমাণ রচনা রেখে গিয়েছেন যার মাঝে অন্যতম হলো : আল আকীদাহ, ইখতিলাফুল উলামা, শরহু মুশকিলুল আসার, শরহু মা'আনিল আসার, আহকামুল কুরআন।

[১৩০] ইমাম ত্বহাউই (ﷺ)-এর লেখায় সরাসরি উলুহিয়্যাহ, আসমা ওয়াস সিফাতের নাম পাওয়া যায় না। তবে রুবুবিয়্যাহ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ

উকবারি[১৩১] (رحمه الله) তাঁর আল-ইবানাহ গ্রন্থেও এমন আলোচনা করেছেন। তারপর ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله) এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম (رحمه الله) আলোচনা করেছেন। তাঁদের পর আয-যুবাইদী[১৩২] (رحمه الله) তা'জুল আরুস গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আশ শানকীতি[১৩৩] (رحمه الله)-ও আদ্বওয়াউল বায়ান গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

কাজেই ইবনু তাইমিয়্যাহর আগেও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তাওহিদ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই শ্রেণিবিভাগ ইবনু তাইমিয়্যাহর আবিষ্কার না। বরং তাওহিদ ভেঙে ভেঙে বোঝানোর ক্ষেত্রে আগে থেকেই এ প্রবণতা ছিল।

একটা উদাহরণ চিন্তা করুন। আগেকার যুগে সাধারণ মানুষের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান ছিল। সময়ের সাথে সাথে তা কমতে থাকে। বিশেষ করে

'তাঁর জন্যই রয়েছে রুবুবিয়্যাহ'; পয়েন্ট : ১৫।
উলুহিয়্যার আলোচনায় তিনি বলেন,
ولا إله غيره
'আর তিনি ব্যতীত অপর কোনো ইলাহ নেই'; পয়েন্ট : ৪।
এরপর লাগাতার কয়েকটি ধারায় তিনি সিফাত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। দেখুন : তাখরিজুল আকীদাতিত ত্বহাউইয়্যাহ (মতন), তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله)।

[১৩১] ইমাম ইবনু বাত্তাহ (رحمه الله)-এর জন্ম ৩০৪ হিজরিতে, মৃত্যু ৩৮৭ হিজরিতে। তিনি হাম্বলীদের প্রধানতম আলিমদের একজন। মূল নাম উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ। জন্মস্থান উকবারার দিকে সম্পৃক্ত করে উকবারী বলা হয়। উকবারা টাইগ্রিস নদীর পূর্ব পারে বাগদাদ ও সামাররার মাঝে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদের নাম, যা বহুকাল আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব আস সুনান, আল ইবানাতুল কুবরা, আল ইবানাতুস সুগরা।

[১৩২] ইমাম মুর্তাদ্বা আয যুবাইদী (رحمه الله) ছিলেন ভাষাবিদ, অভিধানবেত্তা, মুহাদ্দিস ও বংশলতিকা বিশেষজ্ঞ। জন্ম ১৭৩২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বিলগ্রামে। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান ১৭৯০ সালে মিসরের কায়রোয়। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : তা'জুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামূস, আসানিদু কুতুবিস সিত্তাহ, ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ফি শারহি ইহইয়া উলুমিদ্দীন।

[১৩৩] ইমাম মুহাম্মাদ আমীন আশ শানকীতি (رحمه الله)-এর জন্ম ১৯০৫ সালে মৌরিতানিয়ার শানকীতে। মৃত্যু ১৯৭৪ সালে মক্কা মুকাররামায়। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক শিক্ষকদের একজন। এ ছাড়া রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী ও হাইয়্যাতুল কিবারিল উলামার সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে আছেন : শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম, হাম্মুদ বিন উক্বলা আশ শু'আইবী, হাম্মাদ আল আনসারি, আব্দুর রাহমান বিন আউদাহ, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন, আব্দুর রাহমান আল বাররাক, বাকার আবু যাইদ (رحمه الله)। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : আদ্বওয়াউল বায়ান ফি ইদ্বাহিল কুরআন বিল কুরআন, আল আসমা ওয়াস সিফাত নাক্বলান ওয়া আক্বলান, মুযাক্কারাতু উসূলিল ফিকহ আলা রাওদ্বাতিন নাযির। ইমাম আশ-শানকীতির ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, দারস ১২, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

সাধারণ আরবদের ক্লাসিকাল আরবী বা ফুসহা (فصحى)-এর সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় আরবী ভাষা এবং ব্যাকরণের নিয়মগুলো সাধারণ মানুষের সামনে বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমন না যে, নিয়মগুলো নতুন করে বানানো হয়েছে। নিয়মগুলো আগে থেকেই ছিল; পরে মানুষকে বোঝানোর জন্য সেটা সহজভাবে সূত্র আকারে আনা হয়েছে।

উসুলুল ফিকহের ক্ষেত্রে ঠিক এ বিষয়টিই হয়েছে। উসুলুল ফিকহের যে কিতাব ও নীতিগুলো এখন আমাদের সামনে আছে, সেভাবে কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ)-এর সময়ে ছিল না। কারণ, তখন এর দরকার ছিল না।

তাজউয়িদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটেছে। ইযহার, ইখফা, ইক্বলাব, ইদগ্বাম, আল মুদুদ–তাজউয়িদের এসব নিয়ম প্রথম প্রজন্মে দরকার ছিল না। তাঁদের কাছে এ বিষয়গুলো স্পষ্ট ছিল। তারা এগুলো জানতেন। এই বিষয়গুলো আলাদা আলাদা করে, ভেঙে ভেঙে শেখানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় পরে। ঠিক একই কথা তাওহিদের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে নতুন কিছু যুক্ত করা হয়নি। বরং বোঝার ও ব্যাখ্যার সুবিধার্থে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?

আমরা তিনটি শ্রেণিবিভাগের কথা জানি:

১. তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহ।

২. তাওহিদ আল আসমা ওয়াস সিফাত।

৩. তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ।

চতুর্থটি হলো তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ। অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে তাওহিদ।

আমি প্রথমে যে উলামায়ে কেরামের নাম বললাম (অর্থাৎ আবু হানিফা, ইবনু মান্দাহ, ইবনু জারীর), তাঁদের রচনাবলি থেকে মনে হয়, তারা তাওহিদের ৩টি শ্রেণির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবে ইবনুল কায়্যিমের কিতাবাদিতে দেখবেন তিনি স্বতন্ত্রভাবে তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহর কথা বলেছেন। আমার মনে হয়, তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ স্বতন্ত্র একটি শ্রেণি হিসেবে যারা চিহ্নিত করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে প্রথম দিককার একজন। এমনকি তাঁর কিতাবে আমি সরাসরি 'আল-হাকিমিয়্যাহ' শব্দও পেয়েছি। পরবর্তীকালে রচিত আরও কিছু কিতাবে আপনি তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহর কথা পাবেন।

তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় যখন কেউ কেউ এটাকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণি উপস্থাপন করতে শুরু করেন। সম্ভবত, আল্লাহর আইন ব্যতীত শাসনের বিষয়টি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার

জন্য অনেকে একে পৃথক একটি শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করেন। অর্থাৎ তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহকে স্বতন্ত্র, চতুর্থ শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করার কারণ ছিল আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা। তাওহিদের কোনো একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপের জন্য আলাদা শ্রেণিবিভাগ করার বিষয়টিও নতুন না। আগেকার প্রজন্মেও এমন ঘটেছে। যেমন: অতীতের অনেক উলামায়ে কেরাম তাওহিদকে দুই শ্রেণিকে বিভক্ত করেছিলেন। পরে প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনের কারণে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

তাওহিদের শ্রেণি আসলে কি ২টি নাকি ৩টি, এ প্রশ্ন সুলাইমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সুলাইমান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নাতি। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি খুব দামি একটা কথা বলেছিলেন। সুলাইমান ইবনু আব্দিল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন,

> ***'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ পাচ্ছ, ততক্ষণ একে দুই শ্রেণিতে ভাগ করছ না তিন শ্রেণিতে ভাগ করছ তা গুরুত্বপূর্ণ না।'***

যারা তাওহিদকে তিন শ্রেণির বদলে চার শ্রেণিতে ভাগ করেন, সমসাময়িক অনেক আলিম তাঁদেরকে মুবতাদি বা বিদআতি মনে করেন। আমার মতে, এমন মনে করা ভুল। তিনের বদলে চার শ্রেণিতে ভাগ করা বিদআত নয়। আমি নিজে যখন শেখাই তখন তাওহিদের তিনটি শ্রেণির কথা বলি। যেমনটা আপনাদের বলেছি। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব হলো তার ছাত্রদের উপযোগী করে উপস্থাপন করা। এটা শুধু তাওহিদের ক্ষেত্রে না; বরং সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমি আমার ছাত্র ও শ্রোতাদের উপযোগী করে বিষয়গুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করি। আরেকজন অন্যভাবে উপস্থাপন করতেই পারেন। এজন্য তাকে বিদআতি মনে করার কিছু নেই।

আমার মতে, রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ, আসমা ওয়াস সিফাত এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা অধিক উপযুক্ত। কারণ আল-হাকিমিয়্যাহর বিষয়টি এক দিক থেকে রুবুবিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আবার আরেক দিক থেকে উলুহিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনি যদি বলেন আল্লাহ (ﷻ) হলেন সমগ্র সৃষ্টির শাসনকর্তা, তাহলে এটি তাওহিদুর রুবুবিয়্যাহর অধীনে চলে আসে। আবার কেউ যদি বলে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা, একমাত্র আইন ও বিধান হিসেবে আল্লাহর শরীয়াহকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক, তাহলে এটি তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর অধীনে চলে আসে।

কাজেই আল-হাকিমিয়্যাহর মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়্যাহর কিছু দিক আছে আবার উলুহিয়্যাহর কিছু দিকও আছে। এটা অনেকটা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর নিয়মের মতো। অনেক আলিম বলেছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দাবি ৭টি। কেউ কেউ বলেছেন

৮টি। তাগুতের ওপর অবিশ্বাস তথা কুফর বিত-তাগুত যদিও ৭-এর অন্তর্ভুক্ত, তবুও অনেক আলিম একে আলাদাভাবে এনেছেন।[১৩৪]

আসলে দাওয়াহ এবং আকীদাহর শিক্ষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু বিষয়ে জোর দিতে হয়। সময়ের দাবিকে মাথায় রাখতে হয়। যেমন ইসলামী ইতিহাসের শুরুর দিকে সালাফগণ বলতেন, ঈমান হলো আমল, মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস। আমলের মধ্যে কথা ও কাজ দুটোই অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাস—এই হলো ঈমান।

পরে যখন মুরজিয়া[১৩৫] ফিরকার দৌরাত্ম্য দেখা দিলো, তখন সালাফগণ বলতেন

---

[১৩৪] কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ৮টি দাবি হচ্ছে :

(১) জ্ঞান—যাতে থাকবে না অজ্ঞতার লেশমাত্র, অর্থাৎ জেনেবুঝে কালিমার সাক্ষ্য দিতে হবে।

(২) সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এই সাক্ষ্য দিতে হবে।

(৩) এতে ইখলাস থাকতে হবে, যাতে থাকবে না শিরকের গন্ধমাত্র।

(৪) বিশুদ্ধ সত্যবাদিতা, যাতে থাকবে না নিফাক (মুনাফিকী) বা কপটতার গন্ধমাত্র।

(৫) আল্লাহর প্রতি এমন অগাধ ভালোবাসা, যাতে থাকবে না আল্লাহর প্রতি কিংবা আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়ের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা বা বিদ্বেষ।

(৬) এই কালিমাকে নির্দ্বিধায় প্রফুল্ল মনে এমনভাবে গ্রহণ করা, যাতে অস্বীকার বা বর্জন করার কোনো অবকাশ থাকবে না।

(৭) "لا إله إلا الله" এর দাবি ও চাহিদার প্রতি পূর্ণ বিনয় ও আনুগত্য প্রদর্শন, যাতে থাকবে না কোনোরূপ অহংকার বা নাফরমানির লেশমাত্র।

(৮) তাগুতসমূহকে অস্বীকার ও বর্জন করা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার ও বর্জন করা।

শাইখ বলছেন, কুফর বিত তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা, এটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি ও চাহিদা' এর অন্তর্ভুক্ত।

[১৩৫] মুরজিয়া (المرجئة) একটি ফিরকা বা দলের নাম, এরা খারিজীদের বিপরীত দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই শব্দের আবির্ভাব হয়েছে إرجاء হতে যার মানে বিলম্বিতকরণ, মূলতবিকরণ, স্থগিতকরণ। মুরজিয়াদের প্রসিদ্ধতম ব্যক্তি হচ্ছে জাহম বিন সাফওয়ান, মুকাতিল বিন সুলাইমান। মুরজিয়াদের সম্পর্কে ইমাম ইবনু উয়াইনাহ (ﷺ) বলেছেন, فَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ الْيَوْمَ فَهُمْ قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ। 'আজকালকার মুরজিয়া হচ্ছে তারা, যারা বলে ঈমান আমল বিনা কেবল কথার (সাক্ষ্যের) নাম।'-তাহযীবুল আসার :২/৬৫৯; ইরজার বিভিন্ন ধরন ও প্রকার আছে। সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের মুরজিয়াদের আকীদাহ উল্লেখ করা হলো :

১) ঈমান কেবল মারিফাতের নাম। মারিফাত বলতে অন্তরের দ্বারা চেনা।

২) ঈমান কেবল মুখের স্বীকৃতির নাম।

৩) ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম।

৪) ঈমান হচ্ছে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা (সত্যায়ন করা) এবং মুখে স্বীকার করা।

৫) ঈমান আনার পর কুফর করলেও কেউ কাফির হয় না।

৬) মুমিন গুনাহর কারণে জাহান্নামে যাবে না।

ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং দ্বীনের আরকানগুলোর আমল অর্থাৎ আমালুন বিল আরকান।[১৩৬] অর্থাৎ মুরজিয়াদের ফিরকা ও বিভ্রান্তির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে তারা আমলের জায়গায় আমালুন বিল আরকান বলতেন। আগে এটা বলা হতো না, কারণ আগে এ বিষটি আলাদা করে স্পষ্ট করার, এ নিয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়ার দরকার ছিল না। মুরজিয়াদের আবির্ভাব ও প্রসারের কারণে এ বিষয়টি পরিষ্কার করার এবং মুরজিয়াদের সাথে আহলুস সুন্নাহর পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য এমন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[১৩৭]

একইভাবে আজকের যুগে যেহেতু মানবরচিত আইন দিয়ে শাসনের বিষয়টি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই অনেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছেন। আর আল্লাহর শরীয়াহর বদলে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসনের বিষয়টি যে মহামারির চেয়েও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় কবরপূজা, কবরের ওপর সৌধ তৈরি, কবরের অধিবাসীর উদ্দেশ্যে দু'আ করা, পশু যবেহ করার মতো বিষয়গুলো মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই যুগে মূল সমস্যা ছিল কবর-সংক্রান্ত শিরক। আজকের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন। মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি বিশেষ

---

৭) আমল ঈমানের অংশ নয়।

৮) জুহুদ (ইচ্ছাকৃত অস্বীকার) ছাড়া কুফর নেই।

৯) তাকযিব (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) ছাড়া কুফর নেই। অর্থাৎ কুফর শুধু এই প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১০) কোনো কাজ সত্তাগতভাবে কুফর আকবর নয়।

১১) ঈমান বাড়েও না কমেও না, ইত্যাদি।

সালাফগণ মুরজিয়াদের খুব কঠোরভাবে রদ করেন। সাঈদ বিন জুবাইর (ﷺ) এদেরকে উম্মতের ইহুদী বলেছেন।-আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা : ৩৪১

যখন মুরজিয়া আলিম আব্দুল আযিয বিন আবি রুওয়্যাদ মারা যায় তখন সুফিয়ান আস সাওরি (ﷺ)-এর পাশ দিয়ে তার খাটলি নেয়া হয়। কিন্তু সে মুরজিয়া হওয়ায় ইমাম সুফিয়ান ও জনগণ তাঁর জানাযা পড়েননি।-ইমাম উকাইলী (ﷺ), আদ দ্বু'আফাউল কাবীর : ৩/৬

[১৩৬] অর্থাৎ দ্বীনের রুকনসমূহের ওপর আমল করা। যেমন : সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, হজ্ব করা, যাকাত দেয়া।

[১৩৭] যেহেতু মুরজিয়াদের মতে ঈমানের মাঝে আমলের কোনো অংশ নেই, তাই তাদের মতে আমল না করলে ঈমান কমে না; যা ছিল তা-ই থাকে। ফলে কেউ আমল চিরতরে ত্যাগ করলেও ততক্ষণ কাফির হবে না যতক্ষণ না সে মুখে নিজেকে নাস্তিক, খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু বা অন্য কিছু বলে দাবি না করছে। এর ফলে প্র্যাক্টিকাল কাফিররা সমাজে অবস্থান করে মুসলিমদের আকীদাহ ও আমল নষ্ট করে। কেননা এরা জীবনেও ইসলামের ওপর আমল করে না, কিন্তু মুখে নিজেদের মুসলিম দাবি করে। তাই তখন থেকেই সালাফরা এর ওপর জোর দিলেন যে, আরকানুল ইসলামের ওপর আমল জরুরি—আমল ঈমানকে বৃদ্ধি করে, আমল ত্যাগ ঈমানকে কমায়।

গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করা আবশ্যিক। তবে আমি মনে করি তাওহিদের তিন শ্রেণির ভেতরে থেকেই এ বিষয়টি আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা যায়। আমি এভাবেই শেখাই। কিন্তু কেউ চাইলে তাওহিদুল হাকিমিয়্যাহ তাওহিদের চতুর্থ একটি শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করে শেখাতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। যে এমন করছে সে মুবতাদি না। সে কোনো বিদআত করছে না। এটা কেবল শেখানোর আলাদা একটা স্টাইল।

শিরক আল-উলুহিয়্যাহর তৃতীয় প্রকার : আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক

শিরক আল-উলুহিয়্যাহর তৃতীয় প্রকার হলো শিরক আত-তা'আহ অথবা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক। এখানেও শিরকের অর্থ হলো এমনভাবে কারও বা কিছুর আনুগত্য করা, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا
>
> 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো (হক) ইলাহ নেই।' [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ৩১]

আদি ইবনু হাতিম (رضي الله عنه) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর গলায় ছিল সোনার একটি ক্রুশ। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন সূরা তাওবাহর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আদি (رضي الله عنه) তখন বললেন, তারা অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তো ধর্মযাজক আর সন্ন্যাসীদের ইবাদাত করত না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

> أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنَّهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئًا استحلُّوه ، وإذا حرَّموا عليهم شيئًا حرَّموهُ
>
> 'হ্যাঁ, যদিও তারা তাদের উপাসনা করত না, কিন্তু যখন এসব যাজক তাদের কোনো কিছুকে হালাল করে দিত, তারা সেটাকে হালাল মনে করত; আর যখন এরা কিছুকে তাদের জন্য হারাম করে দিত, ওরাও সেটাকে হারাম মনে করত (এটাই ইবাদাত)।'[১৩৮]

---

[১৩৮] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩০৯৫, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله)-এর মতে সকল

আর অনুসরণ করার মাধ্যমে তারা ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের ইবাদাত করেছিল। হারাম ও হালালের বিষয়ে আনুগত্য করা ইবাদাত। \ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) তাঁর মাজমু আল-ফাতাওয়ার ৭ম খণ্ডে এই আয়াত নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

'তারা তাদের আলিম ও সন্ন্যাসীদেরকে এভাবে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল যে, এসব আলিম ও সন্ন্যাসী আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে হালাল বললে আর হালালকৃত জিনিসকে হারাম বললে তারা সেটাই মেনে তাদের আনুগত্য করত। এটা দুভাবে হতো। প্রথমত, তারা জানত যে এসব আলিম ও সন্ন্যাসী আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করছে; কিন্তু এরপরও তারা এই পরিবর্তনই কামনা করত এবং তাদের নেতাদের আনুগত্য করে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসকে হারামকরণ ও হারামকৃত জিনিসকে হালালকরণকে বিশ্বাস করত। অথচ তারা জানত যে, এটা রাসূলদের আনীত দ্বীনের বিরোধী। এটা হচ্ছে কুফর, এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শিরক করা হয়েছে, যদিও তারা এসব আলিম বা সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে না, তাদেরকে সিজদাহ করে না।

কাজেই যে ব্যক্তি দ্বীনের বিপরীত কোনো বিষয় অনুসরণ করে–অথচ সে জানে যে এটা দ্বীনের বিরোধী–এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীত বক্তব্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুশরিকদের মতোই মুশরিক।'[১৩৯]

এটি হলো এ বিষয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্যের সারাংশ। আমি বর্তমান সময়ের জন্য ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর বক্তব্যকে কিছুটা পরিমার্জিত করে বলব,

যে গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো মানবরচিত আদর্শ কিংবা নিয়মের ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করে (হালাল-হারাম ঠিক করে) এবং জানে যে, সে আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করছে, সে শিরক করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো মানবচরিত আদর্শের ইবাদাত করছে। এসব আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণের মাধ্যমে সে শিরক করেছে, যদিও সে গণতন্ত্র কিংবা মানবরচিত আইনের কাছে দু'আ করে

সনদ মিলিয়ে হাসান।-আস সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং : ৩২৯৩

[১৩৯] মাজমু আল-ফাতাওয়া : ৭/৭০। মূল আরবী :

وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِينَ اللهِ فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًا - وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ - فَكَانَ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الدِّينِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ خِلَافُ الدِّينِ وَاعْتَقَدَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ دُونَ مَا قَالَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ مُشْرِكًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ.

না, কিংবা সিজদাহ করে না।

দার্শনিক ও মর্ডানিস্টরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে। কুরআন ও সুন্নাহর ওপর তারা নিজেদের আকল ও চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়। যুক্তি আর মনের মাপকাঠিতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বিচার করে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আকল, আর বিচারবুদ্ধির ইবাদাত করে। যদিও তারা এগুলোর প্রতি রুকু-সিজদাহ করে না।

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের কিছু বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক।

প্রথম প্রকার : এমন কোনো লোকের কথা চিন্তা করুন, যে মনে করে আল্লাহর আইনের চেয়ে অন্য কোনো আইন উত্তম। এই লোক মুশরিক। সে শিরক আকবর করেছে। তার অবস্থান কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

‘তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৫০]

এবং তিনি বলেছেন,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ

‘আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন?’ [সূরা আত তীন, ৯৫: ৮]

এগুলো আসলে রেটোরিকাল প্রশ্ন। মহান আল্লাহ এ প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে সত্য জানিয়ে দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন কোনো ব্যক্তি, যে মনে করে আল্লাহর নাযিল করা আইনের বদলে অন্য আইন দিয়ে শাসন করা জায়েয। লক্ষ করুন, অন্য আইনকে সে আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম মনে করছে না। সে কেবল মনে করছে অন্য আইন দিয়ে শাসন করা জায়েয। এ ব্যক্তিও শিরক আকবর করল। কারণ আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা নিষিদ্ধ, এটি কুরআনের আয়াত, রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় প্রকার : কুরআন ও সুন্নাহতে যা এসেছে তার বদলে অন্য কোনো আইন বা শরীয়াহ প্রণয়ন করা। এই আইন দিয়ে বিচার করা জায়েয কিংবা এই আইন আল্লাহর

আইনের সমকক্ষ কিংবা তার চেয়ে উত্তম মনে করা। এটিও শিরক আকবর। আল্লাহ যে আদেশ দিয়েছেন সে তা লঙ্ঘন করে নিজে আইন প্রণয়ন করল।

চতুর্থ প্রকার : যে শাসক আল্লাহর আইনের বদলে অন্য আইন দিয়ে শাসন করে, তাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়া কিংবা তার আনুগত্য করা। যে এমন করল সে শিরক করল। স্বেচ্ছায়, বুঝেশুনে এমন কারও শাসনকে মেনে নেয়ার অর্থ তাকে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর স্থান দেয়া, আল্লাহর আইনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, মানবচরিত আইনকে আল্লাহর আইনের সমকক্ষ কিংবা এর চেয়ে উত্তম ভাবা। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।' [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৪৪]

এবং তিনি বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ

'তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।' [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৯]

এ বিষয়ে আরও অনেক লম্বা আলোচনা করা সম্ভব। তবে আমি এখানে আলিমদের আলোচনার সারমর্ম সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি।

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের আলোচনায় একটা বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি পড়েই কেউ কেউ মানুষকে এলোপাথাড়ি কাফির, মুশরিক বলতে শুরু করে। আল্লাহ চাইলে আমার এ ব্যাপারে একটি বই লেখার ইচ্ছা আছে। তবে আমি এখানে সংক্ষেপে বলছি।

পশ্চিমে অবস্থান করা মুসলিমদের অনেক সময় কিছু বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। যেমন: চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলার জন্য কেউ আদালতের কাছে গেল। অথবা কেউ তার সন্তানের কাস্টডি পাওয়ার জন্য আদালতের কাছে যেতে বাধ্য হলো। যদি অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস থাকে এবং বাধ্য হয়ে চরম ও দুর্বিষহ বিপর্যয় থেকে নিজের অধিকার রক্ষা করতে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে পশ্চিমে থাকা কোনো মুসলিম এমন করলে তাকে মুশরিক বলা যাবে না। তবে মনে রাখবেন এটা শুধু এমন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ভয়ংকর কোনো দুর্যোগ, মারাত্মক পর্যায়ের কোনো বিপদ তার ওপর এসেছে এবং সে কেবল তাঁর বৈধ শার'ঈ

অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

ধরুন, সোশ্যাল সার্ভিস কারও সন্তান ছিনিয়ে নিচ্ছে। সে জানে, তাঁর সন্তানকে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে গেলে সে কাফির হিসেবে বেড়ে উঠবে। সে কেবল তাঁর সন্তানকে ফেরত চায়, দ্বীনের ওপর বড় করতে চায়। অভিভাবক হিসেবে তাঁর অধিকার রক্ষা করতে চায়। তাঁর মধ্যে তাগুতকে অস্বীকার এবং এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের ঈমান পুরোপুরি আছে। এমন অবস্থায় সে যদি বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে তাকে মুশরিক বলা যাবে না।

স্বয়ং নবী (ﷺ) মুতাইয়্যিবিনের চুক্তির সাক্ষী ছিলেন। তিনি এ চুক্তির প্রশংসা করেছিলেন। এ চুক্তির নাম নেয়া হয়েছে তাইয়্যিব শব্দ থেকে। যার অর্থ ভালো, কল্যাণ। এ চুক্তি হিলফুল ফুযুল নামেও পরিচিত।

নবী (ﷺ) বলেছিলেন,

> شهِدْتُ غُلامًا مع عُمومَتي حِلفَ المطَيَّبِينَ، فما أُحِبُّ أنَّ لِي حُمُرَ النَّعَمِ وإنِّي أنْكُثُه
>
> 'আমি আমার চাচাদের সাথে আল মুতাইয়্যিবিনের চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি ছিলাম বালক। আমার কাছে একটা লাল উট থাকবে আর (এর বিনিময়ে) আমি সেই চুক্তি ভঙ্গ করব, তা আমি মোটেও পছন্দ করি না।'[১৪০]

এ চুক্তি হয়েছিল নবুওয়্যাতের আগে। চুক্তিটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইবনু জা'দানের ঘরে, বনু হিশাম এবং বনু যাহরাহ গোত্রের মধ্যে। নবী (ﷺ) এ চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন। এ চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল বঞ্চিত ও মজলুমদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া। এ চুক্তির মাধ্যমে কিছু আইন তৈরি করা হয়েছিল, যেগুলো মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে ব্যবহার করা হতো। এবং মানুষ এই ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, জাহিলিয়্যাতের যুগে এই চুক্তির সময় উপস্থিত থাকার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাগুতের আইনকে মেনে নিয়েছিলেন বা পরবর্তী সময় এ চুক্তি প্রশংসা করার মাধ্যমে তিনি (ﷺ) তাগুতের আইনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আবিসিনিয়ায় আন-নাজ্জাশীর আদালতে গিয়েছিলেন। সেটা কি জোরপূর্বক ছিল? না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মক্কায় ফেরত যাবার সুযোগ ছিল। তাঁদের ওপর কোনো জোরজবরদস্তি এখানে ছিল না।

সাহাবী আল-হাজ্জাজ ইবনু আল্লাত আস-সুলামি (রা.)-এর ঘটনা আরও স্পষ্ট। এই

---

[১৪০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৬৭৬, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহ.)-এর মতে সনদ সহীহ।

সাহাবী ছিলেন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী। খাইবারের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য মক্কায় থাকতে গেলেন। মক্কায় তাঁর অনেক সম্পদ ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিছুদিন কুরাইশের মাঝে অবস্থান করে, তাদেরকে নরম করে নিজের সম্পদ ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ নিজের সম্পদ মক্কা থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তাকে কুরাইশের নেতাদের কাছে গিয়ে কিছু নরম কথা বলতে হবে। তিনি বলেছিলেন,

> 'হে রাসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন যাতে আমি ফিরে গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে স্বীয় সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারি। কেননা সে যদি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে, তাহলে আর তার কাছ থেকে কিছুই আনতে পারব না।'

এমনকি সাহাবী আল-হাজ্জাজ (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এও বলেছিলেন,

> 'হে রাসূলুল্লাহ, (কুরাইশদের মন জয় করার জন্য) আমাকে অনেক কিছুই বলতে হবে।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে যা মন চায় বলার অনুমতি দিলেন।[১৪১]

আসলে এ ব্যাপারে আরও অনেক আলোচনা করা যায়। এটা একটা স্বতন্ত্র বইয়ের আলোচনা। এ বিষয়ে দুটি মত আছে–সেগুলো নিয়েও আরও অনেক কথা বলা যায়। আমার এ কথাগুলোর বলার উদ্দেশ্য আপনাদের তাগুতের আদালতে বিচার চাইতে যেতে উৎসাহিত করা না। আমি এমন কিছু বলছি না। আমি শুধু অত্যন্ত গুরুতর কিছু ব্যতিক্রমের কথা বলছি। আমি এমন অবস্থার কথা বলছি, যখন ব্যক্তির অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানের বুঝ থাকে, তাওয়াগীতের প্রতি ঘৃণা থাকে এবং অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ফলে সে চরম ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তাগুতের আদালতে যাওয়া ছাড়া অধিকার আদায়ের আর কোনো বিকল্প তাঁর সামনে থাকে না। এ ক্ষেত্রে কোন কোন পরিস্থিতি দ্বারুরাহ (ضرورة)–বা একান্ত প্রয়োজন–হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়ে ঢালাওভাবে কিছু বলা যাবে না। এ ধরনের ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলোতে প্রত্যেক পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট বিপদ ও বিপর্যয়কে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এ ছাড়া যেকোনো সমস্যা বা বিপদের ক্ষেত্রে এভাবে চিন্তা করা যাবে না। খুব বড় ধরনের কোনো বিপদ হতে হবে। একই সাথে এটাও শর্ত যে, ওই ভয়ানক মোকাবেলার জন্য তাগুতের আদালতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যদি ভয়ানক বিপদও তাগুতের আদালতে না গিয়ে কোনোভাবে মোকাবেলা করা যায় অথবা ধৈর্য ধরা সম্ভব হয়, তাহলে আদালতে যাবেন না। সবর করুন, আল্লাহর কাছে প্রতিদান চান।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।'
[সূরা আত তালাক, ৬৫: ২]

তবে অন্য সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে, কোনোভাবেই সহ্য করা সম্ভব না হলে, ব্যক্তির অন্তরে যদি পরিপূর্ণ ঈমানের বুঝ থাকে, তাওয়াগীতের প্রতি ঘৃণা থাকে, এবং তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ফলে সে চরম ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়, তাহলে সে বাধ্য হয়ে তাগুতের আদালতে গেলে তাকে মুশরিক বা কাফির বলা যাবে না।

মাস কয়েক আগে, কিছু ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁদের পরিচিত এক ভাই তাঁর মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্য আদালতে গিয়েছিলেন। তিনি এমন এক মহিলার কাছ থেকে নিজের মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্য লড়ছিলেন, কাস্টডি পেলে যে নিশ্চিত মেয়েকে কাফির হিসেবে বড় করবে। নিজের মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্য আদালতে যাওয়ার কারণে এই ভাইকে তাদের পরিচিত আরেক ভাই কাফির-মুশরিক বলছিল। দলিল হিসেবে ব্যবহার করছিল ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের কিছু উক্তিকে। কিছু ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করে তার সাথে কথা বলার অনুরোধ করলেন।

আমি তার সাথে কথা বললাম। সে বারবার সেই উক্তিগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকল। কুফর আর তাগুতের কথা বলল। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, তারা কোনো কিছুর শুধু খোলসটুকু নেয়। খোলসের ভেতরে কী আছে সেটা তারা জানে না। কুফর বিত তাগুতের কথা বারবার বললেও, সে কেবল খোলসটাই দেখছিল। শেষমেশ আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কোন আলিমদের অনুসরণ করো? কোন আলিমদের তুমি গ্রহণযোগ্য মনে করো?

সে বলল, প্রথমে আপনি, তারপর শাইখ আলি আল-খুদাইর।

আমি বললাম, আমার কথা বাদ দাও। এ ব্যাপারে শাইখ আলি আল-খুদাইর কী বলেছেন তা ভালোমতো পড়ে দেখো। তিনি তাঁর একটি কিতাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তাকফিরের ব্যাপারে শাইখ আলি আল-খুদাইরের ফাতওয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দলিল দ্বারা পরিপূর্ণ। অত্যন্ত চমৎকার। আল্লাহ (ﷻ) কারাগার থেকে তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আমাদের সব বন্দী মুসলিম ভাইবোনের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

সাধারণত যেকোনো বিষয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ)-এর অবস্থান সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাঁদের লেখা আর উপস্থাপনার ধাঁচ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাঁদের সম্পূর্ণ রচনাবলি

গভীরভাবে না পড়ে আউট অফ কনটেক্সট কোনো উদ্ধৃতি দেখে খুব সহজেই ভুল কোনো উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লোকে তাঁদের রচনাবলি থেকে আউট অফ কনটেক্সট কিছু উদ্ধৃতি পড়ে মানুষকে এলোপাথাড়ি তাকফির করা শুরু করেছে। বিশেষ করে ইবনু তাইমিয়্যাহর ক্ষেত্রে এ বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে মাথায় রাখা দরকার। যে তাঁর পূর্ণাঙ্গ রচনা পড়েনি, তাঁর মাজমু পুরোপুরি পড়েনি, সে ইবনু তাইমিয়্যাহর রচনাবলি থেকে ইচ্ছেমতো কয়েক লাইন উদ্ধৃত করার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। সে যে-ই হোক না কেন। যত বড় আলিম হোক না কেন। যারা ইবনু তাইমিয়্যাহর রচনাবলি গভীরভাবে, বিস্তারিতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পড়েনি, তাদের কাছে মনে হবে অনেক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সাংঘর্ষিক। যেমন: মধ্য শা'বানের রাতের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান। যে বিস্তারিত তাঁর রচনাবলি পড়েনি, তাঁর কাছে মনে হবে এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়্যাহর অবস্থান পরস্পর সাংঘর্ষিক।

আজ এমন অনেক লোক পাবেন যারা কখনো ইবনু তাইমিয়্যাহর মাজমু আল-ফাতাওয়ার একটি খণ্ডও খুলে দেখেনি। কোনো এক খণ্ড আগাগোড়া পড়া তো অনেক দূরের কথা। এমন অনেক লোক আছে যারা আরবী পড়তেও পারে না। কিন্তু সে মাজমু আল-ফাতাওয়ার কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদ কিংবা অনুবাদের অনুবাদ পড়ে তাকফির আর শিরক নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। এলোপাথাড়ি তাকফির করে। এ কারণেই ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের রচনাবলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। যেমনটা আমরা করছি। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের লেখার স্টাইল, লেখার ধাঁচ নিয়েও বই লেখা হয়েছে। এজন্যই আমি আগেও বলেছি, এমন উলামায়ে কেরাম আছেন যারা তাঁদের জীবনের অনেক বছর এই মহান আলিমদের রচনাবলি অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করার কাজে ব্যয় করেছেন। তারা আসলে কী বলেছেন, যেসব বক্তব্য আপাতভাবে সাংঘর্ষিক সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হবে, কোন পরিস্থিতিতে কোন কথা বলা হয়েছিল—এ সবকিছু নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন।

উলামায়ে কেরামের কথা উদ্ধৃত করার সময় কোন প্রেক্ষাপটে কোন পরিস্থিতিতে তারা কথাগুলো বলেছিলেন সেটা দেখুন। তাঁদের কথাকে সেই পরিস্থিতির সাথে মেলান। আপনার পছন্দের পরিস্থিতির ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। আর যে বিষয়ে ইলমের মহিরুহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, সে বিষয়ে অন্য কোনো মুসলিমকে তাকফির করবেন না। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়, যখন তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং এই ব্যক্তির অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানের বুঝ আছে, তাওয়াগীতের প্রতি ঘৃণা আছে এবং তাগুতের আদালতে যাওয়া ছাড়া অধিকার আদায়ের আর কোনো উপায় তাঁর নেই, তাহলে সে আদালতে যাওয়ার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না। যারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান তারা শাইখ আলি আল-

খুদাইরের আলোচনা দেখতে পারেন। আর আল্লাহ চাইলে আমি এ ব্যাপারে একটি বই লিখব।

পঞ্চম প্রকার : শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের ৪টি ধরণের কথা বলেছি। পঞ্চম উদাহরণ হলো, আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসনের দিকে আহ্বান করা। আজ যেমন এমন আইনের দিকে আহ্বান করা হয়–যা নারীদের হিজাব ছাড়া বাইরে বের হতে দেয়, যা সুদকে বৈধ করে। অথবা এমন আইন যা চার বিয়েকে অবৈধ করে। এ ধরনের কোনো আইনের দিকে আহ্বান করা শিরক আকবর। যে এ কাজ করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। কারণ এ ধরনের আহ্বান কেবল ওই লোকই করতে পারে, যার অন্তরে মানবরচিত আইনের ব্যাপারে মুগ্ধতা আছে এবং যে এসব আইনকে আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম মনে করে। এটি আল্লাহর আইনের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করে। এটি শিরক আকবর। আর যেসব মুসলিম নামধারী লোক এ ধরনের কাজ করে, তারা খুব সম্ভবত মুনাফিকও। কারণ এরা নিজেকে মুসলিম দাবি করবে, মুসলিমদের সাহায্যকারী দাবি করবে, জুমার সালাত আদায় করার ছবি দেখিয়ে নিজের ঈমানের প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করবে। আবার শিরক আকবর করবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। একজন প্রকৃত মুজতাহিদ[১৪২] যখন শরীয়াহর দলিল-প্রমাণের আলোকে কোনো কিছু হালাল বা হারাম হবার ফাতওয়া দেন, তখন সেটা ভিন্ন ব্যাপার। একজন মুজতাহিদ হয়তো ভুলবশত কোনো হারাম জিনিসকে হালাল বলতে পারেন বা হালালকে হারাম বলতে পারেন। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রাসঙ্গিক কোনো হাদীস হয়তো সেই মুজতাহিদের কাছে পৌঁছেনি, তাই হারাম একটি বিষয়কে তিনি হালাল গণ্য করেছেন। একজন মুজতাহিদের এ ধরনের ভুল কুফর বা শিরক না। এটা গুনাহও না, উল্টো একজন মুজতাহিদের ভুল যদি আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে তিনি এর জন্য একটি পুরস্কার পাবেন।[১৪৩] কিন্তু যে জেনেশুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পথ বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে, সে শিরক করেছে।

---

[১৪২] মুজতাহিদ : মুজতাহিদ শব্দের অর্থ যিনি ইজতিহাদ করেন। ইজতিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয়ে নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যয় করা।-কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন : ১/১৯৭ পারিভাষিকভাবে বোঝায় যন্নী শার'ঈ বিষয়ে অর্থাৎ যে বিষয়ে সুস্পষ্ট সুদৃঢ় সুনিশ্চিত বিধান নেই সে বিষয়ে যখন কোনো ফকীহ নিজস্ব সামর্থ্য তথা জ্ঞানকে ব্যয় করে গবেষণা করেন, তাকে ইজতিহাদ বলে।-আল মাউসুওয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুওয়াইতিয়্যাহ : ১/৩১৬

[১৪৩] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে বিচার করে, এতে যদি সে সঠিক ফয়সালা দেয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান। আর যখন সে ইজতিহাদ করে বিচার করে, কিন্তু এতে ভুল করে, তখন তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।'-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৭১৬

মাজমু আল-ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله) বলেছেন,

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ – الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ – كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

'যখন কোনো মানুষ হারামকে হালাল বানায় এবং এ বিষয়কে গ্রহণ করে নেয়; কিংবা যখন কেউ হালালকে হারাম বানায় এবং তাকে গ্রহণ করে নেয়, সে ফকীহগণের ঐকমত্যে কাফির মুরতাদ।'[১৪৪]

মাজমু আল-ফাতাওয়ার পঁয়ত্রিশতম খণ্ডে তিনি আলিমদের কথাও এনেছেন।

ومَتى تَرَكَ العَالِمُ ما عَلِمَه، من كتاب الله، وسُنَّةِ رسولِه، واتَّبع حُكمَ الحاكمِ المخالف لحُكم اللهِ ورسوله.. كان مُرتدًّا كافرًا! يَستحقُّ العقوبةَ في الدنيا والآخرة

'যদি কোনো আলিম তার কুরআন ও সুন্নাহর ইলম বাদ দিয়ে এমন শাসকের অনুসরণ করে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আইনের বিরোধী, তাহলে সেই আলিম মুরতাদ কাফির। সে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত।'[১৪৫]

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার তেরোতম খণ্ডে ইমাম ইবনু কাসির (رحمه الله) বলেছেন,

من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين

'যে ব্যক্তি খাতিমুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত বিচারকে পরিত্যাগ করে এবং এ ছাড়া অন্য কোনো রহিত শরীয়াহ দ্বারা বিচার চাইতে যায়, সে কাফির হয়ে যায়। তাহলে সেই ব্যক্তির বিধান কী হবে, যে ইয়াসিক[১৪৬] দ্বারা বিচার চাইতে আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং একে ইসলামী শরীয়াহর ওপর প্রাধান্য দেয়? যে এই কাজ করবে, মুসলিমদের ইজমা মোতাবেক সে কাফির।'[১৪৭]

---

[১৪৪] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله), মাজমু আল-ফাতাওয়া : ৩/২৬৭

[১৪৫] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله), মাজমু আল-ফাতাওয়া : ৩৫/৩৭২-৭৩

[১৪৬] ইয়াসিক বা ইয়াসসা হচ্ছে চেঙ্গিস খান কর্তৃক জারিকৃত মঙ্গোল সাম্রাজ্যের আইননামা। এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন : ইয়াসিক, ইয়াসসা, জাযাগ প্রভৃতি। এটি মূলত মৌখিক আইন সংকলন যার নির্দিষ্ট লিখিত কোনো সংকলন পাওয়া যায়নি। বুখারা শহরের চেঙ্গিস খান এই আইন জারি করেন এবং গোটা সাম্রাজ্যে এর বিস্তারের উদ্যোগ নেন। এই কাজে নিয়োগ করা হয় তার দ্বিতীয় পুত্র চাগাতাই খানকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কূটনৈতিক হ্যারল্ড ল্যাম্ব তার *Genghis Khan: The Emperor of All Men* গ্রন্থে এই আইন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

[১৪৭] ইমাম ইবনু কাসির (رحمه الله), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৩/১১৯

ইবনু কাসির (رحمه الله) এখানে কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে তাওরাত ও বাইবেলের আইন গ্রহণ করার কথা বলছিলেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহ বাদ দিয়ে কেউ যদি বাইবেল বা তাওরাতের আইন অনুসরণ করে, তাহলে সে কাফির। যদিও বিকৃত হবার আগে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আইন ছিল। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর শরীয়াহ নাযিল হবার পর বাইবেল ও তাওরাতের আইন রহিত হয়ে গেছে। তাই এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া সত্ত্বেও যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়াহ বাদ দিয়ে এগুলোর অনুসরণ করবে সে কাফির। তাহলে ওই লোকদের কী অবস্থা, যারা মানুষের বানানো অন্য আইন দিয়ে শাসিত হতে চায়? এরা কাফির, এবং এটা ইজমা। এটা হলো ইমাম ইবনু কাসিরের বক্তব্য।

বেশ কিছু দলিল নিয়ে আলোচনা করার পর আদ্বওয়াউল বায়ানে শাইখ আশ-শানক্বীতি (رحمه الله) চমৎকার একটি কথা বলেছেন। এ কথাটি আমার খুবই পছন্দের। তিনি বলেছেন,

'সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হলো, যারা শয়তানের প্রণীত এবং মানুষের মুখে প্রকাশিত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে ওই আইনের বদলে, যার রচয়িতা হলেন আল্লাহ এবং যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর মুখে–তাদের কুফর এবং শিরকের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে শুধু ওই ব্যক্তি সন্দিহান হবে, যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি ওয়াহির উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন।'[১৪৮]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رحمه الله) সূরা নিসার এ আয়াত উল্লেখ করেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে।' [সূরা আন নিসা, ৪: ৬৫]

তারপর বলেছেন,

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم،

'আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেসব লোকের ঈমান থাকাকেই অস্বীকার করেছেন, যারা নিজেদের বিরোধ-মীমাংসায় নবী (ﷺ)-কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ

[১৪৮] আদ্বওয়াউল বায়ান : ৪/৯০-৯২

করে না। আল্লাহ (ﷻ) এই নেতিবাচকতার কথা বারবার উল্লেখ করে ও কসম খেয়ে দৃঢ়ভাবে তাদের ঈমান থাকাকে নাকচ করেছেন।'[১৪৯]

এ নিয়ে আরও অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, তবে আপাতত মূল আলোচনার সারাংশ হিসেবে এটুকু চলবে।

উসূলুস সালাসাহর লেখকের উত্থাপিত প্রমাণ

উসূলুস সালাসাহর লেখক নিচের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

'আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।' [সূরা আল জ্বিন, ৭২: ১৮]

আমাদের আলোচনায় বেশ কয়েকবার এই আয়াতের কথা এসেছে। তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর মূল নির্যাস এ আয়াতে উঠে এসেছে।

এ আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

وَأَنَّ

ওয়া আন্না।

এখানে 'আন্না' হলো তাওকিদ। অর্থাৎ আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেন, মসজিদ হলো কেবল আল্লাহর জন্য। প্রশ্ন হলো, এখানে আল্লাহ কেন মসজিদের কথা বললেন? মসজিদ বলার মাধ্যমে এখানে দুই ধরনের ইবাদাতের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা বলেছিলাম ইবাদাত দুই ধরনের, সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া–অর্থাৎ দু'আ আত-তালাব। আরেকটি হলো অন্য সব ধরনের ইবাদাত–দু'আ আল-ইবাদাত। যেমন: সালাত, ইলম শিক্ষা ইত্যাদি। এ দুই ধরনের ইবাদাতই আমরা মসজিদে করে থাকি। অর্থাৎ এ আয়াতে বলা হচ্ছে, মসজিদে কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করবে এবং মসজিদের বাইরেও কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করবে।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবো।' [সূরা আল গাফির, ৪০: ৬০]

এখানে দু'আ বলতে দু'আ আত-তালাব বা দু'আ আল-মাসআলা (دعاء المسألة)

---

[১৪৯] রিসালাতু তাহকিমিল কাওয়ানিন।

বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ দু'আ করছে, 'হে আল্লাহ, আমাকে অমুক জিনিস দিন'। তবে কিছু আলিম বলেছেন, এ আয়াতে দু'আ বলতে সব ধরনের ইবাদাতকে বোঝানো হয়েছে।

যদি এ আয়াতে দু'আ আত-তালাব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে বলা হচ্ছে, আমার কাছে চাও—তুমি যা চাও আমি তা দেবো। যদি এখানে দু'আ আল-ইবাদাহ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ আয়াতে বলা হচ্ছে—আমার কাছে চাও, আমি পুরস্কার দেবো।

সূরা জ্বিনের আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

'আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।' [সূরা আল জ্বিন, ৭২: ১৮]

এখানে দুই ধরনের ইবাদাতের কথা এসেছে। অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের উপাসনালয়ে শিরক করত। তাই আল্লাহ আমাদের বলছেন, ইবাদাতের স্থানে শিরক না করতে এবং এর বাইরেও শিরক না করতে। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, এ আয়াতে মসজিদ অর্থ সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। কারণ নবী (ﷺ)-এর হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন,

وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ

'সারা পৃথিবীর মাটিকে আমার জন্য মসজিদ (নামাযের জায়গা) এবং পবিত্রতার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট (যেকোনো স্থানে) নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়।'[১৫০]

তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, পুরো পৃথিবী আল্লাহরই (পুরো পৃথিবী মসজিদ), তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত কোরো না।

সাইদ ইবনু যুবাইর[১৫১] (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَٰجِدَ

'ওয়া আন্না মাসাজিদ' বলতে সুজুদের অঙ্গগুলোক বোঝানো হয়েছে। কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা। এই অঙ্গগুলো দিয়ে আমরা সিজদাহ করি। ওয়া আন্না

---

[১৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪২৯

[১৫১] প্রসিদ্ধ তাবেঈ সাইদ বিন জুবাইর (রহিমাহুল্লাহ)-এর জন্ম ৪৬ হিজরিতে মৃত্যু ৯৫ হিজরিতে। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) ও আইশাহ (রা.)-এর ছাত্র ছিলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ছিলেন। আব্দুর রাহমান বিন আশ'আসের বিদ্রোহে সমর্থন দেয়ায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে হত্যা করে।

মাসাজিদ বলতে এই অঙ্গগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো কেবল আল্লাহর প্রতি সিজদাহ করার জন্য। তাই অন্য কারও প্রতি সিজদাহর জন্য এগুলো ব্যবহার কোরো না। এটি হলো এই আয়াতের ব্যাপারে তাবেঈ সাইদ বিন যুবাইরের ব্যাখ্যা।

যে ব্যাখ্যাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, মূল বক্তব্য এক—ইবাদাতে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার

এই আলোচনার সাথে আমরা আজকের দারস শেষ করব। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের উপকারী ইলম দান করুন, এই দারসগুলোতে আমরা যা শিখছি আল্লাহ তা উপকারী জ্ঞানে পরিণত করে দিন। যারা এই দারসগুলোতে উপস্থিত থাকেন, মনোযোগ দিয়ে দারস শোনেন, দু'আ করি আল্লাহ (ﷻ) যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। বিশেষভাবে যারা অনলাইনে এ দারসগুলো শোনেন আমি তাঁদের জন্য দু'আ করছি। তাওহিদ শেখার ও বাস্তবায়নের জন্য যে সময় আপনার ব্যয় করছেন, আল্লাহ যেন বিচারের দিন তা আপনাদের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল হিসেবে কবুল করুন।

আজ আমরা এখানে তাওহিদের জন্য, আল্লাহর জন্য একত্র হয়েছি। আমি জানি এমন অনেকে আছেন যাদের সাথে আমার হয়তো এ জীবনে কখনোই দেখা করার সুযোগ হবে না। কিন্তু তারা তাওহিদকে ভালোবাসেন। তাওহিদের ইলমকে ভালোবাসেন। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন কোনা থেকে এ আলোচনা শুনছেন। আমি তাঁদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। পৃথিবীর এ অবস্থায়, উম্মাহর এ অবস্থার মাঝেও তারা ইলমের জন্য সময় ও শ্রম দিচ্ছেন। আমি দু'আ করি, তিনি যেন তাঁর আরশের নিচে বিচারের দিনে আমাদের স্থান দেন, একত্রীভূত করেন এবং আমাদের জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদে একত্র করেন। এই দারসের মাধ্যমে আমাদের কোনো দুনিয়াবী লাভ নেই। তবে আমরা আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে নিয়েছি—এবং এ হলো এমন ব্যবসা যা কখনো বিফল হবে না। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

'নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।' [সূরা আল ফাতির, ৩৫: ২৯-৩০]

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আমাদের যেন তাওহিদের শিক্ষার্থী নামে ডাকা হয় এবং আমাদের যেন একসাথে জান্নাতের দিকে ডাকা হয়।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ

'আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো।" [সূরা আয যুমার, ৩৯: ৭৩]

আমি দু'আ করি, আমরা যেন ওই মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাওহিদের শিক্ষার্থী হিসেবে। যারা দুনিয়াতে তাওহিদ শেখার ও বাস্তবায়নের জন্য একত্র হয়েছিল এবং গুরাবা হয়ে অবস্থান করেছিল।[১৫২]

---

[১৫২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, অচিরেই আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। কাজেই গুরাবা (অপরিচিতদের) জন্য রয়েছে সুসংবাদ।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২০৮। অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো গুরাবা কারা, তিনি উত্তরে বললেন, الَّذِين يُصْلِحون إذا فسد الناس, 'লোকেরা নষ্ট হয়ে যাবার পর যারা তাদেরকে সংশোধন করবে।'-ইমাম আবু আমর আদ-দানী (রহ.), আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান : ১/২৫; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে সনদ সহীহ।-আস সিলসিলাতুস সহীহাহ : ৩/২৬৭

দারস ৭

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'। এটি উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয় বিষয়।

'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' এর কাছাকাছি বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায় 'মৈত্রী ও সম্পর্কচ্ছেদ'। তবে আমরা আরবী 'ওয়ালা' এবং 'বারা' শব্দ দুটোই ব্যবহার করব। 'ওয়ালা' হলো বন্ধুত্ব বা মৈত্রী আর 'বারা' হলো শত্রুতা বা সম্পর্কচ্ছেদ।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁদের আনুগত্য করা মুসলিমদের প্রতি মৈত্রী হলো ওয়ালা।

আর যারা আল্লাহ্র শত্রু, যারা নিজ কথা, কাজ বা পরিকল্পনার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং মুসলিমদের বিরোধিতা করে–তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, তাদের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণা হলো বারা। এই হলো 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা'। খুব সহজ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। ছোটবেলা থেকে আমার অভ্যাস হল, আমার পড়া সব বইগুলোর বিষয়ভিত্তিক তালিকা করা। আমি এখনো এটা করি। লিস্টগুলো এখনো আমার কাছে আছে। কিছুদিন আগে আমি লিস্টগুলো চেক করছিলাম। দেখলাম আমার তালিকায় এমন ৪৫টি বই কিংবা পুস্তিকার নাম আছে, যেখানে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু বই পুরোপুরিভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে। আর কিছু বইয়ের অংশবিশেষে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি বুনিয়াদি এবং গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণেই যুগে যুগে অনেক উলামা এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। চাইলে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়েই একটা লেকচার সিরিয করা সম্ভব। এ আলোচনা অনেক বিস্তারিত এবং এর অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ'-এর তাৎপর্যের যে দিকগুলো আজ উম্মাহর জন্য জানা অত্যন্ত জরুরি, তার মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারা অন্যতম।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (رحمه الله)-এর নাতি এবং তাঁর বরকতময় দাওয়াহ ও মানহাজের সুযোগ্য উত্তরসূরি, শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (رحمه الله) আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তিকাটির নাম আওসাক 'আরাল ঈমান' (أوثق عرى الإيمان)।[১৫৩]

ইন শা আল্লাহ আমাদের আলোচনাতে আমরা আল ওয়ালা ওয়াল বারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আনব। আর আল্লাহ চাইলে পরে কখনো আমরা এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তৃতীয় বিষয় : আল ওয়ালা ওয়াল বারা

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (رحمه الله) বলেন,

> (الثَّالِثَةُ) أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللهَ لا يجوز له موالاة من حاد الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ،
>
> (তৃতীয় বিষয়) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে এবং ইবাদাতের জন্য এক আল্লাহকেই বেছে নিয়েছে, তাঁর পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব (মুওয়ালাহ) করা মোটেই বৈধ নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। যদিও তারা তাঁর সবচেয়ে আপনজন হয়।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল

ওপরের বাক্য দুটো বলার পর দলিল হিসেবে তিনি নিচের আয়াত উল্লেখ করেছেন,

> لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
>
> 'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে (তাদের সাথে মুওয়ালাহ করে); যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়...' [সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]

---

[১৫৩] পুস্তিকাটি দারুল কাসিম থেকে আরও দুটি পুস্তিকার সাথে ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়, যাদের সমন্বিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯।

আল্লাহ (ﷻ) এখানে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলছেন, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, আখিরাতে বিশ্বাস করে, তাঁরা কখনোই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতাকারীদের সাথে মৈত্রী করবে না, বন্ধুত্ব রাখবে না। এসব লোকেরা তাঁদের যত আপনজনই হোক না কেন। যাদের মুওয়ালাহ (মৈত্রী) আল্লাহর সাথে, তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) জানিয়ে দিয়েছেন,

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

'এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্য শক্তি দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।' [সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]

সূরা মুমতাহিনাতেও আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল পাবেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন কোরো না; অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।' [সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১]

সূরা তাওবাহতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহর (আযাব) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' [সূরা তাওবাহ, ৯: ২৪]

দুনিয়াতে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় হলো তাঁর পরিবার, বংশ, সম্পদ। আল্লাহ বলছেন, পার্থিব এসব কিছু যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে আমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আমরা যেন অপেক্ষা করি বিপর্যয়, যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা, ম্যাসাকার আর জেনোসাইডের জন্য।

এগুলো কখন আসবে? যখন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে অন্য কোনো কিছুকে বেশি ভালোবাসব। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরোধিতাকারীদের তো ভালোবাসা যাবেই না, নিজের পরিবার কিংবা সম্পদকেও আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যাবে না। আমরা যখন কাউকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসব–সেটা হতে পারে আল্লাহর শত্রু, অথবা আমাদের পরিবার, সম্পদ, কিংবা সুবিধাবাদী লাইফস্টাইল–তখন আমাদের ওপর এ বিপর্যয়গুলো আসবে। কোনো কিছুকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যাবে না। ওয়ালার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ
>
> ‘হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না।’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫৭]

কীভাবে এমন কারও সাথে মৈত্রী সম্ভব, যে দ্বীন ইসলাম নিয়ে তাচ্ছিল্য করে? ঠাট্টা-মশকরা করে? অথচ একজন মুমিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় তাঁর দ্বীন। না, এমন কাউকে কখনোই বন্ধু বা মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ
>
> ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না–তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৮]

এ আয়াতে বিত্বনাহ (بطانة) শব্দটি এসেছে। শব্দটির অর্থ কী? উপদেষ্টা, রক্ষাকর্তা, পরামর্শদাতা। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কোনো কাফিরকে পরামর্শদাতা, রক্ষাকারী, উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ না করতে। আল্লাহ কেন আমাদের মানা করলেন? উত্তর এ আয়াতেই আছে।

لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

'তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ক্রটি করে না–তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য।'

আমরা যদি এমনটা করি তবে কাফিররা নিশ্চিতভাবেই আমাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করে ফেলবে। এগুলো কুরআনের স্পষ্ট আয়াত, যেখানে আল ওয়ালা ওয়াল বারার শিক্ষা উঠে এসেছে। কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবী (ﷺ)-দের বক্তব্যে আরও অনেক দলিল পাওয়া যায়। ইমাম হামাদ ইবনু আতিক[১৫৪] (ﷺ) তাঁর গ্রন্থ সাবিলুন নাজাহ ওয়াল ফিকাকে বলেছেন,

ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم- أي الولاء والبراء- بعد وجوب التوحيد و تحريم ضده

'আল্লাহর একত্ব এবং তার বিপরীত বিষয়কে (অর্থাৎ শিরক) নিষিদ্ধকরণের হুকুমের পর, দ্বীনের মধ্যে আর এমন কোনো বিধান নেই যেটার ব্যাপারে আল ওয়ালা ওয়াল বারার মতো ব্যাপক, স্পষ্ট ও চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে।'

আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব

আল ওয়ালা ওয়াল বারা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কেন আল ওয়ালা ওয়াল বারা তাওহিদের কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রধান এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ? আমাদের কীভাবে এ বিষয়টি সহজভাবে বোঝা উচিত?

আসলে আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের প্রয়োজন পড়ে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালেমাই আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এই কালেমা থেকেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মক্কার কুরাইশ মুশরিকরা সুস্পষ্টভাবে বুঝে ফেলেছিল আল ওয়ালা ওয়াল বারা কী জিনিস! তাদের আর কোনো কিছুর দরকার হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে আল ওয়ালা ওয়াল বারার অর্থ সবার কাছে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি এটার জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে হবে আর বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডন করতে হবে।

---

[১৫৪] আল্লামা মুহাক্কিক শাইখ হামাদ বিন আতিক (ﷺ)-এর জন্ম ১৮১২/১৩ সালে দ্বিতীয় আলে সাউদ ইমারতে (বর্তমানে তৃতীয় ইমারত চলমান)। মৃত্যু ১৮৮৩/৮৪ সালে। তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। তিনি নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (ﷺ)-এর সমসাময়িক ছিলেন, এবং উভয়ের মাঝে পত্রবিনিময় হতো। এগুলো তাঁর গ্রন্থ المراسلات এ সংকলিত হয়েছে।

তারপর এল দার্শনিকের দল। তারা তাদের সীমিত বোধবুদ্ধি, খাপছাড়া চিন্তাভাবনা আর নফসকে কুরআন-হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিতে শুরু করল। শুরু করল তাদের বিভ্রান্তিগুলোর প্রচার। ফলে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিলো। সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ), সালাফুস সালেহিন, উম্মাহর আলিমগণ ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন, দরকার পড়ল তা ভেঙে ভেঙে বোঝানোর।

খুব সহজে আল ওয়ালা ওয়াল বারার কনসেপ্টটা বোঝাই।

রাগবি নিয়ে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই। একসময় এ খেলা শেখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। যদিও আমি অ্যামেরিকাতেই বড় হয়েছি কিন্তু এই খেলার নিয়মকানুনগুলো আমি আজও ঠিকঠাক ধরতে পারি না। অথচ আমার এক ভাতিজা আছে পেশাদার রাগবি খেলোয়াড়। সুবহান আল্লাহ, কোনো এক কারণে আল্লাহ আমার চিন্তাকে এই খেলার নিয়ম বোঝা থেকে বিরত রেখেছেন। তবে রাগবির নিয়মকানুন না জানলেও খেলাধুলার ব্যাপারে একটা বিষয় আমি বেশ ভালোমতো বুঝি।

আপনি কোনো দলের সদস্য হয়ে প্রতিপক্ষ দলকে সমর্থন করতে পারেন না। মেক্সিকোর মতো জায়গায় এ ধরনের কাজের জন্য সাধারণত ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কেন? কারণ এটাই ফিতরাত। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

আপনি একটি টিমের খেলোয়াড় হয়ে কীভাবে অন্য টিমকে সমর্থন করবেন? আপনি যখন কোনো দলে যোগ দিচ্ছেন তখন সেই দলের অংশ হয়ে যাচ্ছেন। আপনার ওপর সেই টিমের হক্ব হলো আপনি তাদের প্রতি অনুগত থাকবেন, সমর্থন জোগাবেন এবং আপনার দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো পালন করবেন। আপনি কখনোই সেই টিমের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো টিমকে সমর্থন করবেন না। এটা একদম কমনসেন্সের ব্যাপার। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যানেজার বা ক্যাপ্টেনকে আপনি প্রশংসার বন্যায় ভাসাবেন না, তাদের প্রতি অনুগতও থাকবেন না, তাদেরকে কখনো নিজেদের দলের দুর্বলতার কথা বলবেন না। ঠাট্টাচ্ছলেও না। আপনি মনে মনেও চাইবেন না যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দল জিতুক। যদি আপনি মনে মনেও এমন চান, তাহলে আপনি নিজের দলের সাথে প্রতারণা করলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

আচ্ছা এবার আরেকটা দিক দেখুন।

খেলার মধ্যে অনেক ভুল হয়ে থাকে—ভুল পাস, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় না থাকা, গোল মিস করা ইত্যাদি। এসব নিয়ে খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে রাগারাগি হয়, কথা কাটাকাটি হয়। কখনো কখনো সেটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় থেকে ধাক্কাধাক্কি, এমনকি হাতাহাতিতেও গড়ায়। খেলার মাঠে এমন অনেক ঘটনা ঘটে। কিন্তু এমন

পরিস্থিতিতে কেউ কি বিপক্ষ দলের ম্যানেজার বা ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে নিজের টিমমেটের বিরুদ্ধে নালিশ করে,'দেখুন না, ওরা আমাকে পাস দেয় না। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকে না, গোল মিস করে...'!

কেউ কি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যানেজার কিংবা খেলোয়াড়দের অনুরোধ করবে, 'আমি আমার টিমমেটদের উচিত শিক্ষা দিতে চাই। আপনারা কি আমাকে সাহায্য করবেন?'

আপনি কি বলবেন, 'আমার টিমমেটদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন। ওদেরকে মারুন। ম্যাসাকার করুন। জেনোসাইড চালান'?

রাস্তার বখাটে ছেলে কিংবা গুন্ডাদের গ্যাং-এর কথা ধরুন। এই গ্যাংগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিজ দলের প্রতি 'ওয়ালা' এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি 'বারা', এই মূলনীতির ওপর। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি দাঁড়িয়ে আছে আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর।

প্রত্যেকটি দেশে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় রাষ্ট্রের সাথে, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে। বিশ্বাসঘাতক, গাদ্দাররা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে সবচেয়ে বড় হুমকি। দেশদ্রোহিতাকে এত বড় অপরাধ হিসেবে দেখার কারণ কী? দেশের ভিত্তিতে ওয়ালা আর বারা। দেশের ভিত্তিতে মৈত্রী ও শত্রুতার নীতি।

তাহলে চিন্তা করুন। সামান্য একটা ফুটবল কিংবা রাগবি টিমের জন্যে যদি ওয়ালা এবং বারা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়, যদি একটি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা, উন্নয়ন আর সফলতা নির্ভর করে ওয়ালা এবং বারার ওপর, তাহলে সমগ্র মানবজাতির জীবনবিধান, দ্বীন ইসলামের জন্য আল ওয়ালা ওয়াল বারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

তাহলে আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ভিত্তিতে আল ওয়ালা ওয়ালা বারা নির্ধারণে কেন মুসলিমদের এত কষ্ট হয়?

আল ওয়ালা ওয়াল বারা মানুষের ফিতরাত। বোধবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ সহজাতভাবে এর গুরুত্ব বোঝে। আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল হিসেবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালেমা যথেষ্ট। এ কালেমা থেকেই এর গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তবু আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে এর সমর্থনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। উম্মাহকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে মুনাফিকের দল চায় আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দলে যোগ দেবেন, কিন্তু সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করবেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দল' ছাড়া অন্য সবকিছুকে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারাতে ত্রুটির বিপদ

আল ওয়ালা ওয়াল বারা হলো মুসলিমের আত্মপরিচয়। আল ওয়ালা আল বারার উপলব্ধি ছাড়া মুসলিম কখনো নিজের পরিচয় খুঁজে পাবে না। তাই মুসলিমদের অবশ্যই ওয়ালা এবং বারা ব্যাপারটি অন্তরে গেঁথে নিতে হবে–বিশেষ করে কাফিরদের দেশে বসবাস করা মুসলিমদের। ওয়ালা এবং বারা এর যথাযথ অনুধাবনে ব্যর্থতা মুসলিমদের জন্যে সংকেত দেয় এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের। যে শিশু আজ মুসলিমদের ঘরে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা না থাকলে, তাদের ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের প্রজন্ম বড় হবে কাফির-মুশরিক হয়ে। নিশ্চিত থাকুন।

জি, আপনি ভুল পড়েননি। মনযোগ দিয়ে শুনুন, ওয়ালা এবং বারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকলে বর্তমান মুসলিম প্রজন্ম (বিশেষ করে কাফির-মুশরিকদের ভূমিতে বসবাসরত মুসলিমরা) এমন এক প্রজন্মের জন্ম দেবে যাদের ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনি হবে কাফির বা মুশরিক। আমার কথা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে; কিন্তু এটাই বাস্তবতা। আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯২০ সালে জর্ডান থেকে মার্কিন মুলুকে হাজির হলো দুই ভাই। কিছুদিন পর একভাই ফিরে গেল জর্ডানে। অন্যভাই থেকে গেল অ্যামেরিকাতে। এই ব্যক্তির বংশধররা এখনো এই দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। খুব সম্ভবত তারা চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্ম। যে ভাই জর্ডানে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর বংশধররা এখনো মুসলিম। তারা আন্তরিকতভাবে নিজেদের ইসলাম আর মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্ব করে। পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে বলে, 'আমরা মুসলিম'। হ্যাঁ, তারা নিখুঁত না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গোমরাহ হয়েছে। কেউ কেউ গুনাহগার। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, তাঁরা মোটের ওপর মুসলিম। তাঁদের অন্তরগুলোতে তাওহিদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত। ইন শা আল্লাহ যেসব ভুলভ্রান্তি আছে একদিন তাঁরা সেগুলো ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে সত্যের ওপর ফিরে আসবে।

আর যে ভাই অ্যামেরিকা থেকে গিয়েছিল?

বোধহয় তার ছেলেমেয়েরাও এখন আর কেউ বেঁচে নেই। এখন খুব সম্ভবত তার পরিবারের চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্ম চলছে। তাদের বংশ এখন বেশ বড়। সবাই এক শহরে বেড়ে উঠেছিল। তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল, একসময় তাদের পারিবারিক নামে সেই শহরের নামকরণ হয়েছিল। জানলে খুব অবাক হবেন, অ্যামেরিকায় থেকে যাওয়া সেই ভাইয়ের বংশধরদের কেউ এখন আর নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় না।

তারা সালাত আদায় করে না, তাই মুসলিম না–আমি এমন কিছু বলছি না। তারা নিজেদের মুসলিম হিসেবেই পরিচয় দেয় না। ধর্ম জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে আমরা

খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু বা নাস্তিক। তাদের অনেকে এখন নাস্তিক। এটা আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। সেই পরিবারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। আল্লাহর কাছে দু'আ করি আল্লাহ (ﷻ) যেন তাদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে নেন।

কীভাবে তারা দ্বীন ইসলাম থেকে কুফরে চলে গেল?

আমরা আগে অনেক আলোচনায় বহুবার বলেছি, ইসলাম কখনোই কাফির-মুশরিকদের জোর করে কালেমা পড়ানোর অনুমতি দেয় না। এটা দ্বীন ইসলামে সম্ভব না।

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।' [সূরা আল বাক্কারাহ, ২: ২৫৬]

এমনকি শরীয়াহর বিধান হলো, যে ভূখণ্ড ইসলামী শরীয়াহ দিয়ে শাসিত হবে, সেখানেও কাফিরদের জোর করে মুসলিম বানানো হবে না। খিলাফাহর অধীনে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না। বরং কাফিররা ভুলের ওপর অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়া হবে। আল্লাহর কসম! কাফিররা মুসলিম শাসিত ভূমিতে যে অধিকার ভোগ করেছে, মুসলিমরা কাফির শাসিত ভূমিতে তার কানাকড়িও পায় না। এমনকি মুসলিমদের ভূমিতে, আদর্শ খিলাফাহর ভূমিতে অমুসলিমরা যে অধিকার অতীতে ভোগ করেছে তাদের নিজেদের ধর্মের লোকদের দ্বারা শাসিত ভূমিতেও তারা সেটা পায়নি।

তবে একই সাথে এটাও মনে রাখা দরকার, আমরা তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিই না। তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণের মানে এই না, আমরা তাদের ভ্রান্ত, বানোয়াট, মিথ্যা ধর্মকে স্বীকৃতি দেবো।

মুসলিমরা আহলুয যিম্মাকে নিরাপত্তা দেবে। ওইসব কাফিরদের নিরাপত্তা দেয়া হবে, যারা ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে অনুগত নাগরিক হিসেবে অবস্থান করবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলিমদের দায়িত্ব। একই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে, তাদের ধর্ম ভ্রান্ত ও মিথ্যা। তাই ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে মুসলিম শিশুদের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম, সব দ্বীন, সব জীবনবিধান মিথ্যা। যদি কেউ অন্য ধর্মে বিশ্বাস করে, অনুসরণ করে, তারপর তার ওপর মারা যায়, তাহলে তার শেষ পরিণতি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন!

কিন্তু আজকাল মুসলিমদের শেখানো হচ্ছে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তাওহিদ এবং শিরকের পার্থক্যকে এসব কথা বলা লোকেরা খুব ছোট করে দেখায়। 'আরে দিনশেষে আমরা সবাই জান্নাতে যাব। তোমার

ধর্ম এবং আমার ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমাদের সৃষ্টিকর্তা তো এক। পথগুলো আলাদা, কিন্তু গন্তব্য এক। দেখো, আমরা একদিন সবাই জান্নাতে যাব। তাই এত চিন্তার কিছু নেই!'

এদের মধ্যে অনেকে তো এও বলে, 'খ্রিস্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র আর আমরা বলি তিনি আল্লাহর রাসূল; কিন্তু আরেকটু গভীরে গেলে দেখবেন দুটার অর্থ একই। আসলে শাব্দিক; ভাষাগত ভিন্নতার কারণে একই জিনিসকে একটু অন্যভাবে বলা আরকি। শেকড়ে ফিরে গেলে আমরা তো সবাই ইব্রাহীমের অনুসারী।'

তারা দাবি করে, কুরআনে নাকি বলা আছে সবাই জান্নাতে যাবে। তারা কুরআনের নামে মিথ্যাচার করে। কখনো সরাসরি আবার কখনো ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে বলে, 'যারা মানুষকে জাহান্নামের ভয় দেখায়, অথবা বলে কেউ জাহান্নামে যাবে–তারা চরমপন্থী, মৌলবাদী।'

ওয়ালা ও বারা-বিহীন এই যুগে অনেকের কাছে জাহান্নাম এক জনশূন্য জায়গায় পরিণত হয়েছে। যেন কেউই জাহান্নামের অধিবাসী হবে না। আল্লাহ (ﷻ) বোধহয় এমনি এমনিই কোনো কারণ ছাড়াই জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। তাদের কথার মূল উপসংহার এটাই। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহর কাছেই এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, এরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে সুউচ্চ, পবিত্র।

এ ধরনের বিকৃত চিন্তাভাবনা আর শিক্ষার শেষ পরিণতি কী হয়?

ওয়ালা এবং বারার শিক্ষাবিহীন মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অন্তত কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম কালেমার ঘ্রাণ পায়। আর চতুর্থ, পঞ্চম এবং তার পরের প্রজন্মগুলো হয় নাস্তিক, ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুক্তমনা ইত্যাদি। ওয়ালা এবং বারা-বিহীন মুসলিমদের শেষ পরিণতি এমন করুণই হয়। ওয়ালা এবং বারাকে কখনো ভুলে যাবেন না, ছেড়ে দেবেন না। এটিই আপনার পরিচয়, এটিই আপনার অনন্যতা। এটিই আপনার ব্যক্তিত্ব।

পনেরো বছর আগে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদম প্রথম দিককার মুসলিম এবং মসজিদ নিয়ে খুব চমৎকার আলোচনা করছিলেন নামকরা এক বক্তা। প্রজেক্টর দিয়ে অতীতের মসজিদগুলোর ছবি দেখাচ্ছিলেন। অন্য মহাদেশ থেকে দাস হিসেবে যেসব মুসলিমরা অ্যামেরিকাতে এসেছিলেন এবং এখানে আসার পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিয়ে চমৎকার আলোচনা। অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, অ্যামেরিকাতে মুসলিমদের পা পড়েছিল অনেক আগেই। ১৮০০ সালের আশেপাশের সময়ে তৈরি হওয়া পুরোনো মসজিদগুলোর ছবি দেখে সেমিনারের সবাই বেশ খুশি হয়েছিল।

লেকচার শেষে আমরা বসে খাওয়া-দাওয়া করছিলাম। কথাচ্ছলে আমি সেই খ্যাতিমান বক্তাকে প্রশ্ন করলাম,

'আচ্ছা, ভালো কথা... পুরোনো মসজিদগুলো না হয় সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই মসজিদগুলোর মুসল্লিরা কোথায়? অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর সেই মুসলিমদের সবাই নিশ্চয় নিঃসন্তান ছিল না? তাঁদের নিশ্চয় সন্তানসন্ততি, বংশধর ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আপনি যেসব মুসলিমদের নিয়ে আলোচনা করলেন, তাঁদের বংশধররা আজ কোথায়? তাঁরা কোথায় হারিয়ে গেল?'

আলোচনাতে সেই সময়কার মুসলিমদের যে সংখ্যা তিনি বলেছিলেন, সেটা অনুযায়ী বর্তমানে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত অ্যামেরিকানদের অধিকাংশের মুসলিম হবার কথা। অন্যান্য অভিবাসীদের অনেকেরও মুসলিম হবার কথা। সেই হিসেবে এখন অ্যামেরিকাতে মুসলিম থাকার কথা ছিল আরও অনেক বেশি। এটা তো একেবারেই অসম্ভব যে, সেই সময়ের সব মুসলিম নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তাহলে তারা কোথায়?

তিনি বললেন, 'খুবই ভালো প্রশ্ন। আসলে আমার এ বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা নেই। এটা নিয়ে কাজ করা দরকার। এ বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।'

আমি বললাম, 'আমি বরং আপনার কাজ কিছুটা সহজ করে দিই। আপনার কি মনে হয় না যে, এই লম্বা সময়ে তারা ইসলামকে ভুলে গিয়েছে। তাদের মুসলিম পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে?'

এই মুসলিমদের অন্তরে ওয়ালা এবং বারা ছিল না। অজ্ঞতার কারণে তারা এর ওপর আমল করতে পারেনি। ফলাফল আপনাদের চোখের সামনে। এবার একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। ওয়ালা এবং বারার ব্যাপারে আজ মুসলিমরা একদম অজ্ঞ। শুধু আল ওয়ালা ওয়াল বারা না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শিক্ষার বিরুদ্ধেও আজ সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ চলছে। এ রকম এক অদ্ভুত, প্রতিকূল সময়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী? আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কী?

পুরো পৃথিবীজুড়ে মুসলিমরা আজ নির্যাতনের শিকার। কাফির-মুশরিকদের বোমার আঘাতে অসহায় মুসলিম নারী, পুরুষ আর শিশুরা রক্তাক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু কাফির-মুশরিকদের বোমার আঘাতের চাইতেও বেশি যন্ত্রণা দেয় আমাদের নিজেদের লোকের (যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, দ্বীনের দাঈ আর শাইখ হিসেবে উপস্থাপন করে) গাদ্দারি। তাদের ক্ষতি বোমার আঘাতের চেয়েও ভয়ংকর। আরও বেশি ধ্বংসাত্মক।

ইসলামের শত্রুরা চিরকাল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। ওয়ালা এবং বারা নিয়ে তাদের আপত্তি নতুন কিছু না। এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা তৈরি করছে বর্তমান যামানার মুনাফিক আর গাদ্দাররা। এরা উম্মাহর সাথে প্রতারণা করে প্রচার করে বেড়াচ্ছে ওয়ালা এবং বারার বিকৃত সংস্করণ। তাদের এই বিকৃত ওয়ালা এবং বারা গ্রহণ করে নিলে তা সোজা আপনাকে এই দ্বীন থেকে খারিজ করে দেবে।

আমার বাবা আমাদের এলাকার একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মসজিদটি পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। এটি আসলে তৈরি হয়েছিল গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে। ষাট এবং সত্তরের দশকে আমার বাবা মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, আল্লাহ্ তাঁকে আমলপূর্ণ দীর্ঘ জীবন দান করুন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন ইয়েমেনি শাইখ, যিনি মদীনা ইউনিভার্সিটির একদম প্রথম দিককার গ্র্যাজুয়েট। এ দেশে তিনি এসেছিলেন দাওয়াতের কাজে। কিছুদিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন তিনি আমাকে বেশ কিছু বই উপহার দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল কিতাবুত তাওহিদ। যাইহোক, ওই বিল্ডিঙের ওপরের তলাতে ছিল মসজিদ। নিচতলাতে হলরুম। সেখানে পার্টি চলত, গানবাজনার ব্যবস্থা করা হতো। মাঝে মাঝে মদ্যপানও করা হতো। আমার বাবা এবং সেই ইয়েমেনি শাইখ সেই বিল্ডিঙের বেইসমেন্টকেও মসজিদে পরিবর্তন করে ফেলেন।

আমার এখনো মনে আছে, সালাতের পর বাবা অনেকক্ষণ মসজিদে বসে থাকতেন। মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত। এ সময়ে খুব কম মুসল্লি থাকত। কোনো কোনো জুমআর দিনে হয়তো তিন-চারজন বৃদ্ধ থাকতেন। আমার বাবা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী। আর আমি ছিলাম একমাত্র শিশু। মাঝে মাঝে আমরা ওপরে বসে থাকা অবস্থায় নিচতলায় উদ্দাম পার্টি চলত। আমাদের সঙ্গের বৃদ্ধগণ নিচে গিয়ে অনুরোধ করতেন যেন পাঁচ মিনিটের জন্য গানবাজনা বন্ধ করা হয়। এই ফাঁকে তাঁরা মাগরিব বা ঈশার সালাত আদায় করবেন।

তিরিশের দশকে যারা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবারগুলোকে চিনি। এক কাজ করুন, তাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে দেখুন, তাদের বংশধরদের বর্তমান অবস্থা কী? তারা কোথায়? তাদের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে জানলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আর এটা নিয়ে কথা না বাড়াই। এ আলোচনাগুলো করতেও কষ্ট হয়।

গল্প বলে বলে আমরা তাওহিদের আলোচনার সময় নিতে চাই না। তবে এগুলো আপনাদের জানা দরকার। ওয়ালা এবং বারা-বিহীন মুসলিম সমাজ বা ত্রুটিপূর্ণ ওয়ালা এবং বারার আকীদাহ মুসলিম সমাজের জন্য কী ভয়ানক পরিণতি অপেক্ষা করে থাকে, এগুলো তার অল্প কিছু উদাহরণ।

আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে কলুষিত করার উদ্দেশ্য এবং ফলাফল

ওয়ালা এবং বারাকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী করা ইসলামের প্রত্যেকে শত্রুর একান্ত চাওয়া। মুসলিমরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধারণ করুক, তাদের মুসলিম নাম থাকুক, নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিক—এতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মুসলিমদের ভেতরটা যেন হয় ফাঁপা। অন্তর যেন হয় ঈমানশূন্য। অনেকটা ওই গাছের গুঁড়ির মতো, যার ভেতরটা ফাঁপা এবং পচা।

সুবিশাল একটা গাছ, ছায়াদায়ক, ঘন। দূর থেকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলেন গাছের গোড়ায় বেশ বড়সড় একটা ছিদ্র। যেই গাছটাকে দূর থেকে খুব শক্তিশালী, সুদৃঢ় মনে হচ্ছিল, কাছে যাবার পর বুঝতে পারলেন সামান্য একটু বাতাসে বা একটু নাড়াচাড়া করলেই এটি শেকড়সহ উপড়ে যাবে। আল ওয়ালা ওয়াল বারা-বিহীন ঈমানের অবস্থান এই গাছের মত।

ইসলামের শত্রুরা কেন তীব্রভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে ঘৃণা করে? দেখুন, কোনো মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করা খুবই কঠিন। প্রায় অসম্ভব। এটা যে কখনোই হয় না, তা না। হয়, তবে খুবই কম। আপনি সচরাচর এমন ঘটনার কথা শুনবেন না। আসলে তাওহিদ প্রোথিত মানুষের অন্তরের গভীরে। মানুষ একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-তে বিশ্বাসী হলে, যত কিছুই হোক না কেন, রেশ অন্তরে থেকেই যায়।

একজন দাঈ আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন। এক দুর্ভিক্ষপীড়িত, দরিদ্র মুসলিম এলাকায় মিশনারীরা গিয়েছিল সাহায্য করার নামে। চিকিৎসক, খাবার ওষুধ, বাড়িঘর নির্মাণের সামগ্রী, শ্রমিকের বিশাল বহর নিয়ে মিশনারীরা হাজির হলো। বাচ্চাকাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবা-মা অস্থির হয়ে পড়েন—সন্তানের সুস্থতার জন্য তারা যেকোনো কিছু করতে রাজি থাকেন। মিশনারীরা এই সুযোগটাই কাজে লাগাল। অসুস্থ শিশুদের জন্যে তারা প্রাথমিক টিকার ব্যবস্থা করল। তাদের বাবা-মাকে সাহায্য করল। যখন কাউকে সাহায্য করত, তখন তারা একটা ছবি দেখিয়ে বলত, 'দেখো, ইনি হলেন যীশুখ্রিষ্ট, তোমাদের রব। তিনিই এসব পাঠিয়েছেন।' দুর্ভিক্ষপীড়িত অভুক্ত মুসলিমদের তারা প্রচুর খাবার-দাবার দিলো, তাদের কাদামাটির ঘরগুলো মেরামত করে দিলো। যতভাবে পারা যায় সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকল। আর সাহায্য করার পর প্রতি পদে পদে তাদের বানানো সেই ছবি দেখিয়ে বললো,

'এই যে যীশুখ্রিষ্ট। তোমাদের রব। তিনিই এসব সাহায্য পাঠিয়েছেন।'

মিশনারীদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এল। ওই অঞ্চলের মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানো গেছে ভেবে তারা বেশ আনন্দিত। যাবার আগে আয়োজন করা হলো বিদায়ি অনুষ্ঠানের। প্রজেক্টর দিয়ে সিনেমা দেখানোর জন্যে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হলো। ওই এলাকার লোকজন ইলেক্ট্রিসিটি কী তা-ই জানে না, তারা এখন প্রজেক্টরের মাধ্যমে মুভি দেখছে। তাদের মানসিক অবস্থাটা একবার বোঝার চেষ্টা করুন। মিশনারীরা নিশ্চিত ছিল তারা এই লোকগুলোর মগজধোলাই করতে পেরেছে।

প্রজেক্টরে একজন মানুষের ছবি ভেসে উঠল। মিশনারীদের বানানো সেই ছবি। আস্তে আস্তে সেই ছবি বড় হতে থাকল। মিশনারীরা, ক্রুসেইডাররা বলল, 'ইনিই তোমাদের রব! ইনিই তোমাদের রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের দুরবস্থার পরিবর্তন করেছেন।' ঠিক তখন একজন গোত্রপ্রধান লাফ দিয়ে উঠল। বিস্ময়মাখা সুরে প্রশ্ন করল,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! ইনিই কি আল্লাহ?!'

প্রচণ্ড বিস্ময় গোত্রপ্রধানের অন্তরে থাকা তাওহিদকে প্রকাশ করে দিলো। মিশন সফল হয়েছে ভেবে মিশনারীরা আত্মতৃপ্তি বোধ করছিল, কিন্তু এই এক প্রশ্নেই তারা বাস্তবতা বুঝতে পারল। আসলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রভাব খুব গভীর। যে অন্তরে একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ছাপ পড়ে, সেই অন্তর থেকে এই ছাপ পুরোপুরি মুছে ফেলা খুব কঠিন।

আরেকটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের বিকৃত কিতাবাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। নিজেদের কিতাবগুলোর অসামঞ্জস্য, ভুলত্রুটিগুলোর ব্যাপারে তারা জানে। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থের ওপর তারা ঠিকমতো ভরসা করতে পারে না। তাদের দাবিতে অনেক ফাঁকফোকর আছে, এটা তারা বোঝে। তারা যদি মুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করে বা আগে মুসলিম ছিল এমন কাউকে তাদের ধর্মে নিয়ে আসে, তাহলে দেখা যাবে এসব জারিজুরি তারা মেনে নিচ্ছে না। তাহলে উপায় কী?

তারা মুসলিম থাকুক এটা আমরা চাই না। আবার আমরা তাদেরকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বানাতেও চাই না। তাহলে উপায় কী? মুসলিমদেরকে আমাদের ধর্মে নিয়ে আসার কোনো দরকার নেই, কিন্তু তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। মুসলিমদের ইহুদী, খ্রিস্টান বানানোর কোনো দরকার নেই। তাদেরকে শুধু তাদের ধর্ম থেকে বের করে নিয়ে আসো। ব্যস, এতেই কাজ হবে। তারা উদ্ভ্রান্ত পশুর মতো ছুটে বেড়াবে।

এখন চিন্তা করুন, মুসলিমদের কীভাবে সহজে দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে আনা সম্ভব?

মুসলিমদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা ভুলিয়ে দেয়া। অন্ততপক্ষে ওয়ালা এবং বারা-সহ ইসলামের সঠিক শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়া।

এ কারণেই কাফিররা বারবার মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস, কারিকুলামে নাক গলায়। বিশেষ করে দুই পবিত্র মসজিদের ভূমিতে। কারিকুলাম থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনা বাদ দেয়ার এবং ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরার জন্য তারা হস্তক্ষেপ করে আসছে বহু দিন ধরে। সুনির্দিষ্টভাবে প্রাইমারী স্কুল এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনা তুলে দেয়ার এবং বদলে ফেলার জন্যে কাফিররা হস্তক্ষেপ করেছে। শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে।

এগুলো ওপেন সিক্রেট, সবাই জানে। আমি নিজে কিছুই বানিয়ে বলছি না। আপনি একটু ঘাঁটাঘাঁটি করুন। অবাক হয়ে যাবেন। ২০০৩, ২০০৬, ২০০৭ সালে এগুলো নিয়ে মিডিয়ায় ঝড় বয়ে গিয়েছিল। যে কথা আল্লাহর উদ্দেশ্য বলার দায়িত্ব ছিল দুই পবিত্র মসজিদের ভূখণ্ডের দালাল শাসকগোষ্ঠী সেই কথা বলল তাদের পশ্চিমা প্রভুদের আনুগত্য করে। পশ্চিমা কাফিররা নির্দেশ দিলো আর দালাল শাসকগোষ্ঠী বলল, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। কোনো সমস্যা নেই, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে, শাইখ সালিহ আল-ফাওযান আর সহ্য করতে না পেরে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। সিলেবাস পরিবর্তনের বিরোধিতা করে তিনি লিখলেনও।[১৫৫] সিলেবাস পরিবর্তন করার পর ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্য কিছুটা পূর্ণ হলো। তার কিছুদিন পর তারা মক্কাকে আন্তঃধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করল। এ কার্যক্রমকে তারা সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করল আলোচনা আর মতবিনিময়ের নামে। এগুলো সব বাকওয়াস। আসলে এটা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।

---

[১৫৫] এ রকম একটি লেখা যা ২০০৯ সালে শাইখ ফাওযান লিখেছিলেন,
https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13090
২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'রিয়াদ সামিটের' পর তৎকালীন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেইট (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) রেক্স টিলারসন, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে এক প্রশ্নের জবাবে বলে, 'উগ্রবাদ মোকাবেলার' জন্য সৌদিদের নতুন করে পাঠ্যবই প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে পুরোনো পাঠ্যবইগুলো ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। সৌদি শাসকেরা এতে রাজি হয়েছে।
সূত্র : Saudi Arabia will replace the Wahhabi textbooks taught in schools,
https://tinyurl.com/y2l5tpsa
ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বদলে দেয়ার এ চক্রান্ত আজও চলছে।

আমি অনেকদিন আগে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, লেখাটা আমাদের আগের ওয়েবসাইটে ছিল। এখন কোথায় পাওয়া যাবে আমার জানা নেই। সেই প্রবন্ধে জাযিরাতুল আরবের ৩০ জন আলিমের বক্তব্য আমি দেখিয়েছিলাম যারা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে কুফর বলেছেন কিংবা যারা এ আদর্শ গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে ও প্রচার করে তাদেরকে কাফির বলেছেন। এমনকি সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, হায়াতুল কিবারুল উলামার ফাতাওয়াতেও একে কুফর বলা হয়েছে। ওয়াল্লাহি, দুই পবিত্র ভূমির মসজিদের একজন আলিম–যুগের মুরজিয়ারা যাকে অনুসরণের দাবি করে–তিনি বলেছেন, 'যে আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দিকে আহ্বান করে সে ইহুদী-খ্রিস্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট'।

বর্তমান বিশ্ব ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের নামে যা হয়, তার সবগুলো মৌলিক দিকের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা নষ্ট করে দেয়া। আমি আপনাদের আরও স্পষ্ট করে বলি। আমাদের সমাজে আজকাল অনেক মানুষ দেখা যায়, যারা নিজেদের ইসলামের দাঈ বলে দাবি করে। মানুষও তাদের ব্যাপারে এমন ধারণা করে, কিন্তু এরা আসলে রুয়াইবিদাহ (رويبضة)[১৫৬]। এদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সঠিক আকীদাহ নির্মূল করা। এই জঘন্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, আল ওয়ালা ওয়াল বারা এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সঠিক আকীদাহকে ধ্বংস করার জন্য তারা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের আড়ালে কাজ করে। এ কাজ তারা সরাসরি করতে পারবে না। মুসলিমরা ক্ষেপে যাবে, বাধা দেবে। তাই তারা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের নামে তা করে।

এই রুয়াইবিদাহরা নিজেদের আহাম্মকে পরিণত করেছে। এমনকি যেসব কাফিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা কাজ করে, সেই কাফিররাও এদের আহাম্মক মনে করে। ক'দিন আগে আমি এক কথিত র‍্যাডিকাল ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞের বক্তব্য শুনছিলাম। এ লোক বলছিল, পশ্চিমে অবস্থান করা জনপ্রিয় দাঈরা এমনই এক গান্ধীবাদী মডারেট ইসলাম প্রচার করছে সাধারণ মুসলিমদের কাছে যা এখন অসংলগ্ন মনে হচ্ছে। এগুলো দিয়ে আর তরুণদের আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। বরং তারা যা চাচ্ছে

---

[১৫৬] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, تَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خداعات يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهِمُ الرُّوَيْبِضَةُ 'মানুষের মাঝে এমন কতগুলো প্রতারণাপূর্ণ বছর আসবে যখন মিথ্যাবাদীদের সত্যবাদী বলে প্রত্যয়ন করা হবে, আর সত্যবাদীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। তখন খিয়ানতকারীর ওপর আস্থা রাখা হবে, আর বিশ্বাসী ব্যক্তিকে অবিশ্বস্ত মনে করা হবে। তখন রুওয়াইবিদাহ্ কথা বলবে।' সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন রুওয়াইবিদাহ্ কী? তিনি উত্তরে বললেন, الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ 'এমন নগণ্য লোক, যে জনসাধারণের কাজের ব্যাপারে কথা বলবে।'-ইমাম হাকিম (রহ.), আল মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, হাদীস নং : ৮৪৩৯; তাঁর মতে এর সনদ সহীহ এবং ইমাম যাহাবি (রহ.)-ও সহীহ বলেছেন।

তার উল্টোটা হচ্ছে। দিন দিন তরুণ মুসলিমরা 'জিহাদি' হয়ে যাচ্ছে। এটা হলো সেই বিশেষজ্ঞের বক্তব্য। এ কথা বলে সে এসব রুয়াইবিদাহদের নিয়ে ঠাট্টা করছিল।

পাশ্চাত্যের যেসব দাঈ আর শাইখরা আজ উম্মাহকে ওয়ালা এবং বারা ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছে, বিভ্রান্তি আর বিকৃতি ছড়াচ্ছে, ইসলামের শত্রুদের পক্ষে কাজ করছে, ১২-১৩ বছর আগে (২০০১ সালের টুইন টাওয়ার হামলার আগে) ঠিক এই লোকগুলোর ব্যাপারেই মনে হতো তারা ওয়ালা এবং বারার প্রশ্নে আপসহীন। লক্ষ করুন, আমি বলেছি, 'তাদের ব্যাপারে মনে হতো' যে তারা এ ব্যাপারে আপসহীন। তাদের সেই সময়কার আলোচনা শুনলে দেখবেন তখনকার বক্তব্য দিয়ে তাদের আজকের বক্তব্য খণ্ডন করা যাচ্ছে। তাদের বর্তমান বিভ্রান্ত দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণ করার জন্যে ওই সময়ের লেকচারগুলোই যথেষ্ট।

কেন এমন হলো? কেন তাদের এমন পরিবর্তন হলো? কী বদলে গেল? এটা বোঝার জন্যে বিশাল পণ্ডিত হবার প্রয়োজন পড়ে না। উত্তর খুব সহজ। শুধু পাশ্চাত্যে না, ভারতীয় উপমহাদেশ বা আরবেও অনেক দাঈ এবং শাইখ এভাবে বদলে গেছেন। ২০০১ সালের আগে তাদের আকীদাহ আর চেহারা কেমন ছিল খুঁজে দেখুন। আর তাদের বর্তমান আকীদাহ আর বেশভূষা দেখুন। আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে তারা ছেঁটে ফেলেছে, তাই চেহারা এবং বেশভূষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ (ﷻ) তাদেরকে ছেঁটে ফেলেছেন। তাদের আলোচনা শুনলে দেখবেন তারা আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে ছেঁটে ফেলেছে, আর তাদের চেহারার দিকে তাকালে দেখবেন তারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহকে ছেঁটে ফেলেছে। আমার কথা মেনে নেয়ার দরকার নেই, আপনি নিজেই যাচাই করে দেখুন। যাচাই করুন, তুলনা করুন। ভাবুন।

এখন আবার কেউ বলে বসবেন না যে এসব রুয়াইবিদাহরা আজকের যুগের ইমাম শাফে'ঈ। বলা হয়ে থাকে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট, স্থান এবং পরিস্থিতির কারণে ইমাম আশ-শাফে'ঈ তাঁর অনেক ফিকহী মত পরিবর্তন করেছিলেন। যখন ইরাকে ছিলেন তখন তিনি এক ধরনের অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু মিসরে আসার পর দেখলেন এখানে প্রেক্ষাপট, লোকেদের অবস্থা ভিন্ন। তাই ভিন্ন অবস্থান নিলেন। কিন্তু এসব লোকের পরিবর্তনের সাথে আশ-শাফে'ঈর তুলনা করা যায় না। এটা তাঁর অপমান। যদিও আমি অনেক লোককে এই খোঁড়া অজুহাত দিতে শুনেছি। দয়া করে কেউ দাবি করবেন না, এসকল লোক আমাদের সময়ের ইমাম শাফে'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ)। তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের বাস্তবতা নিয়ে ইন শা আল্লাহ আমরা পরে আলোচনা করব।[১৫৭]

---

[১৫৭] দারস ৮ দ্রষ্টব্য।

যারা নিজেদের বিশ্বাস বদলে ফেলে তাদের নিয়ে দুটো আসার

ইবনু আবি শাইবাহ (ﷺ) এবং আল হাকিম (ﷺ)-এর সংকলনে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (ﷺ)-এর একটি উক্তি এসেছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (ﷺ) ছিলেন এমন একজন সাহাবী যাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন কিছু তথ্য জানিয়েছিলেন যা অন্যান্যদের জানাননি। বিশেষ করে ফিতনার ব্যাপারে।[১৫৮] বিরল এ সম্মানের অধিকারী মহান সাহাবী হুযাইফা (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لَا، فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ

'তোমাদের মাঝে কেউ যদি জানতে চায়, সে ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছে নাকি হয়নি, তাহলে সে যেন খেয়াল করে দেখে, সে যা আগে হালাল ভাবত তা যদি এখন হারাম ভাবে তাহলে সে ফিতনায় পড়েছে। আর আগে যা হারাম ভাবত তা যদি এখন হালাল ভাবে, তাহলেও সে ফিতনায় পড়েছে।'[১৫৯]

হুযাইফা (ﷺ) আমাদের হাতে কষ্টিপাথর তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ (ﷻ) ফিতনায় ফেলেছেন কি না, এই কষ্টিপাথর দিয়েই তুমি যাচাই করে দেখতে পারবে।

একটি বিষয় এখানে বোঝা জরুরি। হুযাইফা (ﷺ) এখানে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বলছেন না যিনি ইলম অর্জন করছেন এবং একপর্যায়ে কোনো বিষয় হালাল বা হারাম হবার মাস'আলা খুঁজে পেয়ে নিজের মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এমন কোনো আলিমের কথা বলছেন না যিনি আগে কোনো কিছুকে হয়তো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে হালাল মনে করতেন, তারপর তিনি জানতে পারলেন ওই হাদীসটি সহীহ না, এ কারণে তাঁর অবস্থান বদলালেন। এ ধরনের কোনো কিছুর কথা হুযাইফা (ﷺ) এখানে বলছেন না। এখানে তিনি ওই ধরনের মানুষের কথা বলছেন যারা নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী, নিজের নফসের সন্তুষ্টির জন্য কিংবা কাফিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য হালালকে হারাম আর হারামকে হালালে পরিবর্তন করে।

---

[১৫৮] হুযাইফা (ﷺ)-কে বলা হয় صاحب سر النبي অর্থাৎ নবী (ﷺ)-এর গোপনীয়তার ধারক। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিকীনদের কথা জানিয়েছিলেন অর্থাৎ কে কে মুনাফিক তা জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি ফিতনার যুগের হাদীসের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। বিস্তারিত দেখুন : সহীহুল বুখারীর باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما অধ্যায় এবং ইমাম যাহাবি (ﷺ)-এর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/৩৬১

[১৫৯] ইমাম হাকিম (ﷺ), আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং : ৮৪৪৩, ইমাম হাকিম (ﷺ)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (ﷺ)-এর শর্তে সহীহ, ইমাম যাহাবি (ﷺ)-ও একমত পোষণ করেছেন।

হালাল-হারামের ব্যাপারে এভাবে অবস্থান বদলানো যদি এত গুরুতর বিষয় হয়, তাহলে এভাবে আকীদাহ বদলানোর বিষয়টা কেমন? যারা তাদের আকীদাহ বদলে ফেলেছে তাদের কী অবস্থা? তারা কেমন ফিতনায় পড়েছে?

হঠাৎ করে এইসব লোকের আকীদাহ ২০০১ সালের পর বদলে গেল। কী অবিশ্বাস্য, কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না? রাতারাতি তাদের নীতি পালটে গেল। সবার একসঙ্গে! হুট করে! তাদের ওপর কী এমন কোনো ওয়াহি নাযিল হয়েছে যার ব্যাপারে আমরা জানি না? কেন এমন হলো?

প্রাসঙ্গিক আরেকটি বর্ণনা এসেছে মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক এবং সুনানুল বাইহাক্বীতে। হুযাইফা (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে আবু মাসউদ আল আনসারী বললেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন'। হুযাইফা (ﷺ) বললেন,

اياك و التلون فى دين الله فإن دين الله واحد

'আল্লাহর দ্বীনের মাঝে (বারবার খোলস বদলে) বহুরূপী হোয়ো না, কেননা আল্লাহর দ্বীন তো একটাই।'[১৬০]

মুসলিমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সাপের মতো বারবার খোলস পালটায় না। কিছু দাঈদের ক্রমাগত খোলস পালটানোর অভ্যাস তাদেরকে কাফির-মুশরিক সাংবাদিক এবং বিশেষজ্ঞদের হাসির খোরাকে পরিণত করেছে। সঠিক পথের ওপর, সঠিক আদর্শের ওপর জমে থাকা সম্মানের। গর্বের। সঠিক আদর্শের ওপর টিকে থাকতে পারলে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে বড় নিয়ামাত আর কিছু হতে পারে না।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম, আর তোমাদের ওপর প্রতিশ্রুত নিয়ামাতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনবিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম।' [সূরা মায়িদাহ, ৫: ৩]

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহর জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে এ সম্পদের অযোগ্য মনে করলেন, তাদের কাছ থেকে এই সম্মান সরিয়ে নিলেন। আজ খুব অল্প মানুষকে আল্লাহ এই সম্মান দিয়েছেন। আজ

---

[১৬০] ইমাম ইবনু বাত্তাহ (ﷺ), আল ইবানাহ, হাদীস নং : ৫৭২, সকল রাবী সিকাহ। আবু মাসউদ আল আনসারীকে কেউ কেউ মাজহুল মনে করেছেন। তবে ইবনু হিব্বান (ﷺ) তাঁকে সিকাহদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।-তাহযিব : ১০/১১৬; তাক্বরিব : ৪৬২

এমন অনেক লোক আছে যারা সাংবাদিকদের কাছে রীতিমতো সাক্ষাৎকার দিয়ে, গর্ব করে বলে, এক সময় তারা সাহাবায়ে কেরাম (ﷺ)-এর আকীদাহর ওপর ছিল, এখন সেই আকীদাহ ছেড়ে এসেছে। এ রকম এক ব্যক্তিকে আজ অনেক বড় দাঈ, বক্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক বড় আলিমও বলা হয়। এই লোককে গুরুত্ব দেবেন না। ওয়াল্লাহিল আযীম! সাহাবী (ﷺ)-দের পদচিহ্নের অনুসারী হতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় সম্মান। অনেক বড় নিয়ামাত। আল্লাহ (ﷻ) এই লোকের কাছ থেকে সেই সম্মান সরিয়ে নিয়েছেন।

কে মানুষকে বিশুদ্ধ আকীদাহর পথে পরিচালিত করে আবার কেই-বা তাকে বিশুদ্ধ আকীদাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে? আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا

'আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন।' [সূরা আল ইসরা, ১৭: ৭৪]

আল্লাহ (ﷻ) এই কথাগুলো বলছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্যে করে। তিনি বলছেন, আমি যদি তোমাকে সরল পথের সন্ধান না দিতাম, সরল পথের ওপর তোমাকে দৃঢ় না রাখতাম, তাহলে তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারতে। চিন্তা করুন একবার। আল্লাহ (ﷻ) সাহায্য না করলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পথ হারিয়ে ফেলতেন! তাহলে আমাদের কী ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে! এক আরব কবি তাঁর সময়ের কিছু আলিমদের গিরগিটির মতো রং বদলাতে দেখে মনের দুঃখে লিখেছিলেন,

'তোমার বন্ধুরা আর আগের মতো নেই।
কেটে গেছে পরিবর্তনের অনেক প্রহর, বহুবার বদলেছে খোলস।
একে একে ধেয়ে আসা ফিতনায় তাদের মুখোশ গলে পড়ে,
যেভাবে গলে পড়ে বরফ।'

উম্মাহ যে বিশাল ফিতনা আর বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আজ যাচ্ছে তার একটা সুবিধা হলো, বরফ গলে যাচ্ছে, আর মুখোশের নিচে থাকা সত্যিকার চেহারাগুলো সবার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُۥ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُۥ فِى جَهَنَّمَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

'যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ অপবিত্র ও নাপাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।' [সূরা আল আনফাল, ৮: ৩৭]

যারা ২০০১ সালের আগে তাওহিদ, শিরক আর আল ওয়ালা ওয়াল বারা শেখাত, আজ তারা অস্থির হয়ে গেছে কাফিরদের মিডিয়ার বিশ্লেষকদের মতো হবার জন্যে। এই বাস্তবতা আপনাদের সামনেই আছে। তবু কি আপনারা দেখবেন না? আপনার দুপাশে তাকান। সামনে তাকান। পেছনে তাকান। হকপন্থীরা কোথায়? যাটের দশকে বলা শাইখ কিসক (ﷺ)-এর একটি কথা আমার বারবার মনে পড়ে। শাইখ বলতেন, ‘প্রকৃত ইসলামের দেখা তুমি পাবে কারাগারের চার দেয়ালের ভেতরে।’

ইলম বহনকারীদের একটি বিশেষ শ্রেণি

হক্ক আঁকড়ে থাকা মানুষ আজও আছে। তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। তাঁরা এক বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছেন। এর মাধ্যমে অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। আমরা কিছুক্ষণ পরে সেই হাদীসটি নিয়ে কথা বলব ইন শা আল্লাহ। এই হাদীসটির বর্ণনাসূত্র বা সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু হাদীসশাস্ত্রের অনেক বড় আলিম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله)। ইবনুল কাইয়্যিম (رحمه الله)-ও তাঁর মিফতাহ দারীস সা'আদাহ গ্রন্থে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসের বর্ণনাসূত্রের ওপর আপনি খুব চমৎকার একটি আলোচনা পাবেন তাখরিজু আহাদিসিল মিশকাতিল মাসাবিহ (تخريج أحاديث مشكاة المصابيح) গ্রন্থে।[১৬১]

এবার হাদীসটি উল্লেখ করা যাক। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে উসামাহ ইবনু যাইদ, আবু হুরাইরাহ, ইবনু মাসউদ, আলি বিন আবি তালিব, ইবনু উমার, মুয়ায (رضي الله عنهم)-সহ আরও অনেক সাহাবী থেকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই হাদীসের মাধ্যমে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের সেই সৌভাগ্যবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দান করুক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ
>
> ‘প্রত্যেক আগত জামা’আতের মধ্যে নেক, তাকওয়াবান ও নির্ভরযোগ্য মানুষ (কিতাব ও সুন্নাহর) এই জ্ঞান বহন করবে। তারা বাড়াবাড়ি করা লোকদের বিকৃতিকে খণ্ডন করবে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অজ্ঞদের অপব্যাখ্যাকে খণ্ডন করবে।’[১৬২]

---

[১৬১] এটি আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله) কৃত মিশকাতুল মাসাবিহ কিতাবের তাহক্বীক ও তাখরিজ।

[১৬২] ইমাম ইবনু আসাকির (رحمه الله), তারিখু দিমাশক : ৭/৩৯; ইমাম বাইহাক্বীর (১০/২০৯) সূত্রে

কোনো কাটছাঁট, সংযোজন-বিয়োজন, অতিরঞ্জন ছাড়া বিশুদ্ধ দ্বীনের শিক্ষা যারা বহন করে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের প্রশংসা করেছেন। যারা ইসলামকে ঠিক ওইভাবে মানে যেভাবে প্রথম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর তা নাযিল হয়েছিল। এ হাদীসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রশংসিত মানুষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী হবে? তাদের প্রধান দায়িত্বগুলো কী হবে?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই তাঁরা সম্মান ও প্রশংসার উপযুক্ত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ

'তারা বাড়াবাড়ি করা লোকদের বিকৃতিকে খণ্ডন করবে।'

এটি প্রথম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জানাচ্ছেন, এই প্রশংসিত মানুষগুলোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা বাড়াবাড়ির হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করবেন। বাড়াবাড়ির মাধ্যমে দ্বীনের যেন কোনো বিকৃতি না হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্যে তাঁরা কাজ করে যাবেন। হাদীসে উল্লেখিত প্রথম বৈশিষ্ট্যে (غال) 'গ্বাল'-এর কথা এসেছে। গ্বাল হলো এমন কেউ, যে সীমালঙ্ঘন করে। এখানে এর অর্থ হলো এমন কেউ, যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, চরম অবস্থান নেয়। যেমন: খাওয়ারিজ। খারিজিরা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে। কুরআন-হাদীসে কাফিরদের ব্যাপারে যে কথা এসেছে সেগুলো তারা গুনাহগার মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে তারা বাড়াবাড়ি করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইবাদাতের ক্ষেত্রেও গ্বুলু (غلو) তথা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত হাদীসও আছে।

তাকফির এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনাতেও অনেকে সীমালঙ্ঘন করে। বাড়াবাড়ি করে। চেইন তাকফির করে অনেক সময় তারা কোনো ভূখণ্ডের সব মুসলিমকে একসাথে কাফির ঘোষণা করে। কেউ যে আদৌ এমন করতে পারে নিজের কানে না শুনলে সেটা আমি বিশ্বাস করতাম না। আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে এমন সীমালঙ্ঘন দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ অত্যন্ত চরম অবস্থানে চলে যাচ্ছে। এমন হবার বড় একটা কারণ হলো, আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনা থেকে আলিমগণের মুখ ফিরিয়ে নেয়া। উম্মাহর সামনে আল ওয়ালা ওয়াল বারার সঠিক শিক্ষা আলিমগণ তুলে ধরছেন না। পাশ্চাত্যে এ বিষয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ, আর মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিগুলোতেও আলিমদের এ বিষয় আলোচনা করতে দেয়া হয়

মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং : ২৪৮, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে সনদ সহীহ।

না। এর ফল কী হলো?

অনেক তরুণ নিজে নিজে ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব (ﷺ)-এর লেখা পড়তে শুরু করল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যেহেতু আরবী জানে না, তাই তারা নির্ভর করল মূল আরবীর খণ্ডিত অনুবাদের ওপর। এর ফলে তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করল। অনেকে ইবনু তাইমিয়্যাহর লেখা থেকে ছাড়া ছাড়া কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে এসে কোনো একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জনগণকে ঢালাওভাবে কাফির ঘোষণা করে। অথচ তারা মূল আরবীতে ইবনু তাইমিয়্যাহর রচনাবলি জীবনে পড়েও দেখেনি। কেউ যে আসলে এমন করতে পারে তা বিশ্বাস করাই মুশকিল। কিন্তু আমি নিজের কানে এমন কথা বলতে শুনেছি।

ইবনু তাইমিয়্যাহর কিতাবগুলো আগাগোড়া বেশ কয়েকবার পড়ার সুযোগ আল্লাহ (ﷻ) আমাকে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। ইবনু তাইমিয়্যাহর রচনাবলি যত পড়বেন আপনার মুগ্ধতা তত বাড়বে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কথার গভীরতা খুব বেশি। তাঁর বক্তব্য সার্বিকভাবে অনুবাধনের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন। আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে, ইবনু তাইমিয়্যাহর লেখার স্টাইল সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর সব রচনা পড়া থাকতে হবে। অন্তত যে বিষয়ে তাঁর লেখা পড়ছেন সে বিষয়ের ওপর তাঁর সব লেখা আপনাকে পড়তে হবে। বিশেষ করে, গুরুত্বপূর্ণ এবং সেনসিটিভ কোনো বিষয়ে তাঁর ফতোয়া বুঝতে হলে তাঁর মাজমু আল-ফাতাওয়া গ্রন্থের ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো সব ফতোয়া এক করে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ঠিক কখন, কোন সময়ে, কোন পরিস্থিতিতে, কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে, কোন ভূমিতে, কাকে উদ্দেশ্যে করে তিনি ফতোয়াগুলো দিয়েছিলেন সেটিও জানতে হবে। তবেই আপনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন।

আজকাল কিছু কিছু লোক দেখা যায় (যদিও এদের সংখ্যা খুব বেশি না, আলহামদুলিল্লাহ) যারা ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ)-এর মূল আরবী কিতাবের ধারেকাছেও না গিয়ে, কিতাবের খণ্ডিত অংশের অনুবাদ পড়ে পুরো একটা জাতিকে কাফির হিসেবে ঘোষণা দেয়! এভাবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে বক্তব্য নেয়া শুরু করলে, উলামায়ে নাজদের এমন বক্তব্য দেখানো সম্ভব, যার ওপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যে বসবাসরত প্রায় সব মুসলিমকে কাফির ঘোষণা করা যাবে। মা'আযআল্লাহ! অবশ্যই, আমরা এমন বলি না এবং ইলমসম্পন্ন কেউ এ ধরনের কথা বলে না। প্রেক্ষাপট, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করে আউট অফ কনটেক্সট উদ্ধৃতি আনলে চরমভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আমরা বলি, এসব ভারী ভারী ইলমের কিতাব আলিমদের সান্নিধ্যে এসে অধ্যয়ন করা উচিত।

যাইহোক, হাদীস অনুযায়ী ওইসব প্রশংসিত ব্যক্তিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা বাড়াবাড়ির হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকবেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো,

وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ

'বাতিলপন্থীদের মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে।'

সুবহান আল্লাহ! এই হাদীস শুনে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেন আজ আমাদের মাঝে এই কথাগুলো বলছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়্যাতের সত্যতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই হাদীস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

আজ এমন অনেক লোক আছে, যারা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিকৃত করে। ফটোশপ দিয়ে যেমন ইচ্ছেমতো ছবি বদলানো যায়, এরা তেমনি নিজেদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য ইচ্ছেমতো কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে বদলে ফেলে।

ওয়ালা এবং বারার কথাই ধরুন। কিছু লোক ওয়ালা এবং বারার কিছু অংশ গ্রহণ করে, বাকি অংশ ছেঁটে ফেলে। তারপর সেই খণ্ডিত অংশকে প্রচার করে আদি ও অকৃত্রিম ওয়ালা এবং বারা হিসেবে। আমরা এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

যেমন ধরুন, অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ হলো যিম্মি অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ ও দয়ার্দ্র আচরণ করা। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমদের অধীনস্থ আহলুয যিম্মাহর নিরাপত্তার ব্যাপারে মুসলিমদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনে মুসলিমদের জীবন বিপন্ন করতেও হতে পারে। আল ক্বাররাফি তাঁর আল-ফুরুক কিতাবে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরও অনেক আলিমও আলোচনা করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ। তবে এটা পুরো আল ওয়ালা ওয়াল বারা না। এটা একটা অংশ। এমন আরও অংশ আছে। কিন্তু বর্তমান যামানার মডার্নিস্টরা ওয়ালা এবং বারার বাকি সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু এই অংশটুকু গ্রহণ করে, তারপর এটাকেই পূর্ণাঙ্গ ওয়ালা ওয়াল বারা হিসেবে প্রচার করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদের প্রশংসা করেছেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষগুলোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো,

وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

'এবং অজ্ঞদের অপব্যাখ্যার খণ্ডন করবে।'

বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম থেকে আরেকবার দেখা যাক। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা বাড়াবাড়ির হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, যারা নিজেদের খায়েশাত পূরণ এবং তাদের প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য দ্বীন ইসলামকে কাটছাঁট করে, বিকৃত করে তাদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষায় তাঁরা নিবেদিত থাকবেন। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা অজ্ঞ-জাহেলদের অপব্যাখ্যার হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করবেন।

এমন অনেক লোক আছে যারা জাহেল, অজ্ঞ। অজ্ঞ হবার পরও তাঁরা দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলে। কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে। তাদের কোনো ইলম নেই, দূরদর্শিতাও নেই। তারা গড়গড় করে তোতাপাখির মতো মুখস্থ কুরআনের আয়াত, হাদীস বলে যায়। তর্ক করে। অথচ আলিমগণ এই আয়াত বা হাদীসগুলোর ব্যাপারে কী অভিমত পোষণ করেছেন, কোনটা রহিত হয়েছে, কোনো কিছু নিয়ে এদের কোনো ধারণা নেই।

এই লোকগুলো চূড়ান্ত অজ্ঞ। এদের মধ্যে অনেকে হয়তো দ্বীনের ক্ষতি করতে চায় না। কিন্তু কাজের মাধ্যমে তারা দ্বীন ও মুসলিমদের ক্ষতি করে। আবার এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা আসলেই খারাপ লোক। সৎ বা অসৎ যা-ই হোক না কেন, এই লোকগুলোর সবাই কোনো কিছু না জেনেই সে বিষয়ে কথা বলে। এবং এটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ।

মদ, শূকর এগুলো খাওয়া হারাম। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচানোর জন্য এগুলো খাওয়ার সুযোগ আছে।[১৬৩] কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলা কোনো অবস্থায়ই জায়েয না।

এতক্ষণ আমরা যে হাদীসের ব্যাপারে কথা বললাম, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله) সেই হাদীসের ওপর মন্তব্য করেছেন,

> ‘আলহামদুলিল্লাহ! প্রত্যকে যুগেই আল্লাহর এমন অল্পসংখ্যক কিছু বান্দা থাকে, যারা লোকেদের হকের দিকে আহ্বান করে এবং অসৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেন।

---

[১৬৩] সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীবজন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান, ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।’

এজন্য এই বিধান দেয়া হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি খাদ্যাভাবে মরে যাবার মতো অবস্থায় উপনীত হয়, তাহলে জীবন বাঁচাতে যতটা দরকার ততটা শূকরের মাংস বা মদ সে খেতে পারবে।

ইবলিসের আক্রমণে প্রাণহীন কতজনের প্রাণ তাঁরা ফিরিয়ে এনেছেন। ইবলিসের হাতে যবেহ হওয়া কতজন তাঁরা ফিরিয়ে এনেছেন। কত পথভ্রান্ত এবং গোমরাহ মানুষকে তাঁরা সঠিক পথে এনেছেন। কতই-না চমৎকার তাদের প্রভাব। তাঁরা হলেন এই দ্বীনের সম্মানিত রক্ষক।'

দারসের উপসংহার

আলোচনার শেষে আমি বলব, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মূলে রয়েছে ওয়ালা এবং বারার শিক্ষা। তাওহিদের পর কালেমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অন্যতম হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারার শিক্ষা। ওয়ালা এবং বারা মুসলিমের পরিচয়। দুর্ভেদ্য এক ঢাল, যা পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মদের তাওহিদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ওয়ালা এবং বারার আকীদাহতে আপনার সুগভীর বিশ্বাস থাকতে হবে। একে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ওয়ালা এবং বারা আপনি কীভাবে জীবনে বাস্তবায়ন করবেন, সন্তানদের শেখাবেন তা নিয়ে আপনার স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট প্ল্যান থাকতে হবে। কাফির-মুশরিকরা ওয়ালা এবং বারাকে চরমভাবে ঘৃণা করে, কারণ তারা আমাদের ইসলামকে, আমাদের পরিচয়কে ঘৃণা করে। তারা চায় আমাদের দ্বীনকে আমরা যেন অন্য ধর্ম আর নানা তন্ত্রমন্ত্রের সাথে মিশিয়ে বিকৃত করে ফেলি।

দারসের শুরুতে আমরা খেলার উদাহরণ দিয়েছিলাম। ধরুন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের খেলা চলছে। ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা। আমি ব্রাজিলের হয়ে খেলছি। কিন্তু আমি ইচ্ছে করে বারবার আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের পাস দিচ্ছি। তাহলে আমাকে কী বলা হবে? স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শক আমাকে কী বলবে?

অথবা চিন্তা করুন, আমি ব্রাজিলের রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছি। বেঞ্চে বসে পানি বা জুস খাচ্ছি। কিন্তু যতবার আর্জেন্টিনা বল পাচ্ছে বা আক্রমণে যাচ্ছে, আমি আনন্দে ফেটে পড়ছি। আর্জেন্টিনা গোল করলে আমি তালি দিচ্ছি, শিস দিচ্ছি, চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছি। লোকে আমার ব্যাপারে কী মনে করবে?

আবার সাংবাদিকরা যখন আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসছে, তখন আমি আর্জেন্টিনার প্রশংসা করছি। 'তারা সেরা দল, শ্রেষ্ঠ দল। সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে পরিশ্রমী। তাদের সাথে অন্য কোনো দলের তুলনাই হয় না', এসব বলছি।

আমাকে কী বলা হবে? আপনি আমাকে কী বলবেন?

গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক... তাই না ?

কারণ, এগুলো একজন গাদ্দারের বৈশিষ্ট্য। একজন বিশ্বাসঘাতকের বৈশিষ্ট্য। এ কথাটা আমরা সবাই খুব সহজে বুঝি, তাই না? এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

আজকের বিভ্রান্ত উলামা আর দাঈরা চায় আপনি নিজেকে মুসলিম বলবেন, কিন্তু সমর্থন করবেন মুসলিমদের বাদ দিয়ে কাফিরদের দলকে। তারা চায় আপনি নিজেকে মুসলিম বলবেন, কিন্তু কালেমার বাহিনীর বদলে কুফরের বাহিনীগুলোকে সমর্থন করবেন। তাদের উৎসাহ দেবেন, ভালোবাসবেন।

পুরো বিশ্ব আজ আমাদের অন্তর থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারা ছিনিয়ে নিতে চায়। এটা এ জন্য না যে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা তাদের ক্ষতির কারণ। কারণটা ভিন্ন। মহান আল্লাহ্ সেই কারণ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ (عَزَّوَجَلَّ) বলেছেন,

> وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ
>
> ‘আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’**[সূরা আল বাকারাহ, ২: ১০৯]**

দারস ৮

আমরা আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আসলে আমরা যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তার প্রত্যেকটি নিয়ে আলাদা দারস, এমনকি আলাদা সিরিযও করা সম্ভব। বিষয়গুলো এতটাই গভীর। তবু সময়ের দিকে তাকিয়ে আমরা অতটা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আমরা এখানে শুধু মূল ভিত্তি তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আপনারা বুঝতে পারেন।

গত দারসের পর অনেকেই ইন্টারফেইথের বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার অনুরোধ করেছেন। ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ড আসলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার দিকে তাক করা একটি কামানের মতো। তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক এবং প্রশ্ন আসা উচিত। তাই আমরা এখানে ইন্টারফেইথ নিয়ে আরও কিছুটা আলোচনা করছি।

ইন্টারফেইথ অংশগ্রহণ করা লোকের ধরন

আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন বা আন্তঃধর্মীয় ব্যানারের অধীনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া লোকেরা সাধারণত দুই ধরনের হয়।

প্রথম শ্রেণি: এমন লোক যারা দাওয়াহকে ভালোবাসে, কিন্তু তারা দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ। তারা ইসলাম প্রচার করতে ভালোবাসে, আর অজ্ঞতার কারণে মনে করে আন্তঃধর্মীয় কাজকর্ম দিয়ে ইসলামের প্রচার করা যাবে। এরা মনে করে, আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ড হলো দাওয়াহর আদর্শ পদ্ধতি; অথবা কমসেকম দাওয়াহর অন্যতম পদ্ধতি।

এ ধরনের লোকদের উচিত কিছুদিন দাওয়াতী কাজ থেকে বিরতি নিয়ে আগে ভালোভাবে ইসলাম শেখা। তা না হলে তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে এবং সাওয়াব তো দূরে থাক, দিন দিন তাদের পাপের বোঝা ভারী হতে থাকবে।

এখানে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই, আমরা দাওয়াহর বিরোধিতা করছি না। আমরা দাওয়াহকে ভালোবাসি। মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবন আবর্তিত হয় দাওয়াহকে কেন্দ্র করে। আমরা আগেও বলেছি, যতটুকু বিশুদ্ধ ইলম আপনার কাছে আছে, আপনি ততটুকুই মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আপনার বিশুদ্ধ ইলমের পরিমাণ সামান্য হলেও সমস্যা নেই, মানুষের মাঝে তা-ই ছড়িয়ে দিন। হিকমাহ ও সহানুভূতির সাথে কীভাবে মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াহ প্রচার করতে হবে তা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দাওয়াহর বিরোধিতা করছি না। কিন্তু ইন্টারফেইথ এবং দাওয়াহ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়।

মুসলিমদের ভেতর থেকে যারা ইন্টারফেইথের প্রবক্তা, যারা আন্তঃধর্মীয় প্ল্যাটফর্মে সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে, তারা ইসলামের ব্যাপারে জাহেল ও অজ্ঞ। এরা মনে করে দাওয়াহ হলো খ্রিষ্টান পাদরি আর ইহুদী র‍্যাবাইয়ের সাথে ছবি তোলা। দাঁড়িয়ে-বসে সেলফি তোলা, তারপর দিনশেষে ঘরে ফিরে পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করা। এরা মনে করে এভাবে তারা ইসলাম আর দাওয়াহর বিশাল খেদমত করে ফেলেছে, বিশাল কিছু অর্জন করছে। আসলে একুল-ওকূল হারানো ছাড়া আর কিছুই তারা অর্জন করতে পারেনি। তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবার দুর্ভাগ্য অর্জন করেছে। সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ (ﷻ) জানিয়ে দিয়েছেন,

> قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
>
> ‘বলো, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?’ তারা হলো সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।’ [সূরা আল কাহাফ, ১৮: ১০৪-১০৩]

আল্লাহ (ﷻ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলছেন, ওই লোকেরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের সব কৃতকর্ম বিফলে গেছে; অথচ তারা ভাবছে তারা তাদের কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার পাবে। তারা মনে করছে যে, আমরা বেশ ভালো ভালো কাজ করছি, এর বিনিময়ে আমরা অনেক পুরস্কার পাব। অথচ কৃতকর্মের মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের পাপের বোঝা বাড়িয়েছে। এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

এই লোকগুলো ইন্টারফেইথ এবং দাওয়াহকে গুলিয়ে ফেলে। এ দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্য তারা ধরতে পারে না। ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় কার্যক্রমের ইতিহাস সম্পর্কেও এরা অজ্ঞ। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে কীভাবে এসব কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল, তাদের এজেন্ডা কী ছিল, তারপর কিছু কথিত মুসলিম কীভাবে এর প্রচারণা শুরু

করল—এগুলো তারা জানে না। তাদেরকে ইন্টারফেইথের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন বলতে পারছে না। এসব কিছু না জেনে এই মূর্খরা ইন্টারফেইথকে দাওয়াহ ভেবে বসে আছে। ইন্টারফেইথ নিয়ে কিছু বললে এই লোকগুলো তেড়ে আসে—

কেন এসব বলছ? আমরা তো দাওয়াহ করছি!

এরা আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা মনে করছে তারা নেক আমল করছে, কিন্তু আসলে তারা গুনাহ কামাচ্ছে। এরা অজ্ঞ, এবং এদের উচিত দাওয়াহর মাঠ থেকে অবসর নিয়ে আগে ভালোভাবে দ্বীন শেখা এবং ইতিহাস জানা।

এরা হলো প্রথম শ্রেণি।

দ্বিতীয় শ্রেণি: এরা হলো ওইসব লোক যারা জেনেবুঝে আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, প্রচার করে, পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই লোকগুলো ইন্টারফেইথের ইতিহাস জানে, এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এরা অবগত। অথবা এরা এর কিছু দিক সম্পর্কে জানে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করে।

এরা বর্তমান সময়ে এই উম্মাহর রুয়াইবিদাহ এবং মুনাফিক। তারা ইন্টারফেইথের আদর্শের ওপর ঈমান এনেছে এবং দ্বীন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার রোধে ইসলামের শত্রুদের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করছে। তারা দ্বীন ইসলামের এমন এক সংস্করণ চায় যা নিয়ে ইসলামের শত্রুরা সন্তুষ্ট। অথচ তাদের উচিত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।

ইহুদী খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

> '(হে মুহাম্মাদ) আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২০]

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করো।

অন্য কোনো ধর্ম, আদর্শ বা মতবাদের অনুসারীরা যদি এখন বলে অমুক শাইখ, অমুক দাঈ, অমুক দল খুব ভালো, তাহলে আমরা কী বুঝব? হয় কাফির-মুশরিকরা মিথ্যা বলছে। আসলে তারা ওই ব্যক্তি, দল বা দাঈকে ভালো মনে করে না। অথবা তারা যে শাইখ, দাঈ বা গ্রুপের প্রশংসা করছে তারা হক পথে নেই। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর

দেখানো পথে নেই। কারণ স্বয়ং আল্লাহই বলে দিয়েছেন,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২০]

আর আল্লাহ (ﷻ) কখনো মিথ্যা বলেন না।

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا

'আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? ' [সূরা আন নিসা, ৪: ১২২]

ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যদি কখনো আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে আমাদের করণীয় কী হবে? আমরা কি তাদের সাথে যোগ দেবো? আল্লাহ আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সূরা আল বাক্বারাহর ১২০ নম্বর আয়াতের ঠিক পরের অংশে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ

'বলো, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত।" [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২০]

তাদেরকে বলুন যে, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র সঠিক পথ। বিশুদ্ধ তাওহিদই একমাত্র মুক্তির পথ। কোনোমতেই ইন্টারফেইথের আদর্শ বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যাবে না। ইন্টারফেইথ একটা কুফরি মতবাদ। অন্যদিকে দাওয়াহ হলো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসৃত পদ্ধতি। ইন্টারফেইথ এবং দাওয়াহকে এক মনে করার মানে একটা তাজা আপেল আর একটা পচা কমলালেবুকে এক মনে করা।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُل لَّا يَسْتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় করো–যাতে তোমরা মুক্তি পাও।' [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ১০০]

ভালো এবং মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না। ইন্টারফেইথের মতো ঘৃণিত, নোংরা আবর্জনা কী করে দ্বীনের দাওয়াতের মতো মহান বিষয়ের সমান হতে পারে!

আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

'যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে।'

অর্থাৎ মন্দের আধিক্য, এর জাঁকজমক অনেক সময় আমাদের মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে, মন্দ মন্দই। খেয়াল করলে দেখবেন, আজকাল দাঈদের মধ্যে অনেকে মন্দের মাধ্যমেই জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিযোগিতা করছে।

আবু ওয়াফা ইবনু আকিলের বক্তব্য

আবু ওয়াফা ইবনু আকিল (رحمه الله) ৫১৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়ালা এবং বারা নিয়ে তাঁর অসাধারণ একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন,

> إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة
>
> 'কোনো যুগে ইসলামের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে চাইলে মসজিদের দরজায় সৃষ্ট ভিড়ের দিকে তাকিয়ো না, হজ্বের সময় লাব্বাইক ধ্বনির শোরগোলের দিকেও তাকিয়ো না, বরং তুমি দেখো যে তারা শরীয়াহর দুশমনদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে।'[১৬৪]

আবু ওয়াফা (رحمه الله) বলছেন, মসজিদে মুসল্লিদের সংখ্যা বা আরাফাতের ময়দানে হাজীদের আধিক্যে প্রমাণ করে না যে, সে যুগে ব্যাপক আকারে ইসলাম পালন করা হচ্ছে। বরং ইসলামের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় ওয়ালা এবং বারার ওপর ওই যুগের মুসলিমরা কেমন আমল করছে, সেটা দেখে। ওয়ালা এবং বারা হলো একটি লিটমাস টেস্ট। আগেই বলেছি, ওয়ালা এবং বারার মূল বিষয়টি অত্যন্ত সহজ সরল। বিদআতি গোষ্ঠী, বিশেষ করে দার্শনিক ফিরকার লোকেরা তাদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা প্রচার করার আগে এ বিষয়ে আলোচনাও সহজ সরল ছিল। আলিমগণ সংক্ষেপে, সহজ সরলভাবে তা ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু মডার্নিস্টরাসহ বিভিন্ন ধরনের বাতিল লোকেরা এখন এ বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। তাদের সবগুলো বিভ্রান্তির জবাব দিতে গেলে আমাদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ইন্টারফেইথের ওপর শাইখ বাকর আবু যাইদের একটি অসাধারণ বই আছে। বইটি অনুবাদ হয়েছে কি না আমার জানা নেই। যারা আরবী পারেন এবং এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা পড়তে আগ্রহী তারা বইটি পড়ে ফেলুন।[১৬৫] আল্লাহ শাইখকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। ইন্টারফেইথের ওপর এর চেয়েও ভালো আরেকটি বই আছে। চার খণ্ডের এই বইটি লিখেছিলেন প্রফেসর আল কাদি নামের একজন আরব গবেষক। খুব চমৎকার এ বইতে বেশ গভীরে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১৬৪] ইমাম ইবনু মুফলিহ (رحمه الله), আল আদাবুশ শারঈয়্যাহ : ১/২৬৮

[১৬৫] শাইখের কিতাবটির নাম نظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان (নাযিরাতুল খালত বাইনাল ইসলাম ওয়া গাইরিহ মিনাল আদইয়ান)।

আশ-শাফে'ঈর মতো হবার দাবির জবাব

আমরা গত দারসে বলেছিলাম অনেকে ২০০১ সালের পর আল ওয়ালা ওয়াল বারার ব্যাপারে তাদের আকীদাহ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে ফেলেছে। সাপের মতো খোলস বদলে পরিণত হয়েছে অন্য মানুষে। এ রকম ঘটনা পাশ্চাত্যে যেমন ঘটেছে, তেমনি মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোতেও ঘটেছে।

কেন তাদের এমন পরিবর্তন হলো?

তাদের অনেকেই ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ)-কে অজুহাত হিসেবে টেনে আনে। তারা দাবি করে, ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) যেমন তাঁর মাযহাবের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন, একইভাবে তারাও পরিবর্তন এনেছে। এই কথার অর্থ কী?

ইমাম শাফে'ঈর ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) হলেন শাফে'ঈ মাযহাবের ইমাম। জীবনকালে তাঁর দুটি মাযহাব ছিল বলা যায়। জীবনের প্রথমাংশে তিনি ছিলেন ইরাকে। ইরাকে থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন, লিখেছেন, ছাত্রদের শিখিয়েছেন। জীবনের পরবর্তী অংশে তিনি পাড়ি জমান মিসরে। মিসরে থাকা অবস্থায়ও তিনি বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন, লিখেছেন, ছাত্রদের শিখিয়েছেন। ইরাকে থাকা অবস্থায় ইমাম শাফে'ঈর অবস্থানের সাথে তাঁর মিসরে থাকাকালীন অবস্থানের পার্থক্য ছিল।

তো যারা আজ তাদের আকীদাহ বদলে ফেলেছে, তারা বলে আশ-শাফে'ঈ তাঁর অবস্থান বদলেছিলেন, আমরাও বদলেছি।

আসলে কী হয়েছিল? কেন ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করেছিলেন? আর তিনি কতটুকুই বা নিজেকে পরিবর্তন করেছিলেন? এ ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু কথা বলি, যাতে করে এসব খোঁড়া অজুহাতে কেউ বিভ্রান্ত না হন।

ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) বলেছেন,

> 'একজন ফকীহ যখন কোনো বিষয়ের ওপর ফতোয়া দেন তখন কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার জ্ঞানের পাশাপাশি তাঁকে সেই স্থানের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সময় ইত্যাদির জ্ঞান রাখতে হয়। একজন ফকীহকে অবশ্যই এগুলো জানতে হবে।'[১৬৬]

---

[১৬৬] ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উরফ বা প্রথার গুরুত্ব বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শাইখ মূলত এখানে এ রকম আলোচনাকে সংক্ষেপে উত্থাপন করেছেন। যেমন ই'লামের ৩য় খণ্ডে একটি অধ্যায় আছে فَصْلٌ مُوجِبَاتُ الْأَيْمَانِ وَالْإِقْرَارِ وَالنُّذُورِ وَ غَيْرِ هَا, এখানে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, فَيُفْتِيَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِهِ.

কিন্তু লক্ষ করুন, এ কথা বলা হচ্ছে ফিকহের ক্ষেত্রে। ফিকহের ক্ষেত্রে এসব নিয়ামকের কথা বিবেচনা করার কথা বলা হচ্ছে। আকীদাহর ক্ষেত্রে না। আকীদাহ বদলায় না। আবার ফিকহের ক্ষেত্রেও পরিবেশ, প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্য, প্রথা ইত্যাদির বিবেচনায় কিছু কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আসে। সম্পূর্ণ মাযহাব বদলায় না।

তাহলে ইমাম আশ-শাফে'ঈর ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?

ইমাম শাফে'ঈর অবস্থানে এত ব্যাপক পরিবর্তন আসার কারণ হলো নতুন দলিল পাওয়া। ইরাক থেকে মিসরে যাবার পর তিনি নতুন অনেক শার'ঈ দলিল সংকলন করেছিলেন। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন এসেছিল। ইমাম শাফে'ঈর জীবনী এবং তাঁর মাযহাব বিশ্লেষণ করলে দেখবেন মিসরে যাবার পর তাঁর পরিবর্তন শুরু হয়নি। বরং তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন আসতে শুরু করে ইরাক ছেড়ে যাবার ঠিক আগে আগে। কারণ এ সময় তাঁর কাছে নতুন দলিল এসে পৌঁছাচ্ছিল। নতুন দলিলের সন্ধান পাবার পর তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। শাসক বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী, কিংবা নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তিনি নিজের অবস্থান বদলাননি। তিনি অবস্থান বদলেছেন শার'ঈ দলিলের ভিত্তিতে। এবং তাঁর এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল মিসরে আসার আগেই, ইরাকে থাকা অবস্থাতেই।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) যদি শাসকদের সন্তুষ্ট করার জন্য বা অন্য কোনো কারণে (সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে) দুটি মাযহাব তৈরি করার ইচ্ছাই করে থাকতেন, তাহলে তিনি বলতেন,

আমি ইরাকে থাকতে এটা লিখেছি, এটা ইরাকের জন্য।

আমি মিসরে থাকতে ওটা লিখেছি, ওটা মিসরের জন্য।

এমন কথা বললে আমরা বুঝতাম, প্রত্যেক ভূখণ্ড বা দেশের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আলাদা আলাদা নিয়ম হবে। কিন্তু ইমাম আশ-শাফে'ঈ এমন বলেননি। বরং তিনি এর বিপরীত কথা বলেছেন বলে উদ্ধৃতি আছে। আল বাহরুল মুহিত গ্রন্থে ইমাম আশ-শাফে'ঈকে উদ্ধৃত করে আয-যারকাশি (ﷺ) লিখেছেন,

ليس في حلٍّ من روى عني القديم

'কারও জন্য আমার পুরাতন মাযহাব বর্ণনা করা হালাল নয়।'[১৬৭]

وَيُفْتَى كُلُّ أَحَدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ 'প্রত্যেক ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর পালিত বৈধ প্রথা মোতাবেক ফতোয়া দেয়া হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস মোতাবেক ফতোয়া প্রদান করা হবে।'-ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন : ৩/৪৫

[১৬৭] ইমাম যারকাশি (ﷺ), আল বাহরুল মুহিত : ৪/৫৮৪

অর্থাৎ তিনি বলেছেন, ইরাকে থাকাকালীন তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করতেন সেই মাযহাবের নিয়মকানুন যেন কারও কাছে বর্ণনা করা না হয়। কাজেই ইমাম শাফে'ঈ তাঁর অবস্থানে এত ব্যাপক পরিবর্তন প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, ঐতিহ্যের কারণে আনেননি। শাসক, জনগণ কিংবা নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্যেও তিনি অবস্থান বদলাননি। তিনি অবস্থান বদলেছেন শার'ঈ দলিলের ভিত্তিতে। তাঁর কাছে আরও হাদীস, আরও আসার এসে পৌঁছানোর কারণে তিনি অবস্থান বদলেছিলেন। এবং স্পষ্টতই তিনি তাঁর পুরোনো অবস্থানকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছিলেন।

তৃতীয় পয়েন্ট হলো, ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া আর নিয়মকানুন প্রযোজ্য—এই ধারণায় তিনি বিশ্বাসী হলে তাঁর যেসব ছাত্র ইরাকে রয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁর আগের অবস্থানগুলোই প্রচার করত। কিন্তু তাঁরা এটি করেননি।

চতুর্থ পয়েন্ট, ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ)-কে যারা খুব ভালোমতো চিনতেন, জানতেন, যারা তাঁর সত্যিকারের অনুসারী ছিলেন, তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছাত্র ছিলেন, তাঁরা কখনোই দাবি করেননি ইমাম শাফে'ঈ তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করেছিলেন দেশ, জনগণ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি বদলে যাবার কারণে। সেই সময়ের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন। ইমাম শাফে'ঈর যে ছাত্ররা তাঁর পুরোনো কিছু অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুজতাহিদ। অর্থাৎ তাঁরা ইজতিহাদ হিসেবে ইমাম শাফে'ঈর দুই অবস্থানের মধ্য থেকে প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর এই অবস্থানগুলো প্রচার বা প্রয়োগ করার সময় তারা এগুলোকে ইমাম শাফে'ঈর মত বলে এগুলো প্রচার করতেন না। কারণ আশ-শাফে'ঈ এ অবস্থানগুলো ত্যাগ করেছিলেন। নিজস্ব ইজতিহাদ হিসেবে তারা এই অবস্থানগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চম পয়েন্ট হলো, যদি ইমাম শাফে'ঈ দলিলের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ, দেশ, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, কিংবা অন্য কোনো কারণে তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করতেন, তাহলে তিনি বলতেন,

> 'আমি ইরাকে থাকাকালীন যে মাযহাব অনুসরণ করতাম, কেবল ইরাকের অধিবাসীরা সেই মাযহাবের অনুসরণ করো। আমি মিসরে থাকা অবস্থায় যে মাযহাব গ্রহণ করেছি, সেটা কেবল মিসরের অধিবাসীরা অনুসরণ করো। আর কেউ না।'

অর্থাৎ ইরাক আর মিসরের বাইরে আর কেউ এই মাযহাবগুলো অনুসরণ করবে না। ইরাকের অবস্থান শুধু ইরাকের লোকেরা অনুসরণ করবে। মিসরের অবস্থান শুধু মিসরের লোকেরা অনুসরণ করবে। কিন্তু তিনি এমন বলেননি। ইমাম আন নাওয়াউই (ﷺ)—যিনি নিজে শাফে'ঈ মাযহাবের একজন ইমাম—তাঁর 'আল মাজমু' গ্রন্থে বলেছেন,

كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل

'যেসকল মাস'আলায় শাফে'ঈ (ﷺ)-এর দুটি মত পাওয়া যায়–অর্থাৎ পুরাতন মত ও নতুন মত–সেসকল মাস'আলায় নতুন মতটিই সঠিক এবং এর ওপরই আমল করা হবে (অর্থাৎ তার সর্বশেষ মত)।'[১৬৮]

ষষ্ঠ পয়েন্ট, আমাদের যুগের যেসব লোক তাদের পরিবর্তনের পক্ষে ইমাম শাফে'ঈর উদাহরণ টানছে তাদের পরিবর্তন এসেছে ২০০১ সালের পর। তাদের আকীদাহ ও অবস্থানে পরিবর্তনের কারণ হলো হক্ব থেকে বিচ্যুত হওয়া, অথবা দ্বীনের বিষয়কে নফস কিংবা জনগণের কাছে পছন্দনীয় করা। তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ওই মত গ্রহণ করে, যেটা ওই সময়ে জনপ্রিয়। এটা তারা করছে অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য। জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য। প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে গিয়েও মানুষ কিংবা শাসককে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এমন করে। তার ওপর তাদের এ পরিবর্তন শুধু ফিকহে না; বরং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের আকীদাহও তারা পালটে ফেলেছে। কিন্তু ইমাম আশ-শাফে'ঈর দুই অবস্থানের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর পরবর্তী মাযহাব–অর্থাৎ মিসরের মাযহাব–সামষ্টিকভাবে তুলনামূলকভাবে বেশি শক্ত ও কঠোর। অর্থাৎ ইমাম আশ-শাফে'ঈ শক্ত অবস্থান থেকে সহজ অবস্থানে আসেননি; বরং তিনি তুলনামূলক সহজ অবস্থান থেকে কঠিন অবস্থানে গেছেন। অন্যদিকে আকীদাহর ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর উসুল বা মূলনীতিসমূহে কোনো পরিবর্তন আনেননি। মাযহাব পরিবর্তনের পর আশ-শাফে'ঈর অবস্থানে কী কী পরিবর্তন এসেছিল তা দেখা যাক।

ক) নতুন মাযহাবে তিনি সতর্কতার মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক মত গ্রহণ করেছিলেন। আপনি যখন বেশি সতর্কতা অবলম্বন করবেন তখন স্বভাবতই বিষয়টি কঠিন হবে।

খ) তিনি নতুন মাযহাবে মাসালিহুল মুরসালাহ[১৬৯] বা বৃহত্তর জনস্বার্থের নীতি

---

[১৬৮] ইমাম আন নাওয়াউই (ﷺ), আল মাজমু : ১/৬৬

[১৬৯] এটি দুটি শব্দের সমন্বয়, المصلحة মানে কল্যাণ, আর المرسلة মানে ব্যাপক, অর্থাৎ المصالح المرسلة মানে ব্যাপক কল্যাণ। পারিভাষিকভাবে মাসালিহুল মুরসালাহ মানে এমন কল্যাণ যার বিধান শার'ঈ নস তথা কুরআন ও সুন্নাতে সরাসরি আসেনি, এসব কল্যাণ গ্রহণের বিধান যেমন আসেনি তেমনি বাতিল করার কথাও আসেনি। তাই এগুলোর ওপর আমল করা যায়। যেমন : উমার (ﷺ) রেজিস্ট্রার চালু করেন, কারাগার বানান। এগুলোর নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে নেই কিন্তু এগুলো করা যাবে না তা-ও বলা নেই। জনকল্যাণে তাই এগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে।-বিস্তারিত দেখুন : উস্তায ড. মুস্তাফা আয যুহাইলী, আল ওয়াজিয ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী: ১/২৫৩
হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবে মাসালিহুল মুরসালাহ কোনো স্বতন্ত্র দলিলযোগ্য কিছু নয়।-উস্তায আল্লামা

ব্যবহার করেননি। যদিও এই নীতির ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিথিলতা বা তুলনামূলক সহজ অবস্থান তৈরি করে।

গ) তাঁর নতুন মাযহাবে তিনি উরফের চেয়ে নুসুস বা দলিলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উরফ হলো কোনো অঞ্চলের প্রথা-প্রচলন, ঐতিহ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে তাঁর নতুন অবস্থান তাঁর পুরোনো অবস্থানের তুলনায় কঠোর ছিল। আসলে বিষয়টি কঠোরতার না, বরং সঠিক হবার। তাঁর পরবর্তী অবস্থান অধিকতর সঠিক ছিল।

তাঁর মত পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

ইরাকে থাকাবস্থায় ইমাম শাফে'ঈ স্বর্ণের এবং রুপার থালা ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ মাকরুহ মনে করতেন। মিসরে তিনি স্বর্ণ এবং রুপার থালা ব্যবহারকে হারাম বললেন। ইরাকে যেটি মাকরুহ ছিল, মিসরে যাবার পরে সেটা হারাম বললেন। তুলনামূলক কঠোর মত গ্রহণ করলেন।

ইরাকে তাঁর মত ছিল, কেউ সালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলেও তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে। নতুন করে আবার সেই সালাত আদায় করতে হবে না। কিন্তু মিসরে যাবার পরে বললেন, না! কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যায়, তাহলে তার সালাত হবে না। তাকে আবার সালাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ পরে তিনি তুলনামূলক কঠোর মত গ্রহণ করেছিলেন।

ইরাকে থাকাবস্থায় তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, কুকুরের লালা লাগলে ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব না। মিসরে যাবার পর তিনি বললেন, এটা ধোয়া ওয়াজিব। মিসরে যাবার পর তাঁর মত আরও কঠোর হলো।

তাহলে আকীদাহ বদলে ফেলা আজকের এই লোকগুলো কীভাবে তাদের জঘন্য পরিবর্তনের পক্ষে শাফে'ঈ (ﷺ)-কে দলিল হিসেবে টেনে আনে?

আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়।

ইরাকে থাকতে তিনি বলতেন, কেউ যদি ওযুর ক্রমধারা অনুসরণ না করে (যেমন হাত ধোয়ার আগে পা ধোয়) তাহলেও ওযু হয়ে যাবে। এমন করা পছন্দনীয় না, কিন্তু এভাবে করলেও ওযু হয়ে হবে। মিসরে যাবার পর তিনি এ ব্যাপারে কঠোর হলেন। বললেন, কেউ ওযুর ক্রমধারা না মানলে তার ওযু হবে না। তাকে আবার ওযু করতে হবে। ইরাকে থাকতে তিনি বলতেন, ঘুমিয়ে গেলে ওযু ভেঙে যায় না; কিন্তু মিসরে যাওয়ার পরে বললেন, ঘুমিয়ে পড়লে ওযু ভেঙে যায়।

মুস্তাফা আয যারকা, আল মাদখালুল ফিকহি : ১/৭৬

ইরাকে থাকা অবস্থায় ইমাম আশ-শাফে'ঈর ফতোয়া ছিল, কোনো মহিলার স্বামী সফর থেকে ফিরে না এলে স্বামীর জন্য সে চার বছর অপেক্ষা করবে। চার বছর পরও স্বামী ফেরত না এলে তাকে মৃত ধরে নিয়ে ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে। মিসরে যাবার পর এই মত পরিবর্তন করে তিনি বলেছিলেন, স্বামী ফিরে না এলেও কোনো নারী চার বছর পরে ইদ্দত পালন করতে পারবে না, বিয়েও করতে পারবে না। স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষা হতে পারে কমপক্ষে ১০ বছর বা তার চেয়েও বেশি।

এই ব্যাপারে অবশ্য আরও কিছু বিষয় আছে। যেমন : এমন নারী খলীফা বা ক্বাযীর কাছে যেতে পারবে, ইত্যাদি। তবে এখানে পয়েন্ট হলো, ইরাকে তিনি বলেছিলেন ৪ বছর অপেক্ষা করলে তা যথেষ্ট হবে, কিন্তু পরে বলেছেন ১০ বছরের বেশি হতে হবে। অর্থাৎ তিনি তুলনামূলক কঠিন মত গ্রহণ করেছেন। নিরুদ্দেশ স্বামীর এ ব্যাপারটি নিয়ে সাহাবী (ﷺ)-এর থেকে ২টি মত আছে। ইবনু আব্বাস (ﷺ) মনে করতেন স্বামী ফিরে না এলে স্ত্রীকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) ইরাকে থাকাকালীন ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর এই মতটি গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে আলী ইবনু আবি তালিব (ﷺ) এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মত ছিল, স্বামী ফিরে না এলে স্ত্রীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইবনু আব্বাসের তুলনায় আলীর মত তুলনামূলকভাবে কঠোর, রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারতেন, যেহেতু দুইটি মতই সাহাবীদের। কিন্তু তুলনামূলক সহজ ফতোয়াটি গ্রহণ না করে তিনি কঠিনটি গ্রহণ করেছিলেন।

কাজেই এসব বাজে অজুহাত দিয়ে ইমাম আশ-শাফে'ঈর অপমান করবেন না। দুনিয়ার জন্য, জনপ্রিয়তার জন্য, নফসের জন্য কিংবা শাসকের ভয়ে নিজেদের আকীদাহ বদলে ফেলে এই দাবি করবেন না যে, 'আমরা শাফে'ঈর মতো'।

ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ) ইরাক থেকে মিসর গিয়েছিলেন, মক্কা এবং হিজায পাড়ি দিয়ে। এই সফরে বিভিন্ন শহর পাড়ি দেয়ার সময় তিনি নতুন করে বিভিন্ন দলিল পেয়েছিলেন, যেগুলোর আলোকে তিনি তাঁর অবস্থান বদলেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর পরিবর্তন ছিল ফিকহে–আকীদাহতে না, আল ওয়ালা ওয়াল বারাতে না। অথচ আজকের এসব লোকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ বদলে ফেলে দাবি করছে যে, তারা নাকি শাফে'ঈর মতো!

সেই সময়ে ইলম এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। তথ্য এত সস্তা ছিল না। তাদের হাতে আইফোন ছিল না। চোখের পলক ফেলার আগে লাখ লাখ রেফারেন্স

থেকে সার্চ করে সঠিক তথ্য বের করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না। একটি বা দুটি হাদীসের জন্য তাঁদের মাসের পর মাস দীর্ঘ সফর করতে হতো। দেশ-মহাদেশ পাড়ি দিতে হতো। আল বাইহাক্বী তাঁর মানাক্বিব আশ শাফে'ঈ গ্রন্থে ইমাম শাফে'ঈ (ﷺ)-এর মাযহাব পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর ছাত্র ইমাম আহমাদ (ﷺ)-এর একটি মন্তব্য আলোচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন,

عليك بالكتب التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُحْكِمْهَا. ثم رجع إلى مصر فَأَحْكَمَ ذلك

'তুমি আশ শাফে'ঈর সেসব কিতাব অনুসরণ করবে যা তিনি মিসরে প্রণয়ন করেছেন। কেননা তিনি এসব কিতাব ইরাকে প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু এগুলো যথাযথ করেননি। এরপর তিনি মিসরে গিয়েছিলেন এবং সেগুলো মজবুত করেছেন।'[১৭০]

এটি হলো ইমাম আহমাদের বক্তব্য। যিনি আশ-শাফে'ঈর ছাত্র ছিলেন।

ইমাম শাফে'ঈ নতুন দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করেছিলেন। নিফাকী থেকে বা ইসলামের শত্রুদের খুশি করার জন্যে না। আর তিনি শুধু মাযহাব (ফিকহ, মাস'আলা-মাসায়েল) পরিবর্তন করেছিলেন। আকীদাহ না।

ইসলামী পরিভাষা বদলে দেয়ার যুদ্ধ

ইসলামের শত্রুরা আজ বিশ্বজুড়ে কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী পরিভাষাগুলোর অর্থ বদলে দেয়া, বিকৃত করা এবং পুরোপুরি মুছে ফেলার লক্ষ্যে। আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে আজ সঠিকভাবে বুঝতে হলে আগে এটা বুঝতে হবে। শয়তান এবং ফিরআউন, দুজনেই এ কৌশল ব্যবহার করেছিল। আজকের মুনাফিকরা এ দুজনের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। তারা ইসলামী পরিভাষাগুলো বদলাচ্ছে, সেগুলোর অর্থ এবং সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে, অথবা সেগুলো পুরোপুরি মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

শয়তান আদম (ﷺ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে সরাসরি আদম (ﷺ)-কে বলেনি, 'ওই গাছের ফল খাও'। মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে সে একে উপস্থাপন করেছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল, যেন সে আসলে আদম (ﷺ)-এর উপকার করতে চায়। আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, বলল, 'হে আদম, আমি কি তোমাকে

[১৭০] ইমাম বাইহাক্বী (ﷺ), মানাকিবুশ শাফিঈ : ১/২৬৩

বলে দেবো অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?" [সূরা ত্বহা, ২০: ১২০]

খেয়াল করে দেখুন, শয়তান কীভাবে ওই গাছের পরিচয় দিচ্ছে। সে শুধু গাছ বলেনি। সে বলেছে 'অনন্ত জীবনদায়িনী গাছ'। সে বিষয়টিকে সুন্দর, উত্তম, উপকারী হিসেবে তুলে ধরেছে। এটা হলো শয়তানের কৌশল, শয়তানের ধোঁকা। এগুলো হলো শয়তানী পরিভাষা। অভিশপ্ত, ক্ষতিকর বিষয়কে সে উপকারী এবং সুন্দর হিসেবে তুলে ধরে। সে কথার পসরা সাজিয়ে বলেছে, এই গাছটি সাধারণ কোনো গাছ না। এই গাছের ফল খেলে তুমি এই চিরসুখের জান্নাতে অনন্তকাল ধরে বসবাস করতে পারবে। পাবে অক্ষয় রাজত্ব। ক্ষতিকর একটা জিনিসকে সে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আজ হুবহু এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বদলে ফেলা হচ্ছে। বদলে ফেলা হচ্ছে ইসলামী পরিভাষাগুলো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ব্যাপারে আমাদের এই ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে,

لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ مِن أُمَّتِي الخَمْرَ، يُسمُّونَها بغيرِ اسمِها

'অবশ্যই আমার উম্মাহ থেকে একদল লোক মদ পান করবে। তারা মদকে এর নিজের নাম ব্যতীত অন্য নামে নামকরণ করবে।'[১৭১]

সুনান ইবনু মাজাহর আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে,

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

'ততদিন পর্যন্ত দিন ও রাতের অবসান ঘটবে না, যতদিন না আমার উম্মতের একদল লোক মদ পান করবে আর একে ভিন্ন নামে নামকরণ করবে।'[১৭২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই হাদীসে মূলত বলেছেন, এই উম্মাহর কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তারা সেটাকে অন্য নাম দেবে। তারা মদ খাবে কিন্তু মদকে 'মদ' না বলে অন্য কিছু বলবে। তারা রিবা বা সুদ খাবে, কিন্তু সেটাকে রিবা না বলে অন্য কিছু বলবে। ইন্টেরেস্ট, লভ্যাংশ, মুনাফা ইত্যাদি।

এখন আরবে মদকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন : (مشروبات روحية) মাশরুবাত রুহিয়্যাহ। হাদীসে মদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ হলো 'খামর'। খামর শব্দটা এখন ব্যবহার

[১৭১] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৬৮৮, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সহীহ লি গাইরিহ।

[১৭২] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ৩৩৮৪, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে সহীহ লি গাইরিহ।

করা হয় না। মদকে যখন মাশরুবাদ রুহিয়্যাহ বলা হবে তখন সেটা মনে আলাদা ধরনের একটা প্রভাব ফেলবে। আপনি যখন মদকে অন্য কোনো নামে ডাকবেন তখন হারাম-হালালের অনুভূতির তীব্রতা কমে যাবে। মদকে যখন মদ বলা হবে, যখন 'খামর' শব্দটা ব্যবহার হবে তখন এর সাথে যুক্ত সব হাদীসের কথা চলে আসবে। এমন অবস্থায় মদ পান করার সময় অন্তর থেকে একটা বাধা কাজ করবে, মন খচখচ করবে। কিন্তু মদকে যখন বিয়ার, রাম, ভদকা, জিন, ওয়াইন, টাকিলা কিংবা মাশরুবাত রুহিয়িয়্যাহ ডাকা হবে, তখন প্রভাবটা ভিন্ন হবে। মদ খাচ্ছেন, হারাম কাজ করছেন এই অনুভূতিগুলোর তীব্রতা কমে আসবে।

ইসলামী পরিভাষার অর্থ বদলে দেয়ার আধুনিক একটা উদাহরণ দেখা যাক।

শূরা। শূরার অর্থ পালটে দেয়ার জন্য আজ কিছু লোক খুব মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বলছে শূরা হলো গণতন্ত্র, গণতন্ত্র হলো শূরা। কেন এমন বলা হচ্ছে? এই কথা বলে কুফরি গণতন্ত্রকে ইসলামের লেবাস পরানো হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যত কুফর আছে সেগুলোকে বৈধ হিসেবে, ইসলামী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটা একধরনের মাইন্ডগেম। তারা প্রথমে গণতন্ত্রকে শূরা হিসেবে কিংবা শূরার একটি সংস্করণ হিসেবে উপস্থাপন করছে। এটা করে শুরুতেই তারা সাধারণ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। সাধারণ মুসলিম ভাবছে, শূরা তো ইসলামে আছে। তার মানে অবশ্যই সেটা ভালো। আর গণতন্ত্র যদি শূরা হয়, তাহলে গণতন্ত্রও নিশ্চয় ভালো।

আজকাল এমন অনেক লোকের কথা শুনবেন যারা সংস্কার আর পরিবর্তনের কথা বলে। তারা দাবি করে, 'ইসলামই আমাদের সংস্কার করতে বলে। আমরা আসলে আমাদের ভাষা, আমাদের বক্তব্যের সংস্কার করছি। এখানে আপত্তির কী আছে?'

কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখবেন, দাওয়াহর পদ্ধতি বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা বললেও তারা আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বদলে ফেলছে।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রশস্ততা আছে। দাওয়াহর ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। দাওয়াহর সময় সবাইকে হুবহু একই কথা, একই বাক্য ব্যবহার করতে হবে, কিংবা একই বিষয় নিয়ে ইসলামের আলোচনায় যেতে হবে—এমন কোনো কথাও নেই। বিভিন্ন প্রযুক্তি, ভাষা, মাধ্যম, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ এখানে আছে। কিন্তু ইসলামকে সংস্কার করার, ইসলামের শিক্ষাকে বদলাবার কোনো সুযোগ নেই। যারা আজ সংস্কারের কথা বলে, তারা ইসলামের শিক্ষাকে বদলাতে চাচ্ছে; কিন্তু মুখে বলছে, 'আমরা শুধু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছি'।

ফিরআউন অনেক প্রতাপশালী শাসক ছিল। কিন্তু সেও শুধু গায়ের জোরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারেনি। তাকে বিভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ফিরআউন তার অধীনস্থদের উদ্দেশে বলত,

وَمَآ أَهۡدِيكُمۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ

'ফিরআউন বলল, আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখাই।' [সূরা গ্বাফির, ৪০: ২৯]

ফিরআউন দাবি করেছিল, আমি তোমাদের সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছি। তার এ কথার কারণে লোকেরা ধরে নিল, সঠিক পথ হলো ফিরআউনের পথ। যদিও বাস্তবতা ছিল উল্টো। ফিরাউন 'সাবিলুর রশীদ' অর্থাৎ সঠিক পথের অর্থ বদলে দিলো। সে বলল, সাবিলুর রশীদ মানে আমার পথ। যেটা আমার পথ, সেটাই সঠিক পথ। সাধারণ মানুষ তার এ কথা বিশ্বাস করল। এটা তাদের মনে গেঁথে গেল।

একইভাবে ফিরআউন ভ্রান্ত পথের সংজ্ঞা আর অর্থও বদলে দিলো। সে বলল, মুসা (ﷺ) আর হারুন (ﷺ)-এর পথ হলো ভ্রান্ত পথ। সে আরও অগ্রসর হয়ে বলল,

إِنۡ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخۡرِجَاكُم مِّنۡ أَرۡضِكُم بِسِحۡرِهِمَا وَيَذۡهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلۡمُثۡلَىٰ

'এ দুজন অবশ্যই জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনপদ্ধতি ধ্বংস করে দিতে।' [সূরা ত্বহা, ২০: ৬৩]

এবং,

فَقَالَ لَهُۥ فِرۡعَوۡنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسۡحُورٗا

'ফিরআউন তাকে বলল, 'ওহে মুসা, আমি তোমাকে অবশ্যই জাদুগ্রস্ত মনে করি।" [সূরা আল ইসরা, ১৭: ১০১]

এভাবে ফিরআউন ভ্রান্ত পথকে সঠিক আর সঠিক পথকে ভ্রান্ত হিসেবে তুলে ধরল। সাধারণ মানুষ তার কথা বিশ্বাস করল। তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে নিল। মুসা ও হারুন (ﷺ)-কে দেখে তারা ভাবল, এরা তো জাদুগ্রস্ত! এদের কথা আমরা কেন শুনব? ফিরআউনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, তার শব্দের খেলা এখানে থামেনি। চরম ঔদ্ধত্য নিয়ে সে 'রব' শব্দের অর্থই বদলে দিলো। সে দাবি করল, সে নিজেই রব! আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ফিরআউন দাবি করেছিল,

فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ

'সে বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব।" [সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯: ২৪]

শব্দের সংজ্ঞা আর অর্থ বদলে দেয়া, বিকৃত করা, শয়তান আর ফিরআউনের কূটকৌশল। এ কৌশল ব্যবহার করেই আজকের মুনাফিকরা ইসলামী পরিভাষাগুলোর অর্থ বিকৃত করে। সত্যের সাথে মিথ্যে মিশিয়ে বদলে ফেলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে। নিফাককে সত্য আর সত্যকে নিফাক হিসেবে অভিহিত করে। আল্লাহর আনুগত্যকে ফিসক আর ফিসকে আনুগত্য হিসেবে উপস্থাপন করে। আর সাধারণ মানুষ বাস্তবতা বুঝতে পারে না, কারণ শব্দের অর্থ আর সংজ্ঞা মুনাফিকরা বদলে দিয়েছে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষা বদলে ফেলা

আকীদাহ এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে বিচ্যুতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো শব্দ ও পরিভাষার অর্থ বদলে দেয়া। অর্থ বদল, বিকৃতি আর মুছে দেয়ার এই কৌশল আজ বিশ্বে–বিশেষ করে পশ্চিমে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহর বিরুদ্ধে একটি প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। রাফিদ্বি শিয়াদের মধ্য থেকে আহলুস সুন্নাহর সাথে যাদের দূরত্ব তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম, এমন কোনো ধারার সত্যিকারের জ্ঞানসম্পন্ন কোনো রাফিদ্বি শিয়াকে যদি বলেন, 'আমি তোমাদের বারো ইমামে বিশ্বাস করি না। তোমরা তাদের ব্যাপারে যে আকীদাহ রাখো, আমি তা রাখি না।' তাহলে সে আপনাকে কাফির বলবে। সে যদি প্রকৃত রাফিদ্বি শিয়া হয়, নিজেদের আকীদাহর ব্যাপারে জ্ঞান রাখে এবং সত্য গোপন না করে, তাহলে সে নির্দ্বিধায় আপনাকে কাফির বলবে। এখানে জ্ঞানসম্পন্ন শিয়া বলতে বোঝাচ্ছি, এমন কোনো ব্যক্তি যে এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কিতাবাদি পড়েছে এবং ভালো ধারণা রাখে।

তাদের মুখ থেকে এ কথা শুনতে না চাইলে সরাসরি তাদের কিতাবাদি খুলে দেখুন। তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ আল কাফি খুলুন। আল কাফি আপনাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে, তাদের বারোজন ইমামের ব্যাপারে যারা তাদের মতো আকীদাহ রাখে না, তারা কাফির।[১৭৩] রাফিদ্বি শিয়াদের মতে, মুমিন হতে হলে ওই বারোজন ইমামের ব্যাপারে তারা যেমন আকীদাহ রাখে তেমন আকীদাহ থাকতে হবে।

একইভাবে আপনি যদি কোনো খ্রিষ্টানের কাছে গিয়ে বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, ঈসা (ﷺ) আল্লাহর একজন নবী; কিন্তু তিনি সৃষ্টিকর্তা নন। আখিরাতে নাজাত

---

[১৭৩] আল কাফি শিয়াদের নিকট সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব। এর লেখক মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল কুলাইনী। এটি ৩ অংশে বিভিক্ত–উসুলুল কাফি, ফুরু'উল কাফি ও রাওদাতুল কাফি। এতে মোট ১৬,১৯৯টি বর্ণনা রয়েছে। এর লেখক আল কুলাইনীর জন্ম ২৫০ হিজরিতে ইরানের রায় এলাকার কুলায়ন গ্রামে, মৃত্যু ৩২৯ হিজরিতে।

তিনি দেবেন না। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি।' তাহলে তাদের কাছে আপনি একজন কাফির। তারা আপনাকে কাফির গণ্য করবে। তাদের মধ্যে যারা সত্যবাদী তারা নির্দ্বিধায় আপনাকে এটা জানিয়ে দেবে। কারণ ওরা বিশ্বাস করে কেউ যদি সম্ভাব্য সব গুনাহ করে, সে যদি পাপের সাগরে হাবুডুবুও খায়, কিন্তু বিশ্বাস করে যে ঈসা (ﷺ) মানবজাতির রক্ষক, আখিরাতে রক্ষাকারী, তাহলে সেই ব্যক্তি আখিরাতে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার পরও ঈসা (ﷺ)-এর ব্যাপারে এই আকীদাহ না রাখে, তাহলে সে কাফির এবং সে আখিরাতে জাহান্নামে থাকবে। এটা হলো খ্রিষ্টানদের আকীদাহ।

কিন্তু আজ আমাদের কী অবস্থা? বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে থাকা মুসলিমদের কী অবস্থা? যে শব্দ মহান আল্লাহ ব্যবহার করেছেন সেটা আজ এসব মুসলিমদের কাছে কঠোর মনে হচ্ছে! অথচ আল্লাহ হলেন পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। তিনি আর রাহমান। আর রাহীম। বিশাল এ পৃথিবীর মাঝে দয়ার যত নিদর্শন আমরা দেখি, যত দয়া অতীতের গহ্বরে জমা হয়েছে, যা অজানা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত আছে, সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যে দয়া বিরাজমান থাকবে, তা মহান আল্লাহর দয়ার এক শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বাকি ৯৯ ভাগকে মহান আল্লাহ সঞ্চিত করে রেখেছেন বিচার দিবসের জন্য।[১৭৪] আমরা দু'আ করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন শেষ দিবসে তাঁর রহমত থেকে আমাদের বঞ্চিত না করেন।

কাফির শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই দয়াময় আল্লাহ, পরম করুণাময় আল্লাহ। সেখানে মানুষ এসে বলছে, এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আবার এরা নিজেদের মুসলিম দাবি করছে!

কেউ যখন 'কাফির-মুশরিক' শব্দ দুটো বাদ দিতে চায়, তখন তারা আসলে এই শব্দ এবং এর সাথে যুক্ত ধারণাকে বিকৃত করছে। সেই সাথে আকারে ইঙ্গিতে দাবি করছে, তারা মহান আল্লাহর চেয়ে বেশি দয়াশীল। নাউযুবিল্লাহ। মহান আল্লাহ যাদেরকে কুফফার বলেছেন, এরা বলছে তাদেরকে কুফফার বলা যাবে না। আমাদের আরও সহানুভূতিশীল হতে হবে, আরও দয়াশীল হতে হবে!

কাফির শব্দটি মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে আনা কোনো শব্দ না। এটা আমরা পেয়েছি কুরআন থেকে। কাফির, কুফর, কাফিরিন, কুফফার, আল্লাযিনা কাফারু—এ শব্দগুলো

---

[১৭৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ দয়াকে এক শ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর ৯৯ ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন আর দুনিয়ায় এক ভাগ নাযিল করেছেন। এই এক ভাগ থেকেই সৃষ্টিকুল পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের ওপর খুর তুলে ধরে, যেন সে আঘাত না পায়।'-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৫২

কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে চার শ বারেরও বেশি। মুশরিক, শিরক এবং এর সাথে যুক্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে দুই শ বারের বেশি।

কুফফার শব্দটি এসেছে ১৪ বার।

এর বহুবচন কাফিরিন শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে ৫৫ বার।

আল্লাযিনা কাফারু এসেছে ১৫২ বার।

এই শব্দগুলো কেন এতবার কুরআনে এসেছে? যাতে আমরা বুঝতে পারি, যার ঈমান আছে সে মুমিন আর যার ঈমান নেই সে কাফির। মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য জানা, এ দুইকে শ্রেণিকে আলাদা করতে পারা আল ওয়ালা ওয়াল বারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুমিন ও কাফিরের যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর ব্যবহৃত শব্দগুলোকেও বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ (ﷻ) যাদেরকে কাফির বলেছেন তাদের কাফির হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে এবং যাদেরকে বিশ্বাসী বলেছেন তাদেরকে বিশ্বাসী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কাশশাফুল ক্বিনা কিতাবে আল-বাহুতি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> (أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ) أَيْ تَدَيَّنَ (بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ كَالنَّصَارَى) وَالْيَهُودِ (أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ) فَهُوَ كَافِرٌ
>
> 'ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের (যেমন:খ্রিষ্টধর্ম বা ইহুদী ধর্মের) অনুসারীদেরকে যারা কাফির বলবে না বা তাদের কুফরে সন্দেহ পোষণ করবে বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করবে, সে কাফির।'[১৭৫]

শুধু আল বাহুতি নন, অন্য আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। যেসব লোকেরা অভিধান থেকে কাফির শব্দটি মুছে ফেলতে চায় বা এর মৌলিক সংজ্ঞা বদলে দিতে চায় তারা প্রকারান্তরে এটাই দাবি করছে যে, তারা আল্লাহর চেয়েও বেশি দয়ালু। সেই সাথে মনে করছে তারা কুরআনের প্রুফরিড আর সম্পাদনা করার যোগ্য। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ (ﷻ) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

> وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ
>
> 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮৫]

যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন বা অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, সে কাফির।

---

[১৭৫] ইমাম মনসুর বিন ইউনুস আল বাহুতি আল হাম্বলী (রহিমাহুল্লাহ), কাশশাফুল ক্বিনা : ৬/১৭০

এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। এখানে সংযোজন, বিয়োজন, সম্পাদনার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহর বান্দা হিসেবে তা বাদ দেয়ার, মুছে ফেলার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

দেখুন আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে কী বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির, কেউ মুমিন; তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।' [সূরা আত তাগাবুন, ৬৪: ২]

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর সৃষ্টিকে দুই দলে ভাগ করেছেন। কেউ মুমিন, কেউ কাফির। এখানে তৃতীয় কোনো ভাগ নেই। তৃতীয় কোনো দলের কথা তিনি বলেননি। যেসব লোক এ দুই দলের বাইরে তৃতীয় কোনো দলের কথা বলে তারা কী করছে? নিক্ষিপ্ত, ঘৃণিত বীর্য থেকে সৃষ্ট মানুষ বলছে, 'ইয়া আল্লাহ, আমার ধারণা আপনি ভুল করছেন!'

তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে তারা ঠিক এ কথাই বলছে। যখন কেউ বলে আল্লাহ যাদেরকে কাফির বলেছেন তাদেরকে কাফির বলা উচিত না, বা তাদের কাফির মনে করা উচিত না, তখন সে তার এ কথার মাধ্যমে দাবি করছে যে মহান আল্লাহ ভুল করেছেন। মা'আযআল্লাহ ওয়া তা'আল-আল্লাহু আন যালিকা উলুওয়্যান কাবীরা।

আজ থেকে বহু শতাব্দী আগে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম[১৭৬] (رحمه الله) এ ধরনের মানুষদের নিয়ে লিখে গেছেন। দ্বীন ইসলামের পরিভাষা নিয়ে যারা লুকোচুরি করে, ছলচাতুরী করে, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

'তারা তো গুনাহ করেছেই, তার ওপর আল্লাহর সঙ্গে ছলনা করার মাধ্যমে আরেকটি গুনাহ যুক্ত করছে।'[১৭৭]

তিনি বলেছেন এটি হলো খিদ'আ (خداع), গ্বীশ (غش) এবং নিফাক। অর্থাৎ প্রতারণা, ছলচাতুরী এবং মুনাফিকী। ইবনুল কাইয়্যিম এ কথাগুলো বলেছেন তার সময়ের লোকদের ব্যাপারে। তারা আকীদাহর শব্দ আর পরিভাষা নিয়ে ছলচাতুরী, প্রতারণা করছিল না। তারা এ ধরনের ছলচাতুরী করছিল হালাল-হারামের ব্যাপারে।

---

[১৭৬] তাঁর মূল নাম মুহাম্মাদ বিন আবি বাকর বিন আইয়্যুব। তিনি ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস, আকীদাহ বিশেষজ্ঞ, আবিদ, যাহিদ, সীরাতকার। তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله)-এর প্রধানতম ছাত্র ও আজীবন সহচর। তাঁর প্রখ্যাত কিতাব মাদারিজুস সালিকীন, যাদুল মা'আদ, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ইগাসাতুল লাহফান, আহকামু আহলিয যিম্মাহ প্রভৃতি।

[১৭৭] ইমাম ইবনুল কায়্যিম (رحمه الله) এই আলোচনা ই'লামুল মুওয়াক্কিঈনের ৩য় খণ্ডে ذِكْرُ أَسْمَاءٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ অধ্যায় ও فَصْلٌ صِيَغُ الْعُقُودِ এ আলোচনা করেছেন।

যেমন মদের নাম বদলে দিয়ে তারা একে হালাল করতে চাইত। এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন,

> 'তারা তো গুনাহ করেছেই, তার ওপর আল্লাহর সঙ্গে ছলনা করার মাধ্যমে আরেকটি গুনাহ যুক্ত করছে।'

নিঃসন্দেহে হালাল-হারাম নিয়ে এ ধরনের প্রতারণা করা অনেক গুরুতর সীমালঙ্ঘন। কিন্তু আকীদাহর ব্যাপারে এমন করা আরও অনেক বেশি গুরুতর ব্যাপার। হালাল-হারামের ব্যাপারে যারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করতে চায় তাদের ব্যাপারে যদি ইবনুল কাইয়্যিম এত শক্ত কথা বলেন, তাহলে যারা আজ শুধু হালাল-হারাম পরিবর্তন করেনি, বরং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ আর কুরআনের উল্লেখিত শব্দের অর্থ বদলে ফেলছে, তাদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন?

আইয়্যুব (ﷺ) বলেছিলেন,

> يُخَادِعُونَ اللهَ كَمَا يُخَادِعُونَ الصِّبْيَانَ
>
> 'যেভাবে শিশুদের ধোঁকা দেয়া হয়, তারা সেভাবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করতে চায়।'[১৭৮]

এখানে আইয়ুব (ﷺ)[১৭৯] সেই লোকগুলোর কথা বলেছেন যারা হালাল-হারামের ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রতারণা করে। চিন্তা করুন, আজকের এসব লোকদের অবস্থা দেখলে তারা কী বলতেন? আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ সার্বিকভাবে ইসলামী পরিভাষার প্রতিরক্ষা করে। একই সাথে আল ওয়ালা ওয়াল বারার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত পরিভাষার অর্থ রক্ষা করাও আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহর অংশ। কাজেই আল ওয়ালা ওয়াল বারা একই সাথে আম এবং খাস।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার শ্রেণিবিভাগ

এখন আমরা সংক্ষেপে এবং সহজভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। এ শ্রেণিবিভাগ বোঝা এবং মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। অনেকেই ওয়ালা এবং বারার কিছু অংশের ওপর আমল করে আর বাকিটা ছেড়ে দেয়। এভাবেই তারা গোমরাহ হয়।

---

[১৭৮] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ), ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন : ৩/৯৯

[১৭৯] আইয়্যুব সিখতিয়ানি (ﷺ) প্রবীণ তাবিঈদের অন্যতম। জন্ম ৬৬ হিজরিতে মৃত্যু ১৩১ হিজরিতে। ইলম আমল সকল দিক দিয়েই তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। প্রখ্যাত ইমাম ইবনু সিরিন (ﷺ) যখন আইয়্যুব সিখতিয়ানির বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, حدثني الصدوق আমার কাছে সত্যবাদী ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছে।-হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৪

প্রথম শ্রেণি: তাওয়াল্লি

কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণের প্রথম শ্রেণি হলো তাওয়াল্লি (تولي)। তাওয়াল্লি একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ এটি কুফর আকবর। তাওয়াল্লি কুফর আকবর হবার অনেক দলিল আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো এই আয়াত :

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
>
> 'হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।' [সূরা মায়িদাহ, ৫: ৫১]

আল্লাহ আমাদের এখানে বলছেন, কেউ যদি কাফিরদের, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের একজন হিসেবে গণ্য হবে। মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর শত্রুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তারা যেসব মিথ্যা ইলাহের উপাসনা করে তাদের সাথেও সব ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

আমরা সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (رضي الله عنه)-কে নিয়ে আগের একটি দারসে কথা বলেছিলাম।[১৮০] হুযাইফা (رضي الله عنه) বলেছেন,

> لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
>
> 'তোমাদের প্রত্যেকের সতর্ক হতে হবে, নয়তো কেউ হয়তো ইহুদী বা খ্রিষ্টান হয়ে যাবে; অথচ সে টেরও পাবে না।'[১৮১]

তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

> وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ
>
> 'আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।' [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫১]

তাওয়াল্লি বলতে কোন ধরনের আচরণ, অনুভূতি ও লেনদেনকে বোঝানো হচ্ছে? কিছু উদাহরণ দেখা যাক। বিষয়টি ভালোভাবে খেয়াল করবেন। একটি শব্দ এদিক-ওদিক হলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখা দেবে।

---

[১৮০] দারস ৭ দ্রষ্টব্য।

[১৮১] ইমাম সুয়ূতী (رحمه الله), আদ দুররুল মানসুর : ৫/৩৪৬

প্রথম উদাহরণ: শিরকের প্রতি ভালোবাসা। শিরকের প্রতি ভালোবাসা একটি ঈমান বিধ্বংসী বিষয়, এর আগে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। একই সাথে এটি আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে ক্রটি। আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে কমতি না থাকলে কেউ শিরককে ভালোবাসতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ: মুশরিকদেরকে তাদের শিরকের কারণে ভালোবাসা। অর্থাৎ মুশরিকরা শিরক করে, এই কারণে কেউ তাদের ভালোবাসে। এটিও ঈমান বিধ্বংসী একটি বিষয়।

তৃতীয় উদাহরণ: কুফরকে ভালোবাসা। এটি শিরককে ভালোবাসার মতোই। যে কুফরকে ভালোবাসে সে কাফির। যার অন্তরে কুফরের প্রতি ভালোবাসা আছে সে যদি কাবার পাশে দাঁড়িয়ে, কাবার গায়ে হাত রেখে দু'আ করতে থাকতে, তবুও সে কাফির। সে যদি সালাত আদায়রত অবস্থাতেও থাকে কিন্তু তার অন্তরে কুফরের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাহলে সে তার দ্বীনকে নাকচ করে দিয়েছে। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। উল্লেখ্য, এখানে কুফরের প্রতি ভালোবাসা বলতে কুফর বিশ্বাসের প্রতি ভালোবাসা বোঝাচ্ছি।

চতুর্থ উদাহরণ: কাফিরদেরকে তাদের কুফরি বিশ্বাসের কারণে ভালোবাসা। এটিও মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। কোনো ব্যক্তি তার বিছানায় শুয়ে আছে, অথবা সালাতে দাঁড়িয়েছে, অথবা কাবার গিলাফ ধরে আছে, কিন্তু তার অন্তরে কাফিরদের প্রতি তাঁদের কুফরের কারণে ভালোবাসা আছে। তাহলে এই ভালোবাসা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেবে। আল ইয়াযুবিল্লাহ।

বুঝতে পারছেন হুযাইফা (ﷺ) কেন এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন? আপাতভাবে এটা খুব ছোট ব্যাপার। এই লোক কিন্তু কিছু করছে না। সে কাফিরদের সাহায্য করছে না। কুফরি প্রচার করছে না। সে কাফিরদের সাথে তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে ইবাদত করছে না। সে কেবল কুফরের কারণে কাফিরদের ভালোবাসছে—এটুকুর জন্য সে কাফির হয়ে যাবে।

পঞ্চম উদাহরণ: ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ইসলামের ওপর কুফরের বিজয়ের জন্য, অথবা কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য। এমন কাজে তাদেরকে সাহায্য করা কুফর আকবর। যে এমন করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। মুরতাদ হয়ে যাবে। ভালোভাবে খেয়াল করুন, ইসলামের পরাজয় কিংবা কুফরের প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরকে সহায়তা করা স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর। কেউ মনে মনে কুফর ও শিরককে ঘৃণা করে, কিন্তু কুফরের প্রতিষ্ঠা কিংবা ইসলামের ওপর কুফরের বিজয়ের জন্য সে কাফিরদের সাহায্য করে, তাহলে এ কাজের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে সে নাকচ করে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকে বাড়তি একটি শর্ত এখানে যুক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয় কিংবা ও কুফর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা কুফর আকবর হবে, যদি কাফিরদের সাহায্য করা ওই ব্যক্তির অন্তরে কুফর বা শিরককের প্রতি ভালোবাসা থাকে। আর সে যদি মনে মনে কুফর বা শিরককে ভালো না বাসে, তাহলে শুধু এই কাজ করার কারণে সে কাফির হবে না। অর্থাৎ তারা বলছেন, এই কাজটি স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর গণ্য হবে না। যদি কুফর ও শিরকের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা থাকে, তাহলে কাজটি কুফর গণ্য হবে।

এ অবস্থান সঠিক না। এ ধরনের কাজ কুফর আকবর হবার জন্য অন্তরে কুফর-শিরকের প্রতি ভালোবাসা থাকা আবশ্যিক না। শর্ত না। তারা হাতীব ইবনু আবি বালতা'আ (ﷺ)-এর একটি ঘটনাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। যদিও এ ঘটনা দিয়েই তাদের এ দাবিকে ভুল প্রমাণ করা যায়। এ দাবিকে যারা ভুল প্রমাণ করেছেন তারাও এ ঘটনাকে দলিল হিসেবে আনেন।[১৮২] এ নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এখানে সেই আলোচনাতে যাবার সুযোগ নেই। মোদ্দাকথা হলো, কেউ যদি ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয়ে বা কুফরের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, এবং একই সাথে কাফিরদের কুফরকে ভালোবাসে, তাহলে সে দুটি ঈমান বিধ্বংসী কাজে পতিত হয়েছে। সে দুটো কুফর করেছে। কুফরকে ভালোবাসা স্বতন্ত্রভাবে কুফর। যে কুফরকে ভালোবাসে, সে কোনো কিছু না করলেও কাফির। কুফরকে ভালোবাসার মাধ্যমে সে কুফর আকবর করেছে। আমরা ইতিমধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

আবার ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য সাহায্য করা স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর। কাজেই ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করা এবং কুফর-শিরককে ভালোবাসা দুইটি আলাদা আলাদা কুফরি কাজ। একটি অপরটির জন্য পূর্বশর্ত না।

---

[১৮২] হাতীব বিন আবি বালতা'আ (ﷺ) ছিলেন একজন বদরি সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের অভিযানের প্রস্তুতি নেবার সময় নিষেধ করেছিলেন যেন এই খবর কোনোভাবেই মক্কার মুশরিকরা না জানে। ফলে তাদেরকে একদম অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা যাবে। কিন্তু হাতীব (ﷺ)-এর পরিবার-পরিজন সবাই ছিল মক্কায়। অন্যদিকে তিনি মক্কার কোনো গোত্রের লোক ছিলেন না। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, মুসলিমরা মক্কায় আক্রমণ করলে তাঁর পরিবারের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। কেননা অন্য সাহাবীদের নিজস্ব গোত্র মক্কায় আছে, তারা তাঁদের স্ত্রী-পরিজনের ক্ষতি করবে না। তাই মুশরিকদের আনুকূল্য পেয়ে নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখতে তিনি মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর দিয়ে তাঁর দাসীকে একটি চিঠিসহ মক্কায় পাঠান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা জানতে পেরে আলী (ﷺ)-কে পাঠিয়ে ওই চিঠি উদ্ধার করেন। উমার (ﷺ) তাঁকে হত্যা করতে চাইলেও তিনি বদরি সাহাবী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে ক্ষমা করেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বদরি সাহাবীদের ব্যাপকভাবে ক্ষমা করেছেন। দেখুন : সহীহুল বুখারী, হাদীস নং : ৬৯৩৯ মুসনাদু আহমাদ : ২/১৪৩

ইবনু হাযম (ﷺ) তার আল মুহাল্লা গ্রন্থে এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন। সূরা মায়িদাহর আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

'আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।' [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫১]

এ আয়াত উল্লেখ করে ইবনু হাযম (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِن جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ - وهذا حَقٌّ لا يَختلِفُ فِيه اثنانِ مِن المسلمينَ

'এই বিধান আয়াতের বাহ্যিক অর্থের মতোই অর্থাৎ সে সার্বিকভাবে কাফিরদের মতোই কাফির হবে। এটাই হক্ব কথা–মুসলিমদের মাঝে দুজন ব্যক্তিও এতে মতপার্থক্য করবে না।'[১৮৩]

লক্ষ করুন, আমরা এখানে ইজমার কথা বলেছি। ইজমা শরীয়াহর একটি দলিল। তবে এটি শুধু দলিল না এটি সিদ্ধান্তমূলক (decisive) দলিল। শরীয়াহর তিনটি প্রধান দলিল হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা। ইজমা অর্থ ঐকমত্য। কোনো বিষয়ে ইজমা থাকলে সেটা ওই ব্যাপারে স্পষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক দলিল। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে উসুলের কিছু আলোচনা চলে আসে। অনেক বরেণ্য আলিম তাদের লেখায় শরীয়াহর দলিল হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর আগে ইজমার কথা এনেছেন। যেমন : আশ-শাওকানি তার কিতাব ইরশাদুল ফুহূলে (إرشاد الفحول), একইভাবে ইমামুল হারামাইন এবং আল-মিনহাজের লেখকও[১৮৪] এমন বলেছেন। কেন?

কারণ, কুরআন এবং সুন্নাহর দলিলের তাউয়ীল বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। অথবা তা মানসুখ হতে পারে। কেউ হয়তো বুখারী থেকে কোনো হাদীস বের করে সেটাকে দলিল হিসেবে কোনো আলিমের সামনে উপস্থাপন করল। হাদীসটি সহীহ। কিন্তু আলিম তাঁকে জানালেন, এই হাদীস পরবর্তী কোনো আয়াত বা হাদীস দ্বারা রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে। অথবা তিনি জানালেন, আপনি এর যে অর্থ ভাবছেন আসলে এখানে তা বোঝানো হচ্ছে না; এর ব্যাখ্যা ভিন্ন। কাজেই কুরআন ও হাদীসের অনেক দলিলের ক্ষেত্রে তাউয়ীল এবং মানসুখ হবার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়।

কিন্তু ইজমার ব্যাপারটি ভিন্ন। ইজমা সুস্পষ্ট, নিরেট ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান। কোনো বিষয়ে

[১৮৩] ইমাম ইবনু হাযম (ﷺ), আল মুহাল্লা : ১২/৩৩, কিতাবুল হুদুদ।

[১৮৪] অর্থাৎ ইমাম নাওয়াউই (ﷺ)।

ইজমা থাকার অর্থ সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে। এখানে তাউয়ীলের কথা আসছে না। মানসুখ হবার কথা আসছে না। এ কারণে অনেকে তাদের বইয়ে শরীয়াহর দলিল হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর আগে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্বযুগের অনেকে আলিমের কিতাবে এবং বর্তমানের অনেকের কিতাবে আপনারা এমন দেখবেন।

এখানে মনে রাখা দরকার, কুরআন-হাদীসের আগে ইজমার কথা আনার মানে কুরআন-হাদীসের চেয়ে ইজমাকে বেশি পবিত্র বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা না। প্রথমে ইজমা উল্লেখ করার কারণ হলো ইজমা সরাসরি, সুনির্দিষ্ট, নিরেট প্রমাণ। কোনো ব্যাপারে ইজমা থাকলে এ ব্যাপারে আর গবেষণা না করলেও চলবে। কারণ, উপসংহার আপনি পেয়ে গেছেন। অন্যদিকে কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ক্ষেত্রে তাউয়ীল (تأويل), খুসুস (خصوص), উমুম (عموم) এবং নাসখের (نسخ) দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে। এ কারণেই অনেক আলিম এমনসব বিষয়ের কথা একত্র করেছেন যেগুলোর ব্যাপারে ইজমা আছে।

যাইহোক, আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা হলো, যে তাওয়াল্লি করে তার কুফরের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দলিলের পাশাপাশি শক্ত ইজমা আছে। তাওয়াল্লি হলো কুফর বা কাফিরদের সাথে সম্পর্কের এমন যেকোনো দিক, যা দলিল দ্বারা কুফর আকবর হিসেবে প্রমাণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণি : আল মুওয়ালাহ

ওয়ালা এবং বারার দ্বিতীয় প্রকার হলো মুওয়ালাহ। এটি হলো কাফিরদের ব্যাপারে এমনসব অনুভূতি বা আচরণ যা দলিল-প্রমাণ দ্বারা হারাম হিসেবে প্রমাণিত। অর্থাৎ এ বিষয়গুলো কুফর নয়, এ কাজগুলো করলে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না। তবে এ কাজগুলো হারাম।

যেমন: কোনো কাফিরকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলা হারাম। এটি কেবল মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। কাফিরকে এ সালাম দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট হাদীস আছে। বিষয়টি আল ওয়ালা ওয়াল বারার সাথে যুক্ত। তবে কোনো মুসলিম কোনো কাফিরকে সালাম দিলে সেটা হারাম হবে, কুফর আকবর হবে না। একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার। আপনি কাফির-মুশরিকদের সালাম দিতে পারবেন না। কিন্তু তাদের অন্য কোনো উপায়ে সম্ভাষণ জানানোর সুযোগ আছে। আস-সালাম এবং আত-তাহিয়্যাহ (التحية) এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

আস-সালাম হলো, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। এটি শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। আত-তাহিয়্যাহ হলো অন্যান্য সাধারণ সম্ভাষণ।

যেমন : হাই, মারহাবান, আহলান ও সাহলান, স্বাগতম ইত্যাদি। কাফির-মুশরিকদের সম্ভাষণ জানানো যাবে। আপনি কোনো কাফিরকে 'হাই', 'আহলান ওয়া সাহলান' বা এমন কিছু বলতে পারবেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে পারবেন না।

মুওয়ালাহর আরেকটি উদাহরণ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে কাফির-মুশরিকদের এমন কোনো আচরণের অনুকরণ করা যেগুলো কুফর না। যেমন : কাফির-মুশরিকদের তাদের এমন কোনো বিশেষ দিনে স্বাগত জানানো যার সাথে কুফর বা শিরক যুক্ত নেই। ইবনুল কাইয়্যিম তার আহকামু আহলিয যিম্মাহ (أحكام أهل الذمة) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ইত্তিফাক (অর্থাৎ এ ব্যাপারে ইজমা আছে) যে এমন করা হারাম।

আবার অনেক সময় কাফির-মুশরিকদের কিছু বিষয়ে স্বাগত বা শুভেচ্ছা জানানো কুফর হতে পারে।[১৮৫] তবে সাধারণভাবে কাফিরদের সম্ভাষণ জানানো হারাম, কুফর না। এর প্রধানতম দলিলের অন্যতম হলো সূরা মুমতাহিনাহর আয়াত। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের খবর পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।' [সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০: ১]

এখানে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

হে ঈমানদারগণ

তারপর বলছেন,

[১৮৫] যেমন যদি কেউ কাফিরদের উৎসবে যোগ দেয় এবং এর জন্য শুভেচ্ছা জানায়, তাহলে তা নাজায়েয এবং কখনো কুফর হবে। উল্লেখিত কিতাবের ৩য় খণ্ডে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (رحمه الله) فَصْلٌ حُكْمُ حُضُورِ أَعْيَادِ أَهْلِ الْكِتَابِ অধ্যায় এনেছেন, অর্থাৎ আহলে কিতাবদের উৎসবে উপস্থিত হবার বিধান সংক্রান্ত অধ্যায়। এখানে ইমাম শাফে'ঈ (رحمه الله)-এর বক্তব্য আছে যে, কাফিরদের উৎসবে উপস্থিত হওয়া মুসলিমদের জন্য নাজায়েয। আর একদম শেষে ইমাম আবু হানীফা (رحمه الله)-এর বক্তব্য আছে যে, কাফিরদের উৎসবকে সম্মান জানিয়ে কেউ যদি তাদেরকে উপহার দেয়, তাহলে সে কুফর করল।

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ

তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের খবর পাঠাও...

যারা কাফিরদের প্রতি মাওয়াদ্দাহ্ তথা অনুরাগ প্রদর্শন করে, এই আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি তাদেরকে মুমিন বা ঈমানদার হিসেবে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ কাফিরদের প্রতি মাওয়াদ্দাহ্ প্রদর্শন[১৮৬], অনুরাগ বা বন্ধুত্ব প্রদর্শন করতে তিনি মানা করেছেন। কিন্তু এ কাজকে কুফর বলেননি। যারা এ কাজ করেছে তাদের মুমিন বলেছেন।

তৃতীয় শ্রেণি : কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈধ সম্পর্কের সীমানা

কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায় হলো বৈধ আচরণ ও লেনদেন। অর্থাৎ ওইসব আচরণ ও সম্পর্ক যা শরীয়াহ অনুযায়ী বৈধ।

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।' [সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

এই আয়াতের বক্তব্য সুস্পষ্ট। অনেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রথম দুটি শ্রেণিকে অস্বীকার করে শুধু এই তিন নম্বর শ্রেণি আঁকড়ে ধরতে চায়। আবার মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। অনেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার এই তৃতীয় শ্রেণিকে অস্বীকার করে। অনেকে মনে করে, মুসলিমের যদি কোনো কাফির প্রতিবেশী থাকে তাহলে প্রতিদিন সেই প্রতিবেশীর মুখে থুতু ছিটাতে হবে, অথবা তার ঘরের সামনে গিয়ে ময়লা ফেলে আসতে হবে, অথবা তার গাড়ির জানালা ভেঙে দিতে হবে। এটা ভুল ধারণা। মূলত ওয়ালা এবং বারার খণ্ডিত বুঝ থেকেই তারা এমনটি করে থাকে।

আল্লাহ (ﷻ) যেভাবে ওয়ালা এবং বারার ওপর আমল করতে বলেছেন, আমাদের ঠিক সেভাবেই আমল করতে হবে। বাড়াবাড়িও করা যাবে না, ছাড়াছাড়িও করা

---

[১৮৬] এখানে مودة শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব রাখা।-জাদীদ লুগাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৯৪০। এখানে কাফিরদের কুফর নয় বরং ব্যক্তি হিসেবে কাফির বন্ধুদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কাফিরদের প্রতি সাধারণ বন্ধুত্বকেও প্রগাঢ় করে নেয়া জায়েয নয়। স্বাভাবিক হাই-হ্যালো সম্পর্ক থাকতে পারে। সাধারণ মাত্রায় ক্লাসমেট, ব্যাচমেট, রুমমেট বা কলিগদের সাথে যে সুসম্পর্ক থাকে এতে দোষ নেই। কিন্তু সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে যেতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

যাবে না। কিছু ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকদের সাথে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অনুসারে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে। যেমন : তাদের খোঁজখবর নেয়া, উপহার দেয়া, সুন্দরতম উপায়ে ইসলামের দিকে আহ্বান করা।

পরবর্তী দারসে আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয় শ্রেণির ব্যাপারে আমরা আরও কিছু আলোচনা করব, যাতে করে মূর্খদের ভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ না থাকে।

দারস ৯

গত দারসে আমরা ইসলামী পরিভাষাগুলোর অর্থ মুছে ফেলা আর বিকৃতি নিয়ে কথা বলেছিলাম। তারপর আলোচনা করেছিলাম আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রকারভেদ নিয়ে। ওয়ালা এবং বারার প্রথম প্রকার হলো আত-তাওয়াল্লি। এটি সরাসরি কুফর। যদি কোনো ব্যক্তি এর সাথে জড়িত হয়, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কুরআনে এসেছে,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

'তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫১]

আল্লাহর শত্রু এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাওয়াল্লির অন্তর্ভুক্ত হলো:

- কুফর বা শিরকের প্রতি ভালোবাসা থাকা।
- কুফর ও শিরকের অনুসারীদের তাদের কুফর ও শিরকের কারণে ভালোবাসা।
- ইসলামের শত্রুদের ইসলামের ওপর বিজয়ী হতে সাহায্য করা, যদিও সাহায্যকারী মনে মনে তাদের কুফর বা শিরককে ঘৃণা করে।

এর প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার দ্বিতীয় যে প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল তা হলো, আল মুওয়ালাহ। এটা সুস্পষ্ট হারাম। আল মুওয়ালাহর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো কুফর নয়; কিন্তু তা হারাম। যেমন: কাফিরদের সালাম দেয়া। সালাম শুধু মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ। এমন কোনো বিষয়ে কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ করা যা তাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য, এটিও মুওয়ালাহর অন্তর্ভুক্ত। কাফিরদের কোনো বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানানোও মুওয়ালাহর অন্তর্ভুক্ত, এবং হারাম। তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুতর পর্যায়ে

পৌঁছাতে পারে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয় প্রকার হলো কাফির ও মুশরিকদের সাথে যেসব আচরণ ও সম্পর্ক রাখা বৈধ। আজ এ বিষয়ে আমরা আরও কিছু আলোচনা করব।

কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈধ সম্পর্কের সীমানা

আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয়ের প্রকারের ব্যাপারে প্রধান দলিল হলো কুরআনের এই আয়াত:

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

> 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।' [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

এর স্বপক্ষে আরও দলিল আছে, কিন্তু সূরা মুমতাহিনার এই আয়াতটিই প্রধানতম দলিল। ইনশা আল্লাহ আমরা এখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমরা আগেই বলেছি, ওয়ালা এবং বারা নিয়ে আমাদের সমাজে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। কেউ ছাড়াছাড়ি করতে গিয়ে ওয়ালা এবং বারাকেই বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান যুগের মডার্নিস্টরা। মডার্নিস্টরা এবং কাফিররা যাদেরকে 'মডারেট মুসলিম' বলে, তারা আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রথম দুটি প্রকারকে একেবারে অস্বীকার করে। তাদের আকীদাহ্ অনুযায়ী কাফিরদের সাথে এমন কোনো আচরণ বা সম্পর্ক নেই যা হারাম কিংবা কুফর। ওয়ালা এবং বারার প্রথম দুই প্রকারকে মুছে দিয়ে এরা কেবল শেষেরটি অর্থাৎ কাফির-মুশরিকদের সাথে উত্তম আচরণের ওপর জোর দেয়। তাদের কাছে এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারা। আবার অনেকে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে। যেসব ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকদের সাথে আল্লাহ (ﷻ) উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন সেটা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তারা মনে করে দিনরাত এক করে সব কাফির-মুশরিককে উত্যক্ত করে বেড়াতে হবে।

এই দুই ধরনের আচরণই ভুল। সঠিক অবস্থান হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা। আমাদের ওয়ালা এবং বারার ওপর আমল করতে হবে ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহ (ﷻ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। দলিলসহ কিছু উদাহরণ আলোচনা করা যাক।

কাফিরদের প্রতি দাওয়াহ

আমরা ওয়ালা এবং বারার ওপর আমল করব এবং একই সাথে কাফির-মুশরিকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। এ দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ কাজগুলোর মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য নেই। আমাদের আবেগ-অনুভূতি, কাজকর্ম সবই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর নির্ধারিত সীমার ভেতরে পরিচালিত হয়। প্রজ্ঞা ও হিকমাহর সাথে দাওয়াহ করার সাথে আল ওয়ালা ওয়াল বারার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দাওয়াহ শুধু মানুষের কাছে গিয়ে ইসলামের কথা বলা না। এটি দাওয়াহর একটি অংশ। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে তার মনকে ইসলামের প্রতি নরম করাও দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। এ কাজগুলো কোনোভাবেই আল ওয়ালা ওয়াল বারার মূল আকীদাহর সাথে সাংঘর্ষিক না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

‘তুমি তোমরা রবের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো।’ [সূরা আন নাহল, ১৬: ১২৫]

এবং তিনি বলেছেন,

وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ

‘উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক কোরো না...’ [সূরা আল আনকাবূত, ২৯: ৪৬]

মুসা (ﷺ)-কে ফিরআউনের কাছে পাঠানোর সময় তিনি (ﷻ) বলেছেন,

ٱذۡهَبَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ٤٣ فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ

‘তোমরা দুজন ফিরআউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তো-বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।’ [সূরা ত্বহা, ২০: ৪৪-৪৩]

এবং তিনি বলেছেন,

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ

‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯]

এবং তিনি বলেছেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।' [সূরা আল আম্বিয়া, ২১: ১০৭]

কুরআনে এ রকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াহর ক্ষেত্রে কোমল ছিলেন বা তাঁকে কোমল আচরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (ﷺ) ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতস্বরূপ; শুধু মানুষ বা জ্বিনজাতির জন্য না। আল্লাহ তাঁকে মানুষের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি মুসা (ﷺ)-কেও আল্লাহ ফিরআউনের মতো সীমালঙ্ঘনকারীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আহলুল কিতাবের যবেহ খাওয়া

কাফিরদের সাথে বৈধ আচরণের আরেকটি উদাহরণ হলো ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের যবেহ করা পশু খাওয়ার বৈধতা।[১৮৭]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

'আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।' [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫]

আহলুল কিতাবের সাথে বিয়ে

আরেকটি উদাহরণ হলো ইহুদী-খ্রিষ্টান নারীদের মুসলিমরা বিয়ে করতে পারবে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ

'সচ্চরিত্রা মুমিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হলো...' [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫]

---

[১৮৭] আহলে কিতাবদের জবাইকৃত পশু খাওয়া এজন্য হালাল করা হয়েছিল, তারা আল্লাহর নামেই জবাই করত; কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে। বর্তমানে এরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়ে জবাই করে, আল্লাহর নাম নেয় না, এ ছাড়া এখন প্রকৃত আহলে কিতাব পাওয়াও দুষ্কর। অধিকাংশই একধরনের নাস্তিক জীবনযাপন করে। তাই গবেষক আলিমগণ বর্তমান যুগের আহলে কিতাবদের জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয বলেন না। কেননা, জায়েয হবার শর্ত এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে এ বিষয়টির আরও কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ দারসের শেষের দিকে আমরা ইনশা আল্লাহ সেই আলোচনাতে যাব।

উপহার বিনিময়

কাফিরদের সাথে বৈধ আচরণের চতুর্থ উদাহরণ হলো, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উপহার দেয়া বা তাদের দেয়া উপহার গ্রহণ করা। এটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে তাদের কোনো উৎসবের দিন উপহার বিনিময় করা যাবে না। যেমন: ক্রিসমাসের দিন কোনো খ্রিষ্টানের সাথে উপহার বিনিময় করা যাবে না। এর জন্য এ দাওয়াহর অজুহাতও দেয়া যাবে না। একই সাথে মাথায় রাখতে হবে, উপহার হিসেবে এমন কোনো জিনিস আদান-প্রদান করা যাবে না যা হারাম। আমরা একটি আয়াত উল্লেখ করেছিলাম,

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।' [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

ইমাম বুখারী (رحمه الله) তাঁর গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন,

بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

'মুশরিকদেরকে উপহার দান বিষয়ক অনুচ্ছেদ।'

ইমাম বুখারীর দেয়া শিরোনামের পেছনের হিকমাহ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। ইমাম বুখারী কীভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন অনেক আলিম সেটা তাদের আলোচনায় উপস্থাপন করেন। বুখারিতে ইবনু উমার (رضي الله عنه) এর সূত্রে একটি ঘটনার বর্ণনা এসেছে। একবার উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) দেখলেন এক ব্যবসায়ী রেশমের জুব্বা বিক্রি করছে। উমার (رضي الله عنه) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে রেশমের জুব্বা কিনতে অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেন বিভিন্ন গোত্র ও সাম্রাজ্যের দূতদের সাথে দেখা করার সময়, কোনো মজলিসে, অথবা জুমআর খুতবার সময় এই চমৎকার রেশমের জুব্বা পরিধান করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

'এ পোশাক কেবল ওই লোকেরা পরে, যাদের জন্য আখিরাতে কিছু নেই।'

পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপহার হিসেবে কিছু রেশমের পোশাক এল। তিনি তা থেকে একটি উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে পাঠালেন। উমার (رضي الله عنه) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন,

كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟

'আমি কীভাবে এ পোশাক পরতে পারি; অথচ আপনি পূর্বে এ সম্পর্কে এই এই বলেছেন?'

إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا، أَوْ تَكْسُوهَا»، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আমি তো এটা তোমাকে পরিধান করার জন্য দিইনি। এজন্য দিয়েছি, যাতে তুমি তা বিক্রয় করো বা অন্য কাউকে দিয়ে দাও।' এরপর উমার (رضي الله عنه) এটি মক্কায় তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন–যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।[১৮৮]

লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন কাপড়টি তিনি বিক্রি বা উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য উমার (رضي الله عنه)-কে দিয়েছেন। সিল্কের পোশাক পরা কোনো মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ না। তাহলে এখানে কাদেরকে উপহার হিসেবে দেয়ার কথা বলা হচ্ছে? কাফিরদের। মূলনীতি হলো, সাধারণভাবে কাফিরদের সাথে উপহার আদান-প্রদান করা জায়েয। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি হারাম হতে পারে।

উমার (رضي الله عنه) সেই রেশমের পোশাকটি মক্কায় থাকা তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠালেন। তাঁর এই ভাই তখনো ইসলাম কবুল করেনি এবং হিজরতও করেনি। অর্থাৎ উমার (رضي الله عنه) তাঁর মুশরিক ভাইকে উপহার দিয়েছিলেন। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, উমার (رضي الله عنه) ছিলেন আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রতিমূর্তি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) বুঝে নিয়েছিলেন, তিনি কোনো কাফিরকে উপহার হিসেবে এ পোশাক দিতে পারবেন। এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কাজে তাঁকে কোনো নিষেধ করেননি।

কাফিরদের সাথে দেখা করা

দাওয়াহর উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে দেখা করা বা তাদের বাসায় যাওয়া বৈধ। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন ইহুদী বালক খাদিম ছিল। সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে দেখতে গেলেন। তারপর তাঁর মাথার

---

[১৮৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৬১৯

কাছে বসে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।' সে তাঁর পিতার দিকে তাকাল। তাঁর পিতা বলল আবুল কাসিমের (ﷺ) আনুগত্য করো। তখন সে ইসলাম কবুল করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুশি হয়ে বললেন,

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে উদ্ধার করলেন।'

দুটি বর্ণনায় এ ঘটনার কথা এসেছে।[১৮৯] দেখুন, এটিও আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ। এর মধ্যে তাওয়াল্লি এবং মুওয়ালাহ যেমন আছে, তেমনি এ বিষয়গুলোও আছে। কিন্তু কিছু মানুষ শুধু এই শেষের বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরতে চায়, আর বাকিটা অস্বীকার করে। তারা ওয়ালা এবং বারার কিছু অংশ নেয় আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই একটি মাত্র অংশকেই ওয়ালা আর বারার মূল বিষয় বানিয়ে ফেলেছে।

কাফির-মুশরিকদের সাথে সেভাবেই আচরণ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ (ﷻ) আমাদের আদেশ দিয়েছেন। তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা আল্লাহর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং বিদ্বেষ পোষণ করি। তারা আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করে এবং ইসলাম ছাড়া যা কিছুর অনুসরণ করে, আমরা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং বিদ্বেষ পোষণ করি। এ বিষয়গুলো আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে। একই সাথে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেনি, তাদের সাথে আমাদের আচার-আচরণ এবং লেনদেন হবে সংযত; ঠিক যেমনটি আল্লাহ (ﷻ) আদেশ করেছেন।

কাফিরদের সাথে আচরণ

আল-কাররাফি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর আল-ফুরুক গ্রন্থে বলেছেন, ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করা কাফিরদের মুসলিমদের ওপর অধিকার আছে যেগুলো নিশ্চিত করা মুসলিমদের দায়িত্ব। কারণ এ ধরনের কাফিররা আমাদের প্রতিবেশী, তারা আমাদের নিরাপত্তায় এবং আমাদের যিম্মায় আছে। এই নিরাপত্তা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) দিয়েছেন। কাজেই এই নিরাপত্তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আমরা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করব, কিন্তু একই সাথে আমাদের অন্তরগুলোকে মাওয়াদ্দাহ থেকে মুক্ত রাখব। লক্ষ রাখতে হবে, আমাদের অন্তর যেন তাদের প্রতি মাওয়াদ্দাহ দ্বারা কলুষিত না হয়।

[১৮৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩৫৬

আল-কাররাফি (ﷺ) বলেছেন, কাফিরদের সাথে লেনদেন ও সম্পর্কের কারণে কারও অন্তরে যদি মাওয়াদ্দাহ তৈরি হয়—সে যদি কাফিরদের সম্মানিত মনে করে অথবা তাদের কুফর বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে পবিত্র মনে করতে শুরু করে—তাহলে সময়ের সাথে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক রূপ নেবে। অন্তরের একটি অংশ যদি এভাবে কলুষিত হয়, তাহলে ধীরে ধীরে তা একসময় পুরো অন্তরকেই গ্রাস করে ফেলবে। একসময় তা মুওয়ালাহতে পরিণত হবে।

তিনি আরও বলেছেন, যেসব বিষয় কাফিরদের সাথে এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে না, সেগুলো জায়েয। তারপর এমন বৈধ আচরণের বিভিন্ন উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। এ ধরনের উদাহরণগুলো কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করেছি। একই সাথে তিনি কাফিরদের বৃদ্ধদের সাথে কোমল আচরণ এবং ক্ষুধার্তদের খাবার দেয়ার কথা বলেছেন। একই সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, অন্তরের দিকটাতে আপস করা যাবে না।

তাদের গরিব-দুস্থদের পোশাক দিন, সহমর্মিতা ও দয়ার সাথে তাদের সাথে কথা বলুন। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তা যেন ভয় কিংবা হীনম্মন্যতার কারণে না হয়। আল-কাররাফি (ﷺ) এটাও বলেছেন, কাফির-মুশরিক প্রতিবেশী যদি কোনো মুসলিমের ক্ষতি করে—তাহলে বাধা দেয়ার এবং শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও—ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া কিংবা তার সাথে নরম আচরণ করা জায়েয। তবে, এই নমনীয়তা ভয় বা হীনম্মন্যতার কারণে হলে হবে না। এটা হতে হবে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য।

আহলুয যিম্মাহ[১৯০]; অর্থাৎ ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করা কাফিরদের প্রতি

---

[১৯০] আহলুয যিম্মাহ বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। কেননা, হাদীসে যাদের অধিকার রক্ষা করতে বলা হয়েছে তারা আহলুয যিম্মাহ বা যিম্মি। এটা একটা পরিভাষা এর সংজ্ঞা হচ্ছে,

أَهْلُ الذِّمَّةِ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِينَ أُقِرُّوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْتِزَامِ الْجِزْيَةِ وَنُفُوذِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهِمْ

'আহলুয যিম্মাহ হচ্ছে সেসকল কাফির, যারা দারুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী আইনের শাসন আছে এমন ভূখণ্ডে তাদের কুফরি বিশ্বাস পালন করে অবস্থান করে; তবে তারা জিযয়া আদায় করে এবং তাদের ওপর ইসলামী বিধানাবলির কার্যকর হওয়াকে মেনে নেয়।'-জাওয়াহিরুল ইকলীল : ১/১০৫; কাশশাফুল ক্বিনা : ১/৭০৪; আল মাওসুওয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুওয়াইতিয়্যাহ : ৭/১০৪

এর পাশাপাশি আরেকটি শব্দ আসে, তা হলো মু'আহাদ (معاهد)। এর মানে হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ। অর্থাৎ ওই কাফির যার সাথে ইসলামী শাসন কার্যকর আছে এমন দেশের মাঝে চুক্তি রয়েছে যে, মুসলিমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না আর তারাও মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আহলুয যিম্মাহ মু'আহাদ এদেরকে দেয়া নিরাপত্তা বা আমান চিরস্থায়ী নয়। মু'আহাদের সাথে নির্দিষ্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে আমানও লুপ্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া যিম্মি, মু'আহাদ এরা যদি ইসলাম ও ইসলামী হুকুমাতের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলেও নিরাপত্তা

আচরণের সীমানা নিয়েও আলিমগণ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়টি নিয়ে বলেছেন। যেমন বুখারীতে কিতাবুদ দিয়াতে একটি পরিচ্ছেদ আছে,

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

বিনা অপরাধে যিম্মিকে হত্যা করার গুনাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

ইমাম বুখারী এখানে একটি হাদীস এনেছেন। এ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

'যদি কোনো (মুসলিম বিনা কারণে) মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না; যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'[১৯১]

ইসলামী শাসনের অধীনে থাকা কাফিরদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন এত জোর দেয়া হয়েছে? কারণ, তারা যখন ইসলামী শাসনের অধীনে থাকে তখন তারা থাকে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায়। কিন্তু যেখানে কুফরি শাসন চালু থাকে সেখানে তারা থাকে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত শক্তিশালী অবস্থায়।

মুশরিকদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) তাদেরকে দান-খয়রাত দিতেন। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) ও ইবনু উমার (رضي الله عنه) এভাবে দান করতেন। মুসনাদু আহমাদ এবং তিরমিযির একটি বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, একবার এক ইহুদী মহিলা, আইশাহ (رضي الله عنها)-এর কাছে এসে কিছু সাদাকা চাইলো। আইশাহ (رضي الله عنها) তাকে কিছু দান করার পর ইহুদী মহিলাটি বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে

লুপ্ত হয়। যেমন ইমাম হাসকাফী (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

(ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الاسلام أو القرآن أو النبي (ص)).

'যিম্মি দ্বীন আল ইসলাম, কুরআন বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ বা অবমাননা করলে তাকে শিক্ষা দেয়া হবে ও সাজা দেয়া হবে।'

ইমাম আইনী (রহ.) বলেছেন, 'অবমাননার ক্ষেত্রে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, তাকে হত্যা করা হবে।' ইমাম কামাল ইবনু হুমাম (রহ.)-ও এই মত দিয়েছে। [আদ দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা: ৩৪৩]

ইমাম ইবন আবিদীন শামী (রহ.) কী সাজা হবে এর সম্পর্কে বলেন, وَعَاقِبَهُ بِالْقَتْلِ

'তার সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড।'-রাদ্দুল মুহতার : ৪/২১৪

যিম্মি ও মু'আহাদের আমান রহিত হওয়া সম্পর্কিত এই আলোচনা সকল মাযহাবের কিতাবেই রয়েছে। ইমাম ইবন কুদামা (রহ.)-এর আল মুগনিতে কিতাবুল জিযইয়ায় এ সম্পর্কিত আলোচনা আছে, বিশেষ করে (مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ، حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ) অধ্যায়ে।

[১৯১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৯১৪

রক্ষা করুন। ইহুদী মহিলার মুখে এমন দু'আ শুনে আইশাহ (رضي الله عنها) খুব অবাক হলেন এবং রাসূল (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (ﷺ) বললেন,

اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ

'আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও, কেননা নিশ্চয় কবরের আযাব সত্য।'[১৯২]

ইহুদী মহিলাকে দান করা নিষিদ্ধ হলে রাসূল (ﷺ) আইশাহ (رضي الله عنها)-কে তা জানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি (ﷺ) কিছু বলেননি–নিষেধ করেননি। এবং আমরা জানি কোনো ব্যাপারে তাঁর (ﷺ) নীরবতাই হলো সম্মতি। তাই কাফিরদের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা তাওয়াল্লি বা মুওয়ালাহর নীতির সাথে সাংঘর্ষিক না।

আমি অ্যামেরিকাতে বড় হয়েছি। আমরা বিভিন্ন এলাকা, পাড়ায় থেকেছি। এমন কোনো প্রতিবেশীর কথা আমার মনে পড়ে না, যারা একসময় আল্লাহর ইচ্ছায় আমার বাবার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আলহামদুলিল্লাহ। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী ছিলেন। একসময় অ্যামেরিকান নেভিতে ছিলেন, ততদিনে রিটায়ার করেছেন। উনি আমার বাইসাইকেল ঠিক করে দিতেন। অ্যামেরিকায় ইসলাম তখন এখনকার মতো এতটা পরিচিত ছিল না। মুসলিম বা ইসলাম সম্পর্কে জানে, এমন মানুষ সচরাচর চোখে পড়ত না। সেই বৃদ্ধ প্রতিবেশী, আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে আছে, তার মৃত্যুশয্যায় আমার বাবা তার কাছছাড়া হননি। এই সৌভাগ্যবান মানুষটি মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদম শেষ মুহূর্তে যখন তার জবান বন্ধ হয়ে গেল তখন বাবা তাঁর হাত ধরে বললেন, আপনি কেমন বোধ করছেন? যদি আনন্দ অনুভব করেন, তাহলে আমার হাতে চাপ দিন। উনি বাবার হাতে আলতো করে চাপ দিচ্ছিলেন। সুবহান আল্লাহ! উনার মৃত্যুর পর পাড়ার আরও কিছু মুসলিমকে নিয়ে বাবা তাঁকে শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী দাফন করেন।

এটা তো কয়েক দশক আগের কথা। কয়েক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা বলি। আমি শুক্রবারে বাবার বাসায় ঢুকছিলাম। পাশের বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা বললেন, তোমার বাবাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি

---

[১৯২] প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে একাধিক সনদে একাধিক মতনের বর্ণিত হয়েছে এবং শাইখ (হাফিযাহুল্লাহ) সবগুলো মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। দেখুন : মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২৪৫২০, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمه الله)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের (رحمهما الله) শর্তে সহীহ; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩৭২; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৬৬৩

বললেন, তোমার বাবা প্রতি শুক্রবার আমার দরজার সামনে কিছু কাঁচাবাজার আর গ্রোসারি রেখে যান।

ওয়াল্লাহি! আমি বা আমাদের পরিবারের অন্য কেউই এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। অথচ বাবা অনেকদিন ধরে এ কাজ করছেন।

আমি সেই বৃদ্ধার সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। তিনি একদম একা থাকেন। নিজের পরিবারের লোকেরাই তাঁকে দেখতে আসে না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দ্বীন নিয়ে শেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা দীর্ঘদিন এ বৃদ্ধা মহিলার জন্য বাজার করে দিয়েছেন। কাউকে না জানিয়ে। এই দয়া, এই দাওয়াহ কি আল ওয়ালা ওয়াল বারার সাথে সাংঘর্ষিক?

কখনো না। এ জন্য আল ওয়ালা ওয়াল বারার ব্যাপারে সঠিক আকীদাহ রাখতে হলে, এর তিনটি প্রকারকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। ধারণ করতে হবে। কোনোটা বাদ দেয়া যাবে না।

- তাওয়াল্লি,
- মুওয়ালাহ,
- কাফিরদের সাথে জায়েয আচরণ,

এ তিনটি মিলেই আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা ও ঘৃণা

আল ওয়ালা ওয়াল বারার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা ও ঘৃণা। পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করার কনসেপ্টের ওপর।

দেখুন রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন,

> ولا يُؤمِنُ أحَدُكم حتى أكونَ أحَبَّ إليه من وَلَدِهِ، ووَالِدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ
>
> 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার সন্তান, বাবা-মা এবং অন্যান্য সকল কিছুর চাইতে আমাকে বেশি ভালোবাসবে।'[১৯৩]

আমাদের ভালোবাসা আবর্তিত হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে। আমাদের ভালোবাসার মাপকাঠি হবেন আল্লাহ। আর নবী (ﷺ)-কে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

> قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

---

[১৯৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৪; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ১৭৯

'বলো, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু!" [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১]

যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করো। স্পষ্ট কথা। ভালোবাসার উল্টো পিঠে থাকে ঘৃণা। যখন ভালোবাসার প্রশ্ন আসে তখন ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষের কথাও চলে আসে। যে আল্লাহকে ভালোবাসে তাকে অবশ্যই ওইসব লোকদের ঘৃণা করতে হবে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ঘৃণা করে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর শত্রু, তারা আমাদেরও শত্রু। তারাই ঘৃণা ও বিদ্বেষ পাবার সর্বাধিক উপযুক্ত।

ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

أوثقُ عُرى الإيمانِ الحبُّ في اللهِ والبغضُ فيه

'ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা।'[১৯৪]

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। এ বক্তব্যটি সহীহ সনদে মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আল বারা ইবনু আযিবের সূত্রে এর সনদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থাৎ এ কথাটি মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন তা তো নিশ্চিত। তবে আরেকটি সূত্রে এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসেবেও এসেছে। তবে সেই সনদের ব্যাপারে কিছু কথা আছে।[১৯৫]

হৃদয়ে আল ওয়ালা ওয়াল বারা প্রতিষ্ঠা করা ঈমান চাঙা করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলোর অন্যতম। হৃদয়ে যদি ঈমান কিছুটা টালমাটাল হয়ে যায়, তাহলে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ চর্চার মাধ্যমে তা দৃঢ় হয়। যখন আপনার ভালোবাসার ভিত্তি হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তখন অবশ্যই আপনি ঈমানের সৌন্দর্য ও মধুর স্বাদ অনুভব করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সেই গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন,

---

[১৯৪] ইবনু আবি শাইবাহ, আল ঈমান, হাদীস নং : ১১১; ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাসর (রহিমাহুল্লাহ), তা'যিমু ক্বাদরিস সালাহ, হাদীস নং : ৪৪০

[১৯৫] বারা বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস হিসেবে এসেছে মুসনাদু আহমাদে, হাদীস নং : ১৮৫২৪। আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে শাহেদের জন্য হাসান; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতেও হাসান।-সহীহুত তারগিব, হাদীস নং : ৩০৩০

ثَلَاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانِ: أنْ يَكونَ اللَّهُ ورَسولُهُ أحَبَّ إلَيْهِ ممَّا سِوَاهُمَا، وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلَّا لِلَّهِ، وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ

'যার অন্তরে তিনটি জিনিস থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে তার নিকট অধিক প্রিয় হবে। দ্বিতীয়টি, যখন কোনো লোককে ভালোবাসলে তা কেবল আল্লাহর জন্যই হবে। তৃতীয়টি, পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে।'[১৯৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই তিনটি গুণের অধিকারী হলে আমরা ঈমানের মধুর স্বাদ অনুভব করতে পারব।

হুব্ব (حب) বা ভালোবাসা হলো ওয়ালা এবং বারার প্রাণ, নিঃশর্ত আনুগত্যের মূলভিত্তি। একইভাবে 'বারা' বা সম্পর্কচ্ছেদের নিউক্লিয়াস হলো কুফর ও কাফিরের প্রতি ঘৃণা। আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতকারীর প্রতি ঘৃণা। কোনো মানুষের সাথে বারা করতে হলে তাকে এবং তার কুফরকে আপনার অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে। ভালোবাসা বা ঘৃণা হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারার নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র। আল ওয়ালা ওয়াল বারা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। মুস্তাদরাক, আবু দাউদ, আহমাদ, আত-তিরমিযি এবং সহীহ আল জামিতে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

من أحبَّ للهِ ، وأبغض للهِ ، وأعطَى للهِ ، ومنع للهِ ، فقد استكمل الإيمانَ

'যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর রাহে ঘৃণা করে, যে আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য বিরত থাকে–সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।'[১৯৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ঈমান পরিপূর্ণ হতে হলে আল্লাহর রাহে ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু আজকে আল্লাহর রাহে ঘৃণা করাকে অধিকাংশ লোক দ্বীন ইসলাম থেকে বাদ দিতে চায়। আল্লাহর জন্য ঘৃণা বা সম্পর্কচ্ছেদ করাকে কেউ যদি ইসলামের অংশ মনে না করে, তাহলে ইসলামের সঠিক বুঝ তার নেই। আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর কথা হলো দলিল। যদি আল্লাহর রাহে ঘৃণা করা আমার-আপনার ইসলামের অংশ না হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা ভুল পথে আছি। ইসলামের সঠিক বুঝ আমাদের কাছে নেই।

---

[১৯৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৬, ৬৯৪১

[১৯৭] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৬৮১; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (রহ.)-এর মতে হাদীস সহীহ সনদ হাসান; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর মতে সহীহ।-সহীহুল জামি, হাদীস নং : ৫৯৬৫

আল ওয়ালা ওয়াল বারা ব্যতীত ঈমান কখনোই পূর্ণতা পায় না। ওয়ালা এবং বারা নিয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) এত এত আলোচনা করেছেন, সেগুলো উল্লেখ করতে গেলে রাতের পর রাত কাবার হয়ে যাবে। শুধু তাঁর একটি বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইবনু তাইমিয়্যাহর এ উক্তি পড়ার সময় ইজমা নিয়ে আমাদের আলোচনা মাথায় রাখবেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (ﷺ) বলেছেন,

> وَمَنْ لَمْ يُحَرِّمْ التَّدَيُّنَ - بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بَلْ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ وَيُبْغِضْهُمْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
>
> 'নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের পর যে ব্যক্তি (ইসলাম ব্যতীত) অন্য কোনো ধর্ম (যেমন: ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের) অনুসরণকে হারাম মনে করে না, এবং যে ব্যক্তি মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারীদের কুফফার মনে করে না, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না–সে মুসলিমদের ঐকমত্যে নিজেই মুসলিম নয়।'[১৯৮]

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অনুসরণ করা যাবে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজ করে বোঝানো যাক।

আপনি আপনার বাবাকে ভালোবাসেন। সারা জীবন ধরে তিনি আপনার জন্য যা করেছেন তার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। ধরুন, তিনি আপনাকে তার একটি দোকান দেখাশোনা করতে বললেন। আপনার বাবার নিজের একটি দোকান আছে। আর তিনি আপনার জন্য একই রকম আরেকটি দোকান খুলে দিলেন।

এখন মনে করুন একজন কর্মচারী দুজনের দোকানেই কাজ করে। এই লোক আপনার বাবার সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করে। তাকে অভিশাপ দেয়। অসম্মান করে, বেয়াদবি করে, ক্যাশ থেকে টাকা সরায়। নানাভাবে তার ক্ষতি করে। অন্যদিকে আপনার সাথে তার আচরণ খুবই অমায়িক। আপনার সাথে সে খুব ভালো ব্যবহার করে। আপনার সব কাজ ঠিকমতো করে দেয়। স্যার স্যার করে। আপনার বাবার কাছে সে একজন মিথ্যাবাদী, সীমালঙ্ঘনকারী, বেয়াদব এবং প্রতারক। কিন্তু আপনার কাছে সে ভালো।

এখন এ লোকের ব্যাপারে আপনার মনোভাব কেমন হবে? আপনার সাথে ভালো আচরণ করার কারণে আপনি কি আপনার বাবার সাথে তার বেয়াদবি আর প্রতারণাকে মেনে নেবেন? আপনি কি ভাববেন, 'বাবার সাথে যা ইচ্ছে করুক, আমার কী! আমার সাথে তো তার আচরণ ভালো!'

আপনি কি এই লোককে পছন্দ করবেন? করতে পারবেন? নাকি বাবার প্রতি ভালোবাসার কারণে এই লোককে আপনি অপছন্দ করবেন? তার প্রতি রাগ, ক্ষোভ,

---

[১৯৮] শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (ﷺ), মাজমু আল ফাতাওয়া : ২৭/৪৬৪

ঘৃণা পোষণ করবেন? এই লোককে অপছন্দ করা আসলে আপনার বাবার প্রতি আপনার ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টা এতটাই সহজ সরল। কিন্তু এই সহজ বিষয়টা বোঝা অধিকাংশের জন্য সহজ না। এটা কেবল তাঁদের জন্য সহজ যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন।

একজন কাফির আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে নাফরমানি করছে। সে আল্লাহকে অস্বীকার করছে, কিংবা তাঁর ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, কিংবা তাঁর সাথে শরীক করছে। আল্লাহর প্রতি আপনার আনুগত্য, আপনার ভালোবাসা যদি শক্ত হয়, তাহলে আপনি কোনো দিন এমন লোককে ভালোবাসা তো দূরে থাক, অল্পস্বল্প পছন্দও করতে পারবেন না।

কাকে ভালোবাসবেন কাকে ঘৃণা করবেন, কাকে পছন্দ করবেন কাকে অপছন্দ করবেন সবকিছু আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি (ﷻ) বলেছেন,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

> ‘আর যারা কুফরি করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না করো (অর্থাৎ মুমিনরা একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো) তাহলে দুনিয়াতে মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।’ [সূরা আনফাল, ৮: ৭৩]

এই আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

> ‘যারা কুফরি করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না করো (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো)...’

এ কথা কাদের বলা হচ্ছে? এ কথা কাদের জন্য?

আপনার জন্য। আমার জন্য। মুসলিমদের জন্য। মুসলিমরা যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত না হয়, তাহলে কী হবে? আল্লাহ (ﷻ) জানিয়ে দিয়েছেন,

> ‘তাহলে দুনিয়াতে মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।’

আজ ফিতনা, ফাসাদ, যুলুমে দুনিয়া ভরে গেছে। কাফির ও মুশরিকরা বিজয়ী অবস্থায় আছে। এর সমাধান কী? সমাধান দেয়া আছে ওই কিতাবে যা আমরা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছি। মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। অনুগত হতে হবে। আল ওয়ালা ওয়ালা বারার সঠিক আকীদাহ পালন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

কুফর ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

আজ অনেকে কুফর ও কাফিরের প্রতি ঘৃণাকে ইসলাম থেকে, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুছে দিতে চায়। আবার অনেকে এর অর্থ বদলে দিতে চায়। অনেকে বলে,

'বারা—অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ—হলো শুধু ওই কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, যারা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালায়। কেবল ওইসব কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।'

এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি এবং আকীদাহর ক্ষেত্রে স্পষ্ট গোমরাহি। মুনাফিক, রুয়াইবিদাহ, মূর্খ এবং ইন্টারফেইথের সাথে যুক্ত লোকেরা এই ধরনের কথা বলে। যারা বলে সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষ কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের ক্ষেত্রে হবে, তারা আসলে কী বলছে দেখা যাক।

তারা বলছে, কাফির যদি কোনো মুসলিমের ক্ষতি করে, তার পরিবার, সম্পদ কিংবা ভূখণ্ডের ওপর আগ্রাসন চালায়, তাহলে সেটা গুরুতর ব্যাপার। তখন সেই কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু সে যখন আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, কিংবা আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করে—তখন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এই লোকগুলোর কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের চেয়ে মুসলিমের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ!

যারা এভাবে 'বারা'-কে সংজ্ঞায়িত করে, তারা মূলত বলছে, আমাদের ব্যাপারে যে সীমালঙ্ঘন করে, আমরা তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি। তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করি। কিন্তু যে আল্লাহর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, তার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই। তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে।

যারা তাওহিদ এবং মুওয়াহহিদিনকে (তাওহিদবাদীদের) ভালোবাসে, শিরক ও মুশরিকদের প্রতি বিদ্বেষ তাঁদের হৃদয়ে সহজাতভাবে কাজ করে। আপনার মা-বাবাকে আপনি ভালোবাসেন। যে আপনার মাকে গালি দেয় আপনি সহজাতভাবে তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ অনুভব করবেন। তার সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক আপনি রাখবেন না। আপনি যদি আপনার সম্পদকে ভালোবাসেন, তাহলে যারা আপনার সম্পদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদের সাথে আপনি সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন। যে আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে, তার চরিত্র ও সম্মানের ব্যাপারে কুৎসা রটায়, আপনি সহজাতভাবে তাকে ঘৃণা করবেন।

ভালোবাসার স্ত্রীকে যদি কেউ 'বেশ্যা' বলে গালি দেয়, তাহলে এমন কোনো পুরুষ কি আছে, যে ওই গালি দেয়া লোককে ভালোবাসবে? এমন কোনো পুরুষ আছে, যে তার স্ত্রীকে বলবে, 'ওই লোক তোমাকে পতিতা বলেছে, কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তার বিরুদ্ধে যাব না'।

যে পুরুষ এমন কথা বলে তাকে আপনারা কী বলবেন? আর তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

কী হবে? স্ত্রী বাক্সপেটরা গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে। আর বলবে, তুমি দিনরাত যে ভালোবাসার কথা বলো, তা আসলে নির্জলা মিথ্যে। তোমার কথা আর তোমার ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই।

আপনার ভালোবাসার সন্তানের ক্ষতি যে করতে চায়, আপনি কি তাকে ভালোবাসতে পারবেন? তার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেন? তার বন্ধু হতে পারবেন? নিজের মা-বাবা, সম্পদ, সম্মান, পরিবার, সন্তান কারও ব্যাপারে আপনি ছাড় দেবেন না। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে ছাড় দেবেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে ছাড় দেবেন? কোন মুখে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবি করেন? সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে,

يَشْتِمُنِي ابنُ آدَمَ، وما يَنْبَغِي له أنْ يَشْتِمَنِي، ويُكَذِّبُنِي وما يَنْبَغِي له، أمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إنَّ لِي ولَدًا، وأَمَّا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: ليسَ يُعِيدُنِي كما بَدَأَنِي.

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

'আদমসন্তান আমাকে গালি দেয়, অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত না। আর সে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ এটা করা তার উচিত না। আমাকে গালি দেয়া হচ্ছে তার এই উক্তি যে, আমার নাকি সন্তান আছে। আর তার মিথ্যা মনে করা হচ্ছে তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে কখনো তিনি আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না।'[১৯৯]

কীভাবে একজন মুসলিম ওই কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে থাকতে পারে, যারা আল্লাহকে অভিশাপ দেয় এবং তাঁর একত্ববাদে শরীক করে? স্ত্রীকে কেউ গালি দিলে মানুষ তার সাথে সব সম্পর্ক শেষ করে ফেলে। যারা আল্লাহকে গালি দেয় তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? আজ যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, তাদের অনেকে তুলনায় জড়বস্তুদের মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারার বোধ বেশি কাজ করে। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়েছেন,

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَلَدٗا ٨٨ لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدّٗا ٨٩ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنشَقُّ ٱلۡأَرۡضُ وَتَخِرُّ ٱلۡجِبَالُ هَدًّا ٩٠ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ٩١

'আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কারণ, তারা পরম করুণাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে।' [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৮৮-৯১]

---

[১৯৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩১৯৩

যে কথায় নভোমণ্ডল ফেটে পড়ার, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবার আর পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়, সেই কথা আপনার গায়েই লাগে না? সেই কথা আপনার কাছে গুরুতর কিছু মনে হয় না? যারা এমন জঘন্য কথা বলে তাদের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করেন, তাদেরকে ভালোবাসেন? তারপর আবার মুসলিম হবার, আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করেন? কীভাবে?

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (رحمه الله), ইবনু তাইমিয়্যাহ (رحمه الله) এবং অন্যান্য আলিমগণের খুব জোরালো বক্তব্য আছে যা বিস্তারিত আলোচনা করার সময় আমাদের হবে না। আমি এ বক্তব্যগুলোর সারমর্ম তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আসলে দরকার নেই। কারণ আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ নিয়ে যাদের সমস্যা, যারা এই নীতি মেনে নিতে পারে না, তাদের সমস্যা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা নিয়েই। তারা কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নিতে পারছে না। যাদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে আপত্তি আছে, তাদের আপত্তি আসলে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য নিয়ে। শরীয়াহ নিয়ে। কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের ওপর এরা নিজেদের অপরিণত ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রথম প্রজন্মের মতো করে তারা কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝতে ও মানতে চায় না। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কুরআন-সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করতে চায়।

মানুষের মন যেমন নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলতে চায়, তেমনি আকল বা বুদ্ধিও খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলতে চায়। মনের খেয়ালখুশির ফলাফল হলো কামনা-বাসনা। আর আকলের খেয়ালখুশির ফলাফল হলো নুসুসকে অস্বীকার করা। বিকৃত করা। ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করা।

যে অন্তরে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নেই তা দূষিত, কলুষিত। অসুস্থ। এমন অন্তর মুনাফিকের অন্তর। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
>
> 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।' [সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ২৩]

আল্লাহ (ﷻ) আমাদের এই আয়াতে নাম ধরে ধরে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন,

> لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ

‘তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না...’

তিনি এখানে তাদের ভেতরে থাকা কুফরের কথা বলেননি, বরং প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে পিতা ভাই ইত্যাদি ব্যক্তির কথা বলেছেন। কারণ, কুফর কোনো আলাদা জীব না যা দুপায়ে হেঁটে বেড়ায়। কুফর থাকে মানুষের ভেতরে। যার মধ্যে কুফর থাকবে, সে যে মানুষই হোক না কেন, তাকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তারপর আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ

‘যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে প্রাধান্য দেয়’

কেউ যদি শুধু কুফরকে ঈমানের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে তাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যদিও তারা আমাদের পিতা কিংবা ভাই হয়। লক্ষ করুন, আল্লাহ (ﷻ) বলেননি যে,

তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ কোরো না...

যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে...

যদি তারা তোমাদের হত্যা করে...

যদি তারা তোমাদের ক্ষতি করে...

তিনি (ﷻ) বলেছেন,

যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে প্রাধান্য দেয়

কেউ যদি কেবল এটুকু করে, তাহলে তাকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে কীভাবে কুরআনুল কারীমের এই স্পষ্ট আয়াতকে মানুষ অস্বীকার করে? এবং দাবি করে, আল্লাহ (ﷻ) শুধু মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছেন? কেউ কীভাবে দাবি করে, আল্লাহ কাফিরদের সাথে নয় বরং কুফরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছেন?

নিচের আয়াতটি দেখুন। ভালোভাবে দেখুন। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

‘ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা

তোমাদেরকে অস্বীকার করি। এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।" [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৪]

আসুন আমরা ধাপে ধাপে আগাই। আল ওয়ালা ওয়াল বারার পুরো শিক্ষার ওপর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

'ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

আল্লাহ (ﷻ) এই আয়াতে শুধু ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর কথা বলতে পারতেন। আল্লাহ বলতে পারতেন, তোমরা ইব্রাহীমের অনুসরণ করো। ইব্রাহীমের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে। এ কথা তো অবশ্যই সত্য। কারণ, আমরা তাওহিদের অনুসরণ করি। আর ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর পথ হলো বিশুদ্ধ তাওহিদের পথ। এ জন্য আমরা তাওহিদের পথকে বলি 'মিল্লাতু ইব্রাহীমা হানিফা'। ইব্রাহীম (عليه السلام) তাওহিদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিতকারী এবং যমীনে তাওহিদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আল্লাহ এখানে শুধু ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর কথা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন,

'ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর এ বক্তব্যকে আরও জোরালো করেছেন। কী সেই চমৎকার আদর্শ? তারা কী উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল?

তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত।'

অর্থাৎ কুফর ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। 'বারা'। লক্ষ করুন, আয়াতে এসেছে,

তোমাদের সাথে এবং তোমরা যা কিছুর ইবাদত করো, তার সাথে।

কাজেই 'কুফরকে ঘৃণা করা, কাফিরকে নয়' এমন বলার কোনো সুযোগ আল্লাহ রাখেননি। অথচ আজকের মডার্নিস্টরা ঠিক এ কথাই দাবি করে। তারপর দেখুন ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীরা কী বলেছিলেন। তারা বলেছেন,

'আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য।'

এ আয়াতে বাগ্বদা (بغضاء) শব্দটি এসেছে। বাগ্বদা অর্থ ঘৃণা। ঘৃণা কেন? ঘৃণা করার কারণ কী? কত দিন এই ঘৃণা থাকবে? কত দিন এই বিদ্বেষ বজায় থাকবে? কত কাল ধরে এই শত্রুতা জারি থাকবে?

যতদিন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ না করো?

যতদিন তোমরা আমাদের ভূখণ্ড ফেরত না দাও?

না, শত্রুতার কারণ আমাদের যুদ্ধ না। শত্রুতার কারণ কোনো ভূমি না। শত্রুতার কারণ ভিন্ন। এই শত্রুতা জারি থাকবে,

حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।'

যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করবে, কুফর করবে, ততক্ষণ এই শত্রুতা জারি থাকবে। যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে, আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করবে, তাঁর দ্বীনের বিরোধিতা করবে–এই শত্রুতা জারি থাকবে। কিন্তু তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাওহিদকে গ্রহণ করো, তাহলে এই শত্রুতা এক মুহূর্তে ভালোবাসায় পরিণত হবে। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। কাফির-মুশরিকরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের প্রতি সকল শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ভালোবাসায় পরিণত হবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত তাদের জন্য ঘৃণা এবং শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই বরাদ্দ নেই। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল দেয়ার পরেও অনেকেই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না।

আমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইসলামের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

অনেকে এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ঘৃণা নিয়ন্ত্রিত হয় কীভাবে?

হ্যাঁ, আমরা কাফির-মুশরিকদের ঘৃণা করি; কিন্তু এই ঘৃণা শরীয়াহর নিয়মাধীন। আমাদের ঘৃণার সীমানা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। এটা পশুর মতো জান্তব ঘৃণা না। পশু যখন ঘৃণা করে তখন তারা শুধু ঘৃণাই করে এবং যুলুম করে। আমরা মানুষ, জানোয়ার নই। আমরা পশুর মতো নিয়ন্ত্রণহীন ঘৃণা ধারণ করি না। কাফির-মুশরিক এবং তাদের বিশ্বাসকে আমরা ঘৃণা করি, এটা সত্য। কিন্তু আমরা কাফির-মুশরিক প্রতিবেশীদের ওপর যুলুম করি না। আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয় প্রকারের অধীনে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ বিষয়টা কাফির-মুশরিকরা বুঝতে পারে না। কারণ, ওরা যখন কাউকে ঘৃণা করে তখন তার আপাদমস্তক সবকিছুকেই ঘৃণা করে। আমাদের এই নিয়ন্ত্রিত ঘৃণার ধারণা তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। ঘৃণার এই বিষয়টি অনেকেই ভুল বোঝে। অনেক তরুণ এটা নিয়ে প্রশ্ন করে। কাফিরদের প্রতি আমাদের এই ঘৃণা আমাদের অন্তরে থাকবে। কিন্তু দাওয়াহ ও ইহসানের বিষয়টি ভিন্ন। একজন মুসলিমের কাফির সহপাঠী থাকতে পারে, কাফির সহকর্মী থাকতে পারে, প্রতিবেশী থাকতে পারে। তাদের প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করবে। তেমনি শরীয়াহর সীমারেখার মধ্য থেকে তাদের সাথে

সদাচার সে করতে পারে। আমরা ওয়ালা এবং বারার তৃতীয় প্রকারের আলোচনার সময় এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি।

কা'ব ইবনু উজরাহ (ﷺ) একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কিছুটা দুর্বল দেখাচ্ছিল। কাব (ﷺ) উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার চেহারার এই পরিবর্তিত অবস্থা কেন?'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিলেন,

ما دخَل جوفِي ما يدخُلُ جوفَ ذاتِ كبِدٍ منذُ ثلاثٍ

'কলিজাওয়ালা পেটে ঢুকতে পারে এমন কোনো খাবার গত দিনে আমার পেটে ঢোকেনি।'

কা'ব (ﷺ) বলেন আমি তৎক্ষণাৎ এক ইহুদীর কাছে গেলাম। সে তার উটের পালকে খাওয়ানোর জন্য কুয়া থেকে পানি তুলছিল। আমি তাকে পানি তুলতে সাহায্য করলাম। প্রত্যেক বালতির জন্য মজুরি হিসেবে সে আমাকে একটি করে খেজুর দিলো। খেজুরগুলো নিয়ে আমি ফিরে গেলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন,

'এগুলো তুমি কোথায় পেলে কা'ব?' আমি তাঁকে সব বললাম।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে কা'ব, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক।'[২০০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাজটির–মানে ইহুদীর অধীনে গতর খেটে খেজুর নেয়ার কাজটি–অনুমোদন করলেন। আত তাবারানীসহ অনেক আলিম এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এ রকম একটি ঘটনার বর্ণনা আলী (ﷺ)-এর ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ সূত্রে পাওয়া যায়। আলী (ﷺ) একবার এক ইহুদীর অধীনে কাজ করে পারিশ্রমিক হিসেবে খেজুর নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হলে তিনি নীরব থেকে এই কাজের অনুমোদন দিয়েছিলেন।[২০১]

---

[২০০] ইমাম তাবারানী (ﷺ), আল মু'জামুল আওসাত : ৭/১৬০, ইমাম হাইসামী (ﷺ)-এর মতে সনদ জায়্যিদ।-মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/৩১৬

[২০১] এটি সুনানু ইবনু মাজাহর ২৪৪৬ নং হাদীসে এসেছে। আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (ﷺ)-এর মতে এই সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এই ঘটনা আরও আছে ইমাম বাইহাক্বী (ﷺ), সুনানুল কুবরা : ৬/১১৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৮৭; ইমাম আবু ইয়া'লা (ﷺ), আল মুসনাদ, হাদীস

হাসান আল বাসরী[২০২] (ﷺ)-কে একজন প্রশ্ন করেছিল, 'কার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবো?' তিনি উত্তরে বলেছেন,

> 'তোমার মেয়েকে এমন কারও সাথে বিয়ে দাও, যে তাকওয়াবান। যদি সে তাকে ভালোবাসে, তাহলে তাকে সম্মান করবে। আর যদি সে তাকে ঘৃণাও করে, তবুও তার ওপর যুলুম করবে না।'[২০৩]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। সময় সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বামী যদি সত্যিকারের মুমিন হয়, তাহলে রাগের সময়, ঘৃণার সময়ও সে যুলুম করবে না। কেননা, একজন মুমিনের রাগ আর ঘৃণাও কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সহজাত ভালোবাস ও ঘৃণার স্বীকৃতি ইসলাম দেয়

আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহকে যারা বিকৃত করতে চায়, তারা আরেকটি সংশয় নিয়ে আসে। তারা বলে, ইসলামে মুসলিম পুরুষের ইহুদী বা খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, সে একই সাথে কাউকে বিয়ে করবে এবং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে?

এ ধরনের প্রশ্ন এবং সংশয় যারা নিয়ে আসে, তারা আসলে আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর একটা বিস্তারিত বইও পড়ে দেখেনি। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ কী বলেছেন, সেটাও খুঁজে দেখেনি। কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফিরকে তার ধর্মের (অর্থাৎ কুফরের) কারণে ভালোবাসে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিমাণে কিছুটা ভালোবাসাকে ইসলামে জায়েয রাখা হয়েছে। এ ধরনের

নং : ৫০২ তে। সামগ্রিকভাবে ঘটনার ভিত্তি রয়েছে। এ ছাড়া এর ঠিক পরের হাদীসেই আলী (ﷺ) বলেছেন, كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ
'আমি পানি উঠাতাম প্রতি বালতির বদলে একটি খেজুরের মজুরিতে। এবং এই শর্ত দিয়েছিলাম, খেজুরগুলো শুকনো হতে হবে।' এর সনদ হাসান। এই হাদীসকে পূর্বের হাদীসের স্বপক্ষে ধরা সম্ভব। আল্লাহু আ'লাম।

[২০২] ইমাম হাসান বিন ইয়াসার আল বাসরি (ﷺ)-এর জন্ম খলিফা উমার (ﷺ) -এর শাসনকালে মদীনায় ২১ হিজরিতে। মৃত্যু ১১০ হিজরিতে বসরায়। জীবনের প্রথম অংশ তিনি মদীনাতেই কাটান এবং বহু সাহাবী থেকে ইলম অর্জন করেন। সিফফিনের যুদ্ধের পর তাঁর পরিবার বসরায় চলে গেলে তিনিও বসরায় চলে যান। সাহাবীদের কাছে তাঁর মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনায়, একবার আনাস (ﷺ) -কে একটা মাস'আলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, سلوا مولانا الحسن 'তোমরা মাওলানা আল হাসানকে জিজ্ঞেস করো'।-ইমাম ইবন সা'দ (ﷺ), আত তাবাকাত : ৭/১৭৬

[২০৩] ইমাম তাকিউদ্দীন আব্দুল মালিক আশ-শাফে'ঈ (ﷺ), নুযহাতুন নাযিরিন ফিল আখবার ওয়াল আসার আল মারউইয়্যাহ আনিল আনবিয়া ওয়া সালিহিন, পৃষ্ঠা : ৩২৫

ভালোবাসাকে বলা হয় আল হুব্বুল ফিতরি আল মওযুদ ফী যাতিল ইনসান (الحب الفطري الموجود في ذات الإنسان)। এটাকে ফিতরাতি বা সহজাত ভালোবাসা বলা যেতে পারে। এ ধরনের ভালোবাসা শুধু কাফির স্ত্রীর জন্য না, বরং কাফির আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন কেউ ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু তাঁর মা-বাবা অথবা ভাই-বোন কাফির। আসমা বিনতে আবু বাকর (ﷺ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জানতে চাইলেন,

إنَّ أمِّي قَدِمَتْ عليَّ وهي مُشركةٌ راغبةٌ أفأصِلُها؟

'আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি মুশরিক এবং দ্বীন গ্রহণে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব?'

কেন তিনি এ প্রশ্ন করলেন? কারণ, তাঁর মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারা ছিল। তিনি জানতেন, ঈমানের দাবি হলো কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈরিতা রাখা। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে এর কোনো ব্যতিক্রম আছে কি না সেটাই তিনি জানতে চাচ্ছিলেন।

তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,

أفأصِلُها؟

আমি কি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

نَعَمْ صِلِيهَا

'হ্যাঁ। তার সাথে উত্তম আচরণ করবে।'[২০৪]

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ (ﷻ) সূরা মুমতাহিনার আট নম্বর আয়াত নাযিল করেন।

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।' [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

আর এই আয়াতটিকেই ওয়ালা এবং বারার তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় প্রধানতম

---

[২০৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩১৮৩ এবং ১০০৩

দলিল হিসেবে আমরা আলোচনা করেছি।

কিতাবিয়্যাহদের (كتابية), অর্থাৎ ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান স্ত্রী, অথবা কাফির বাবা-মায়ের প্রতি মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি কাজ করে তা হলো সহজাত ভালোবাসা। মানুষের যেমন সহজাত ভালোবাসা রয়েছে তেমনি সহজাত ঘৃণাও রয়েছে। ইসলাম দুটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

আল্লাহর শরীয়াহর কথা চিন্তা করুন। কেউ যদি আল্লাহর শরীয়াহর বিধানকে ঘৃণা করে–কারণ আল্লাহ তা প্রণয়ন করেছেন–তাহলে সেটা হবে কুফর। যা ওই ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে দেবে। অন্যদিকে দ্বীনের কিছু বিধান আছে যেগুলো মানুষের কাছে অপছন্দনীয়, এটা আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

> كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ
>
> 'তোমাদের ওপর কিতালের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ২১৬]

আল্লাহ (ﷻ) এখানে বলছেন,

> كُرْهٌ لَّكُمْ
>
> 'তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়'

এখানে তিনি বিশ্বাসীদের কথা বলছেন। মুমিনদের কথা বলছেন। আল্লাহ জিহাদ ফরয করেছেন, কিন্তু মানুষ তা অপছন্দ করে। এই অপছন্দ করাটা ফিতরাতি। এটা দ্বীনের দিক থেকে অপছন্দ না। আল্লাহ জিহাদ ফরয করেছেন, এই কারণে যদি কেউ জিহাদকে অপছন্দ করে, তাহলে সে কাফির। কিন্তু এখানে এ ধরনের অপছন্দের কথা বলা হচ্ছে না।

আল-কুরতুবি (رحمه الله) বলেছেন, মানুষ জিহাদকে অপছন্দ করে কারণ জিহাদের জন্য পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নিজ এলাকা থেকে দূরে যেতে হয়। জিহাদে আঘাত, ক্ষত, পঙ্গুত্ব এবং মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। তাই মানুষ জিহাদ অপছন্দ করে। এটা মানুষের ফিতরাত। সে এমন জিনিস অপছন্দ করে যা তাকে পরিবার-পরিজন থেকে দূরে নিয়ে যায়, তার জীবনে অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে, যার কারণে তার ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। এই সহজাত অপছন্দের স্বীকৃতি ইসলাম দেয়। ইসলাম যে সহজাত ভালোবাসা বা ঘৃণার স্বীকৃতি দিয়েছে তার আরেকটি উদাহরণ হলো নিচের হাদীস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> إسباغُ الوُضوءِ على المكارِهِ

'কষ্ট থাকার পরও ভালোভাবে ওযু করা।'[২০৫]

কোনো কোনো সময় ওযু করতে আলসেমি আসে, ভালো লাগে না। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ঘুম থেকে উঠে ওযু করতে কারও ভালো না লাগতেই পারে। এটা সহজাত অপছন্দ। যে এমন করতে অপছন্দ করে, তার অপছন্দের কারণ হলো এ কাজটা করা কষ্টকর। আল্লাহ এই বিধান দিয়েছেন, এই কারণে সে অপছন্দ করে না। কাজেই ইসলাম সহজাত ভালোবাসা ও সহজাত ঘৃণা, দুটোরই স্বীকৃতি দিয়েছে। কোনো মুসলিম যদি ইহুদী বা খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা কাজ করবে। এটা সহজাত ভালোবাসা।

'সহজাত ভালোবাসা' আর শরীয়াহর 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' এর নীতি সাংঘর্ষিক না। চাচা আবু তালিবের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালোবাসার কথা একবার চিন্তা করুন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ

'নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন।' [সূরা আল কাসাস, ২৮: ৫৬]

মুফাসসিরদের একটি মত অনুযায়ী এখানে 'তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না', দ্বারা আবু তালিবকে বোঝানো হচ্ছে। আবু তালিবের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই ভালোবাসা হলো সহজাত ভালোবাসা। কাফির পিতামাতা, ভাইবোন কিংবা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হলো এ ধরনের সহজাত ভালোবাসা।

মুফাসসিরগণের আরেকটি মত হলো, ভালোবাসার উদ্দেশ্য এখানে আবু তালিবের হিদায়াত। এখানে ব্যক্তি না, বরং হিদায়াত মুখ্য। অর্থাৎ এ আয়াতে বলা হচ্ছে, তুমি যার হিদায়াত ভালোবাসো (যার হিদায়াত হোক তা আকাঙ্ক্ষা করো), তার জন্য হিদায়াত দিতে পারবে না। আমাদের কাছে এই মতটিকেই অপেক্ষাকৃত সঠিক মনে হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি প্রথম মতটিও গ্রহণ করি, তাহলে দেখব এখানে সহজাত ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে। এ ভালোবাসা অমুসলিম আত্মীয়দের প্রতি সহজাত

---

[২০৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৫১; সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৫১, এটি একটি হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ 'আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে আল্লাহ তা'আলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন?' সাহাবাগণ বললেন, 'হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ বলে দিন।' তিনি তখন বললেন, إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ 'কষ্ট থাকার পরও ভালোভাবে ওযু করা, মসজিদে বেশি বেশি যাতায়াত করা এবং এক সালাত শেষ করে পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হলো রিবাত।'

ভালোবাসা।

মা অত্যন্ত কষ্ট করে সন্তান জন্ম দেন, বাবা সন্তান লালনপালনের ব্যয়ভার বহন করেন—কাজেই তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সহজাত ভালোবাসার কারণে তাদের শিরক বা কুফর মেনে নেয়া যাবে না। এগুলো অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে। মুসলিম সন্তান গিয়ে তার কাফির পিতামাতার ক্রুশ গলায় ঝোলাবে না। তাদের ক্রুশ হাতে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে না। কিংবা তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিনে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে না, এগুলো মেনে নেবে না। খাবার টেবিলে তারা যিশুখ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিলে সে ওখানে বসে থাকতে পারবে না। সেখান থেকে উঠে চলে যেতে হবে। তারা যখন কুফর ও শিরক করছে তখন সে উপস্থিত থাকতে চায় না। সে চায় না আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর আসুক।

সহজাত ভালোবাসা থাকবেই, তবে প্রাধান্য পাবে শরীয়াহগত ভালোবাসা। প্রাধান্য পাবে ওয়ালা এবং বারা। পিতামাতার প্রতি আমাদের মনে ভালোবাসা থাকবে; কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আরও শক্তিশালী, আরও ব্যাপক, আরও গুরুত্বপূর্ণ। যখন সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে তখন মুমিনের মনে সব সময় আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসা, চূড়ান্ত আনুগত্য বিজয়ী হবে এবং সহজাত ভালোবাসার সব চিহ্ন মুছে ফেলবে। এটাই হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলুলের ছেলের দৃষ্টান্ত

একজন সাহাবীর কথা দিয়ে আলোচনা শেষ করা যাক। সহজাত ভালোবাসার পুরো ব্যাপারটা এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। মদীনাতে মুনাফিকদের সর্দার ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই। তার এক ছেলে ছিল। ছেলের নামও আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। এই ছেলে ছিলেন প্রথম সারির একজন সাহাবী।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ বিন উবাই সাহাবীদের মধ্যে একটু মতানৈক্য দেখতে পেল। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে উম্মাহকে বিপদে ফেলা মুনাফিকদের চিরাচরিত কাজ। সুযোগ দেখামাত্র আব্দুল্লাহ বিন উবাই তা কাজে লাগাতে চাইলো। সূরা মুনাফিকুনে সেই সময়ের ঘটনাগুলো আল্লাহ তুলে এনেছেন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের জানাচ্ছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই দম্ভভরে বলছিল,

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

'যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই, তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে সম্মানিতজন

হীনজনকে বহিষ্কৃত করবে।'

এখানে সম্মানিতজন বলতে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই নিজেকে বোঝাচ্ছিল আর হীন ব্যক্তি বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কানে এ কথা পৌঁছালে তিনি মুনাফিকদের ডেকে পাঠান এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। একের পর এক মুনাফিকরা মিথ্যে কসম খেয়ে গেল, 'না! এ রকম কথা কেউ কখনো বলেইনি।'

অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করলেন। এখানে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। আমরা বাহ্যিক বা আপাত অবস্থা দেখে বিচার করি। মানুষের অন্তরে কী আছে না আছে সেটা নিয়ে চিন্তা করা আমাদের কাজ না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিকদের ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁর কাছে আসলেন আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه), অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ছেলে। তিনি এসে কী বললেন, লক্ষ করুন। তিনি বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيّ فِيمَا بَلَغَكَ عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمُرْنِي بِهِ، فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ رَأسه، فو الله لَقَدْ عَلِمَتْ الْخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি খবর পেয়েছি আপনার কাছে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে সে মোতাবেক আপনি তাকে হত্যা করতে চান। যদি আসলেই তাকে হত্যা করেন, তাহলে আমাকে আদেশ করুন। আমি তার মাথা কেটে আপনার কাছে নিয়ে আসব। কেননা, আল্লাহর কসম! খাযরাজ গোত্র অবশ্যই জানে যে, তাদের মাঝে পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারে আমার চেয়ে অগ্রগণ্য কেউ নেই!'[২০৬]

আবুদল্লাহ ইবনু উবাই ছিল মুনাফিকদের সর্দার। আর তার ছেলে এই কথা বলছেন! পুত্র বলছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনি অনুমতি দিন, আমি আমার পিতার মাথা কেটে আপনার সামনে এনে রাখি। এটা হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। এই সাহাবীর মধ্যে সহজাত ভালোবাসা ছিল, কিন্তু তা আল ওয়ালা ওয়াল বারার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

---

[২০৬] ইমাম ইবন হিশাম (رحمه الله), আস সিরাতুন নাওয়াউইয়্যাহ : ২/২৯৩; এটি হাদীস গ্রন্থগুলোতেও সহীহ সনদে এসেছে, সেখানে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বলেছেন, يا رسولَ اللهِ والَّذي أكرمَكَ لئن شئتَ لأتيتُكَ برأسِهِ
'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম করে বলছি। যদি আপনি চান তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথা কেটে এনে আপনাকে দেবো।'-সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৪২৮; ইমাম হাইসামী (رحمه الله)-এর মতে এর রিজাল সিকাত। (মাজমাউয যাওয়াইদ : ৯/৩২১)। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمه الله)-এর মতে সনদ হাসান। (আস সিলসিলাতুস সহীহাহ : ৭/৬৭৭)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাঁকে এমন করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

بَلْ نَتَرَفَّقُ بِهِ، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا

'আমরা তার সাথে উত্তম আচরণ করব, যতদিন সে আমাদের মাঝে জীবিত থাকবে।'

এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দয়া এবং বিচক্ষণতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মদীনায় ফেরার সময় আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ছেলে তার পিতাকে হুমকি দিলো,

'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুমতি দেয়ার আগে মদীনায় পা দেয়া তো দূরের কথা, তুমি মদীনার ছায়াও ঘেঁষবে না! তুমি হচ্ছ হীন ব্যক্তি আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হচ্ছেন সম্মানিতজন।'

এরপর তিনি (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে নিরাপদে তার বাসায় ফেরার অনুমতি দিলেন এবং আব্দুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর পিতার কোনো ক্ষতি করতে নিষেধ করলেন।[২০৭]

সহজাত ভালোবাসা আর আল ওয়ালা ওয়াল বারা কীভাবে সহাবস্থান করে, এটা হলো তার প্রমাণ। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে আরেকটি বর্ণনায়।

فو الله لَقَدْ عَلِمَتْ الْخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلَهُ، فَلَا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْظُرُ إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيّ يَمْشِي فِي النَّاسِ، فَأَقْتُلَهُ فَأَقْتُلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ، فَأَدْخُلَ النَّارَ،

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ছেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম, খাযরাজ গোত্রের লোকেরা জানে তাদের মাঝে এমন কোনো লোক নেই, যে তার পিতার প্রতি আমার চেয়ে অধিক সদ্ব্যবহার করে। আমার আশঙ্কা হয় আপনি যদি অন্য কাউকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং সে হত্যা করেই ফেলে, তাহলে আমি হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের হত্যাকারীকে মানুষের মাঝে চলাচল করতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারব না। আমি হয়তো তাকে হত্যা করে ফেলব। ফলে একজন কাফিরের জন্য একজন মুমিনকে হত্যা করে আমি জাহান্নামে চলে যাব।'[২০৮]

খেয়াল করে দেখুন, এই মহান সাহাবী (رضي الله عنه) এখানে 'আমার পিতার হত্যাকারী' বলেননি, বরং তিনি নাম ধরে বলেছেন **'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের হত্যাকারী'**। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, অন্য কোনো মুসলিম তাঁর পিতাকে হত্যা করলে সহজাত ভালোবাসার কারণে তিনি হয়তো প্রতিশোধ নিয়ে ফেলবেন। হয়তো মদীনাতে সেই

---

[২০৭] ইমাম তাবারি (রহ.), জামিউল বায়ান : ২৩/৪০৩

[২০৮] ইমাম ইবন হিশাম (রহ.), আস সিরাতুন নাওয়াউইয়্যাহ : ২/২৯৩

মুসলিমকে দেখার পর রাগের মাথায় তিনি তাঁকে আক্রমণ করে বসবেন। তিনি কোনো মুমিনকে হত্যা করতে চান না। তাই বলছেন, আমাকে এই দায়িত্ব দিন। আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করব।

সহজাত ভালোবাসা এবং শরীয়াহগত ভালোবাসা এই দুই ভালোবাসার সহাবস্থানের খুব চমৎকার উদাহরণ এটি। ইসলাম দুটিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু দিনশেষে সহজাত ভালোবাসার ওপরে প্রাধান্য পাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারা। যখন সহজাত ভালোবাসা এবং শরীয়াহগত ভালোবাসা মুখোমুখি দাঁড়াবে–তখন সব সময় মুমিনের মনে আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসা, চূড়ান্ত আনুগত্য বিজয়ী হবে এবং সহজাত ভালোবাসার সব চিহ্ন মুছে ফেলবে। এটাই হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

উপসংহার

ওয়ালা এবং বারা নিয়ে আলোচনার এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে। আরও অনেক কিছু বলার ছিল, অনেক বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু এখানে সুযোগ সীমিত। আল্লাহ (ﷻ) যদি সময় করে দেন এবং পরিস্থিতির উন্নতি হয়, তাহলে আমি আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর একটি স্বতন্ত্র কোর্স নেয়ার ইচ্ছা রাখি।

কয়েক সপ্তাহ আগে, কাফিরদের সাথে পার্থক্য বজায় রাখার ব্যাপারে যে হাদীসগুলো আছে সেগুলোর একত্র করার চেষ্টা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক হাদীসে আমাদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো হতে নিষেধ করেছেন। এটি ওয়ালা এবং বারার একটি অংশ। যেমন হাদীসে এসেছে, অমুকদের চেয়ে আলাদা হও, দাড়ি রাখো। এ বিষয়ের ওপর যে হাদীসগুলো কুতুবে সিত্তাহয় এসেছে সেগুলো একত্র করেছিলাম। পাশপাশি মুস্তাদরাক আল হাকিম, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা এবং মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক থেকেও এ বিষয়ের হাদীসগুলো আলাদা করেছিলাম। এ নয়টি সংকলন থেকে মোটামুটি ৪৫ থেকে ৪৭টি হাদীস আমি পেয়েছি যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে আলাদা হও। স্বতন্ত্র হও। এবং অন্য ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে আলাদা হওয়া আল ওয়ালা ওয়াল বারার একটি নীতি।

এই হাদীসগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতে আকীদাহর কথা এসেছে। অর্থাৎ আকীদাহর দিক থেকে তাদের চেয়ে ভিন্ন হও। কিন্তু এমন অনেক হাদীস আছে যেখানে প্রচলন, অভ্যাস বা স্বভাব (عادات), ইসলামী আচরণ, ঐতিহ্য বজায় রাখার কথা এসেছে। এমনকি বাহ্যিকভাবে, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও তাদের চেয়ে আলাদা হতে বলা হয়েছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে আলাদা হওয়া আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ। আর ওয়ালা এবং বারা মুসলিমদের স্বকীয়তা রক্ষার ঢালস্বরূপ। মুসলিমরা যদি কাফির-মুশরিকদের মতো হয়ে যায়, তাহলে নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করবে কীভাবে?

কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না, এর মানে এই না যে কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের সহাবস্থান চলবে না; বা কাফির-মুশরিকরা আমাদের অধীনে বসবাস করতে পারবে না। আহলুয যিম্মা তো মুসলিমদের অধীনেই বসবাস করে। তারা আমাদের সাথে বসবাস করতে পারবে; কিন্তু আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে, তাদের অনুসরণ করা যাবে না। স্বকীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নিলে পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা স্বকীয়তা বজায় না রাখলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কাফির হিসেবে বেড়ে উঠবে।

তো এ বিষয়ের ওপর ৪৫টির মতো হাদীস আমি একত্র করেছি। এর মধ্যে কিছু হলো একই হাদীসের বা একই ধরনের হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। কিন্তু মূল পয়েন্ট হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোনো কিছু বারবার বলেন, যখন সেটা চল্লিশের বেশি হাদীসে আসে তখন এর গুরুত্ব নিয়ে আর প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না। এটি আল ওয়ালা ওয়াল বারার একটি মূলনীতি। কিন্তু এ যুগের মুনাফিকরা এবং ইন্টারফেইথের লোকজন আমাদেরকে বলে, 'কাফির-মুশরিকদের মতো হও'। আন্তঃধর্মীয় কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসের অনুসারীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা। পার্থক্য দূর করা। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে সেতুবন্ধন আবার কীভাবে হয়? আল্লাহ (ﷻ) কি এই আয়াত নাযিল করেননি?

> لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
>
> 'তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে); আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোনো পথ গ্রহণ করতে মোটেই প্রস্তুত নই)।' [সূরা আল কাফিরুন, ১০৯: ৬]

কাফির-মুশরিকরা তাদের ভ্রান্ত দ্বীন নিয়ে থাকুক, তাদের এই দ্বীন একদিন তাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত করবে। আমাদের দ্বীন আমাদের কাছে। ইন শা আল্লাহ আমাদের এই দ্বীন একদিন আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবে। তাই আমরা আমাদের স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় বজায় রাখব। কাফিরদের চেয়ে আলাদা হব। আমাদের দ্বীন ও ঈমানকে আচ্ছাদিত করে রাখব আল ওয়ালা ওয়াল বারার বর্মে।

আলহামদুলিল্লাহ 'উসুলুস সালাসাহ' পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা এই দারসের মাধ্যমে শেষ হলো।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)